আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ

আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ

প্রকাশন

৪৭০/২ ব্লক-বি, লেকটাউন কলকাতা ৭০০ ০৮৯

প্রকাশক ঃ অমিতা চট্টোপাধ্যায়
আশীর্বাদ প্রকাশন
৪৭০/২ ব্লক-বি, লেকটাউন
কলকাতা ৭০০ ০৮৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ৩০ জানুয়ারি ১৯৬০

উপদেষ্টা ঃ
অ্যাসোসিয়েশন অফ্ ইণ্ডিয়ান স্মল ইণ্ডাস্ট্রি,
বিজনেস অ্যাণ্ড রুরাল ডেভেলপমেণ্ট

অলংকরণ ঃ গোপাল সান্যাল

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ বিজন কর্মকার

মুদ্রক ঃ অসীমকুমার সাহা
দি প্যারট প্রেস
৭৬/২ বিধান সরণি (ব্লক কে-১)
কলকাতা ৭০০ ০০৬

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ

প্রভাত

দ্বিতীয় ভাগ

মধ্যাহ্ন

প্রথম ভাগ

প্রভাত

ভূমিকা

এই বইটাতে আমি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক ও অন্য কীর্তির এবং তাঁহার জীবনের সত্য রূপ বুঝিবার চেষ্টা করিব। এই দুই ব্যাপারেই তাঁহার সম্বন্ধে সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা আজ পর্যন্ত হয় নাই। যাহা হইয়াছে তাহা এক পক্ষে হিন্দুর মূর্তিপূজার মত, অন্য পক্ষে মুসলমানের মূর্তি-ভাঙার মত। জীবিতকালে তিনি যেন হিন্দু হইয়া মুসলমানের রাজত্বে বাস করিয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রধানত আক্রমণেরই লক্ষ্য ছিলেন। এই অবস্থার জন্য তাঁহার ব্যক্তিত্ব, মতামত ও রচনা সম্বন্ধে যেসব কথা বলা ও লেখা হইয়াছিল তাহাকে মিথ্যা নিন্দা ভিন্ন আর কিছু বলা যাইতে পারে না। আবার এই বিদ্বেষপ্রসূত নিন্দার পরিমাণ, তীব্রতা ও ইতরতা এমনই হইয়াছিল যে উহার ভারে ও ধারে বেশীর ভাগ বাঙালীর কাছেই তাঁহার আসল রূপ চাপা ও কাটা পড়িয়াছিল।

অবশ্য ইহাদের প্রতিপক্ষও যে ছিল না তাহা নয়, অর্থাৎ ভক্তও তাঁহার জুটিয়াছিল। ইহারা বিদ্বেষীদের তুলনায় সংখ্যায় অনেক কম হইলেও দলে নিতান্ত অল্পসংখ্যক ছিল না। তবে ইহাদের দ্বারাও রবীন্দ্রনাথের হিত হয় নাই। ইহারাও তাঁহার যে-রূপ প্রচার করিয়াছিল তাহা অন্ধ স্তাবকের প্রশস্তি ভিন্ন কিছু নয়। এমন কি, এই রবীন্দ্রভক্তি এমনই বাক্যভঙ্গী ও আচরণে প্রকাশ পাইত যে, উহাকে হাস্যাস্পদ করা নিন্দাকারীদের পক্ষে খুবই সহজ হইত। ফলে রবীন্দ্রভক্তেরাও রবীন্দ্রবিদ্বেষীদের মতই মিথ্যারই প্রচারক হইয়াছিল।

বর্তমানে অবশ্য অবস্থাটা উল্টা হইয়াছে, অর্থাৎ রবীন্দ্রনিন্দকেরা লোপ না পাইলেও রবীন্দ্রভক্তেরাই প্রবল হইয়াছে। কিন্তু না ভক্তি না নিন্দা, কোনটাই উচ্চ স্তরে উঠে নাই। এখনও রবীন্দ্রনাথের সত্য রূপ আত্মপ্রকাশ করিতে পারিতেছে না।

আমি সারা জীবন সেই রূপটি ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি, মনে হয় অবশেষে হয়ত ধরিতেও পারিয়াছি। তবে আমার ধারণায় তাঁহার যে-রূপ আসিয়াছে উহা এক নয়, দ্বিধাবিভক্ত। উহার এক দিক আত্মসমাহিত রবীন্দ্রনাথের, অন্য দিক আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথের। এই দুই রূপের অবিচ্ছিন্নতাই তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য। তিনি স্বজাতির দিক হইতে যে-বিদ্বেষ ও যে-আক্রমণের লক্ষ্য হইয়াছিলেন তাহা তিনি নিজের

আত্মসমাহিত প্রতিভার শক্তিতে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া এই দুইটির উত্তরে যে-পথ ধরিলেন, তাহাতে তাঁহার জীবনে বিরামবিহীন দুঃখ আসিল। এই দুঃখ তিনি নিজেই টানিয়া আনিলেন, সেজন্য উহাকে শুধু আত্মনিপীড়ন নয়, আত্মহত্যাই বলা চলে। আমি তাঁহার জীবনের অতুলনীয় গৌরব ও স্বেচ্ছাবৃত দুঃখের পরিচয় দিতে চাহিতেছি।

ক্ষুধিত পঙ্কে রবীন্দ্রনাথ

বাঙালী সমাজ ও জীবনকে সকল বাঙালীর 'ক্ষুধিত পঙ্ক' বলা যাইতে পারে, প্রতিভাশালী বাঙালীর তো কথাই নাই। 'ক্ষুধিত পাষাণ' সম্বন্ধে করিম খাঁ বলিয়াছিল, 'যাহারা ত্রিরাত্রি ঐ প্রাসাদে বাস করিয়াছে তাহাদের মধ্যে কেবলমাত্র মেহের আলি পাগল হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, এ পর্যন্ত আর কেহ তাহার গ্রাস এড়াইতে পারে নাই।' বাঙালী সমাজ ও জীবনের ক্ষুধিত পঙ্কেও যাহারা জন্মিয়াছে তাহাদেরও কেহ উহার করাল গ্রাস হইতে নিজেকে রক্ষা বা উদ্ধার করিতে পারে নাই, একটি ব্যতিক্রম ছাড়া।

দূর হইতে দেখিলে এই ক্ষুধিত পঙ্ককে সবুজ ঘাসে ও অন্য উদ্ভিজ্জে ঢাকা মাঠ বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু মুগ্ধ বা লুব্ধ হইয়া উহার উপর হাঁটিতে গেলেই পা বসিয়া যায়, ও ঘাসের নীচের তলহীন সর্বগ্রাসী পঙ্ক হতভাগ্যকে টানিয়া লইয়া যায়। উহা কোনান ডয়েলের বিখ্যাত গল্প 'হাউন্ড অফ দি ব্যাস্কারভিল্স্'-এর 'গ্রীম্পেন মায়ারে'র মত। 'একদিন ডাঃ ওয়াটসন স্টেপলটনের সঙ্গে দাঁড়াইয়া উহার উপরকার শষ্পাবৃত শোভা দেখিতেছিলেন। হঠাৎ একটা বিকট ভয়ার্ত চীৎকার শুনিয়া চমকিয়া উঠিতেই স্টেপলটন বলিল, 'By George, there is another of those miserable ponies.' এই অঞ্চলে বন্য ঘোড়া চরিত। উহাদের একটাই ঘাসের লোভে গ্রীম্পেন মায়ারের উপরে গিয়া ডুবিয়া যাইতেছিল। দুজনেই দেখিলেন, ঘোড়াটা দেহ মোচড়াইতে মোচড়াইতে অদৃশ্য হইয়া গেল। বাঙালী জীবনের ক্ষুধিত ও চোরা পঙ্ক বাঙালীর শরীরকে এইভাবে গ্রাস করিতে না পারিলেও মনকে গ্রাস করে।

এই ভয়াবহ মানসিক নিমজ্জন আমি সারা জীবন ধরিয়া দেখিলাম। আমরা ছয় ভাই ও দুই বোন ছিলাম, সকলেরই প্রতিভা ছিল কিনা বলিতে পারি না, তবে এক আমি ছাড়া অন্য সকলেই বৈষয়িক প্রতিষ্ঠা লাভ

করিয়াছিল। কিন্তু শেষ অঙ্কে সকলেরই জীবন ব্যর্থতায় অথবা দুঃখে অবসান হইয়াছে। একমাত্র আমি এই পঙ্কের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছি; সম্ভবত বিষয়বুদ্ধির অভাবই ইহার কারণ।

আমার অন্তরঙ্গ অথবা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত বন্ধুস্থানীয় যে কয়জন যুবক ছিলেন, তাঁহাদের অন্তত দশজনের সত্যই প্রতিভা ছিল। তাঁহাদেরও এই একই গতি হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে শুধু একজনের নাম করিব — তিনি সজনীকান্ত দাস।

যাঁহাদের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না অথবা সামান্য পরিচয় ছিল, ও যাঁহাদের কেহ কেহ আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, ইহার উপরে যাঁহাদের প্রতিভা সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না — তাঁহারাও এই পঙ্কে ডুবিয়াছেন। কয়েকজনের উল্লেখ করিব — বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন্দ্র বসু, পাণ্ডিত্যে হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী ও দেবপ্রসাদ ঘোষ, রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে হীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রেমেন্দ্র, শৈলজানন্দ ও হুমায়ুন কবীর। ইহাদের কেহই প্রভাতে উদিত হইয়া মধ্যাহ্নের আকাশ পর্যন্ত যান নাই। বুদ্ধদেব বসু সম্বন্ধেও তাহাই বলিব, তাঁহাকে শুধু বাঙালী জীবনের মানসিক ক্ষুধিত পঙ্কই গ্রাস করে নাই, যাদবপুরের বাদাও তাঁহাকে কবিপদ হইতে অধ্যাপকপদে নামাইয়াছিল। মরণং যাদবপুরে, অপরং বা কিং ভবিষ্যতি।

আরও অনেকের কথাই বলিতে পারিতাম, তবে তালিকা বৃদ্ধি না করিয়া, যিনি আমার তালিকার শীর্ষে, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ, তাঁহার দশাই দেখিব। তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভাকে ক্ষুধিত পঙ্ক গ্রাস করিতে নিশ্চয়ই পারে নাই; কিন্তু তাঁহার জীবনকে, গ্রাস করিতে না পারিলেও দুঃখের বিষে জর্জরিত করিয়াছিল। উহার আকর্ষণ হইতে নিজেকে বাঁচাইবার জন্য তিনি যে-সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি যেন পাগল হইয়া গিয়াছিলেন। স্বজাতির আচরণ সম্বন্ধে তিনি যৌবন হইতে বার্ধক্য পর্যন্ত যে-সব উক্তি করিয়াছিলেন তাহা যেন পাগল মেহের আলির 'তফাৎ যাও, তফাৎ যাও' চীৎকারের মত। শেষ পর্যন্ত ক্ষুধিত পঙ্ক তাঁহার জীবনকে ক্লান্তিতে অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু উহার অন্তর্নিহিত মহত্ত্ব ও সেই মহত্ত্বের সাহিত্যিক প্রকাশকে নষ্ট করিতে পারে নাই — তবু উহাকে জীবনব্যাপী দুঃখের সহিত জড়িত করিয়া রাখিয়াছিল। সেজন্য এককালে আমি তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টিকে 'Les fleurs du mal' বলিতাম। এত মহান ও এত বহুমুখীন প্রতিভাবান ব্যক্তির এমন দুঃখময় জীবনের কথা আমি কোনো দেশের সাহিত্যিক ইতিহাসে পড়ি নাই। এই দুঃখের মূলে কি ছিল, সর্বাগ্রে তাহারই সন্ধান লইতে হইবে।

অযোগ্য স্বজাতির মুখাপেক্ষিতা

তবে সেই সন্ধান পাওয়া মোটেই দুরূহ নয়। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত দুঃখের মূলে যাহা ছিল তাহা যে অযোগ্য স্বজাতির প্রতি আসক্তি, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। এই আসক্তিকে অহৈতুকী মোহ বলা যাইতে পারে, কারণ বাঙালী চরিত্রের দুর্বল ও অপকৃষ্ট দিক সম্বন্ধে তাঁহার কোনো অজ্ঞতা ছিল না। দুর্যোধনের যখন জন্ম হইল তখনই সে গাধার মত ডাকিয়া উঠিল, এবং তাহা শুনিয়া সমস্বরে গৃধ্র, শৃগাল এবং বায়সও ডাকিতে লাগিল। এইসব কুলক্ষণ শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র বিদুর ও অন্যান্যের পরামর্শ চাহিলেন। বিদুর তখনই এই কুলান্তকারী পুত্রকে ত্যাগ করিবার জন্য বলিলেন, পরেও প্রতিপদে ধৃতরাষ্ট্রকে সাবধান করিলেন। এমন কি ধৃতরাষ্ট্রের প্রকৃত পিতা ব্যাসদেবও এই উপদেশই দিলেন। কিন্তু পুত্রস্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। রবীন্দ্রনাথের কোনো বিদুর বা ব্যাসদেবের প্রয়োজন হয় নাই; তিনি বাঙালীকে নিজেই চিনিয়াছিলেন; ঘোর নিমিত্তের মত, তাঁহার বিরোধী বাঙালীদের মুখে গর্দভ-গৃধ্র-গোমায়ু-বায়সের ডাকও শুনিয়াছিলেন; তবু তিনি তাঁহার অন্ধ বাঙালী-স্নেহ ছাড়িতে পারেন নাই। সুতরাং তিনি সারা জীবনেই বাঙালীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার প্রত্যাশী হইয়া রহিলেন। উহা না পাইয়া পরজীবনে যখন তিনি পাশ্চাত্ত্য জগতের সমাদর হইতে সান্ত্বনালাভের চেষ্টা করিলেন, তখনও বাঙালীর প্রীতি পাইবার বাসনা ছাড়িতে পারেন নাই।

এই ব্যাপারটার উপলব্ধি আমার অল্পবয়সেই হইয়াছিল। উহার বশে ১৯২৯ সনে আমি ইংরেজীতে একটি ছোট 'নোট' লিখি। সেটা আমি আমার শ্রদ্ধেয় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙালী অধ্যাপককে দেখাইয়াছিলাম। পড়িবার পর তিনি একটু হাসিয়া উহা আমাকে ফেরৎ দিয়াছিলেন। হাসিটা অনুমোদনসূচক হয় নাই। আমার পুরানো কাগজপত্র সবই প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু জানি না কি করিয়া এই কাগজের টুকরাটুকু বাঁচিয়া গিয়াছিল। তাই 'নোট'টি আমার আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে উদ্ধৃত করিতে পারিয়াছিলাম। সেটা এখানে পুনরুদ্ধৃত করিতেছি। আমি লিখিলাম,—

'With the twelve good fairies who hurried to the birth of Tagore, bringing to him their gifts of wealth and beauty and genius for him, came also the malevolent thirteenth, who brought to him her curse and denied him the love, and the respect too perhaps, of his countrymen. And Rabindranath Tagore has never consoled himself for this.

'Keenly, almost morbidly sensitive to praise and blame as he is, he has managed yet not to be wholly blinded by the brilliance of his western receptions. However, irresistible the glamour of his personal triumphs,

however soothing the chorus of delicate flattery in the press, he knows as well as every disinterested observer that there stand between him and total oblivion in the West only two things, of all the things in the world most frail — a passing fashion and a beautiful presence. When these will be gone will Europe and America still cherish the memory of this silken Mandarin who came out of the East to their people as a new wise man?'

এই প্রশ্নের উত্তর আজ মিলিয়াছে; উহা কি, না বলিলেও চলে। আর, আমি যে অনুমানমাত্র করিয়াছিলাম তিনি পাশ্চাত্ত্য সম্মানের অলীকতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহাও সত্য। ১৯২৯ সনেই তিনি একটি উক্তি করিয়াছিলেন, প্রমাণ হিসাবে আমি উহা পরে উদ্ধৃত করিব। তবু তিনি পাশ্চাত্ত্য সম্মানের মুখাপেক্ষিতা ছাড়িতে পারেন নাই। ইহারও কারণ স্বজাতি বাঙালীর মুখাপেক্ষিতা। সেই মুখাপেক্ষিতার জন্যই তিনি সারাজীবন বাঙালীর ভালবাসার প্রত্যাশী রহিলেন এবং তাহা না পাইয়া পাশ্চাত্ত্য মৃগতৃষ্ণিকার দিকে ক্রমাগত ছুটিলেন। ১৯১৩ সনে নোবেল প্রাইজ পাইবার পর তিনি ছয়বার পাশ্চাত্ত্য দেশে গিয়াছিলেন ও ছয়বার এসিয়ার অন্য দেশে গিয়াছিলেন। এই ছুটাছুটির ব্যর্থতার কথা পরে বলিব। এই নিষ্ঠুর সত্য তিনি উপলব্ধি করিয়াও গ্রহণ করেন নাই। মাইকেল মধুসূদন বলিয়াছিলেন —

'আশার ছলনে ভুলি, কি ফল লভিনু হায়।
জীবনপ্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে ধায়,
ফিরাব কেমনে?
রে প্রমত্ত মন মম কবে পোহায়িবে রাতি,
জাগিবি রে কবে? ...'

(মাইকেল জাগিতে পারিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ পারেন নাই।)

বাঙালীর অনাদর তাঁহাকে পাশ্চাত্ত্যের মুখাপেক্ষী করিয়া রাখিল, অথচ তাঁহার মন হইতে সেই অনাদরের ক্ষোভ কখনই ঘুচাইতে পারে নাই। তাই তিনি জীবনের শেষের দিকেও অভিমান করিয়া লিখিলেন, —

'যেটা যথার্থ ক্ষোভের বিষয় সেটা এই যে, আমার দেশে আমার নিন্দার ব্যবসায়ে জীবিকা ভালো চলে, বুঝতে পারি আমার সম্বন্ধে তীব্র বিদ্বেষ কতদূর পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে আমার দেশে। আমার প্রতি আঘাত, আমাকে অবমাননা দেশের লোককে কতই কম বেদনা দেয়। তা যদি না হোত তাহলে আমার বিরুদ্ধে নিন্দার পণ্য এত লাভজনক হোত না।'

ইহার তারিখ ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩।

তিনি বৃদ্ধবয়সে বাঙালীর নিন্দা ও উপেক্ষা সম্বন্ধে এই দুর্বলতা কেন দেখাইলেন তাহা বোঝা কঠিন। এ-যেন হিস্টিরিয়াপ্রবণ পত্নীর 'যেচে মান কেঁদে সোহাগ' করার মত। অল্পবয়সে কখনই তাঁহার চরিত্রে এই দুর্বলতা দেখা যায় নাই। তিনি ১৯০১ সনে লিখিয়াছিলেন, —

'তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।
তোমার সেবার মহান দুঃখ সহিবারে দাও ভকতি॥'

আবার ১৯০৫ সনে লিখিয়াছিলেন, —

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে।'

এও তিনি বলিয়াছিলেন, —

'যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয় —
তবে পরাণ খুলে
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বল রে ॥'

সর্বোপরি ১৯১০ সনে 'গোরা'তে পরেশবাবুর চরিত্র অঙ্কন করিতে গিয়া লোকের নিন্দা বা উপেক্ষা সম্বন্ধে নিজেরই মনোভাব জানাইলেন, লিখিলেন —

'তিনি নিন্দিত হইতেন, কিন্তু নিন্দাকে তিনি এমন করিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেন যে হয়তো তাহা তাঁহাকে আঘাত করিত, কিন্তু বিদ্ধ করিয়া থাকিত না। তিনি মনের মধ্যে এই কথাটাই কেবলই থাকিয়া থাকিয়া আবৃত্তি করিতেন, "আমি আর কাহারও হাত হইতে কিছুই লইব না, আমি তাঁহার হাত হইতেই সমস্ত লইব।"

ইহা আত্মসমাহিত রবীন্দ্রনাথের সংকল্প, কিন্তু তাঁহার আত্মঘাতী রূপ তাঁহাকে বাঙালীর মুখ চাহিয়া থাকিবার মোহ হইতে মুক্তি দিল না।
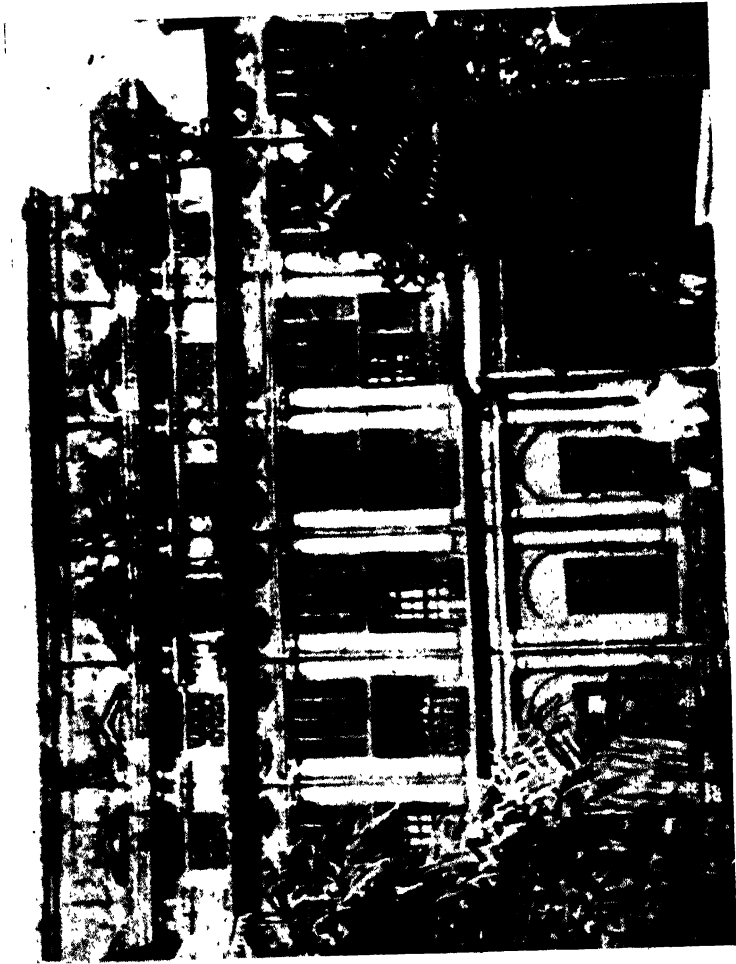
জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি

প্রথম অধ্যায়

শৈশব ও বাল্যকাল

রবীন্দ্রনাথের জীবনের দ্বিত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিবার তাহা সাধারণভাবে বলিলাম। এখন দেখাইতে হইবে এই দ্বিত্ব তাঁহার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে কি-ভাবে দেখা দিল। ইহা তাঁহার শৈশবে, বাল্যকালে যৌবনে দেখা যায় নাই, কিন্তু সেই সময়ে তাঁহার চরিত্র ও মন যে-ভাবে গঠিত হইল তাহা হইতেই পরজীবনের দ্বিত্ব উদ্ভূত হইয়াছিল। দ্বন্দ্বটা আসলে বাধিল সত্য রবীন্দ্রনাথের সহিত তখনকার বাঙালী সমাজের বিরোধ হইতে। তখন আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথের জন্ম হইল। বইটার এই ভাগে সত্য রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দিব।

তাঁহার শৈশব ও বাল্যকালের জীবনযাত্রা মোটেই আলালের ঘরের দুলালের জীবনযাত্রা হয় নাই। আরও আশ্চর্যের কথা এই যে, উহা সম্পন্ন বাঙালীর ঘরের যত্নপালিত পুত্রদের জীবনের মতও হয় নাই। এ-বিষয়ে তিনি কি বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়াই কাহিনীটি আরম্ভ করি। তিনি দেবেন্দ্রনাথের চতুর্দশতম সন্তান, তাঁহার পর আরও একটি সন্তান জন্মিয়াছিল, কিন্তু বাঁচে নাই। সুতরাং সর্বকনিষ্ঠ সন্তান, অর্থাৎ কোলের ছেলে হইলেন। তবু তিনি প্রশ্রয় পাওয়া দূরে থাকুক, বাড়ীর ছোট ছেলের প্রাপ্য আদরও পান নাই। তিনি 'জীবনস্মৃতি'-তে লিখিয়াছেন,—

'ভগবদ্‌গীতায় পিতার মনের মতো শ্লোকগুলি চিহ্নিত করা ছিল। সেইগুলি বাংলা-অনুবাদ সমেত আমাকে কাপি করিতে দিয়াছিলেন। বাড়িতে আমি নগণ্য বালক ছিলাম, এখানে আমার 'পরে এই-সকল গুরুতর কাজের ভার পড়াতে তাহার গৌরবটা খুব করিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম।'

মনে রাখিতে হইবে, তখনকার দিনে কে-কাহার সঙ্গে গল্পে-সল্পে বা আমোদে যোগ দিতে পারে সে-সম্বন্ধে বয়স ও সম্বন্ধ অনুযায়ী নিষেধ ও অনুমতি ছিল। শৈশবে নিষেধের সংখ্যাই বেশী ছিল। সেই নিষেধ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বালিকা পত্নী সম্বন্ধেও শিশুপ্রায় রবীন্দ্রনাথের উপর জারি করা হইল। ইহার বিবরণ রবীন্দ্রনাথ 'ছেলেবেলায়' দিয়াছেন এইরূপে,—

'এমন সময় একদিন বাজ্‌ল সানাই বারোয়াঁ সুরে। বাড়িতে এল নতুন বউ, কচি শামলা হাতে সরু সোনার চুড়ি। দূরে দূরে ঘুরে বেড়াই সাহস হয় না কাছে আসতে। ও এসে বসেছে আদরের আসনে, আমি যে হেলাফেলার ছেলেমানুষ।'

'মনে আছে দিদি (সম্ভবত দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা বর্ণকুমারী) বেড়াচ্ছিলেন ছাদের উপর নতুন বউকে পাশে নিয়ে, মনের কথা বলাবলি চলছিল। আমি কাছে যাবার চেষ্টা করতেই এক ধমক। এ পাড়া যে ছেলেদের দাগকাটা গণ্ডীর বাইরের। আবার শুকনো মুখ করে ফিরতে হবে সেই ছ্যাৎলাপড়া পুরানো দিনের আড়ালে।'

দশ বৎসর বয়সে আমিও এইভাবে বিতাড়িত হইয়াছিলাম। ১৯০৭ সনে আমার নিকট জ্ঞাতি এক ভাইপোর বিবাহ হইয়াছিল, তাহার বয়স কুড়ি-বাইশ। বিবাহের পরের দিন আমার মা ও অন্যান্য ঠাকুরমা-দিদিমা স্থানীয় গৃহিণীরা নাৎবৌকে লইয়া তামাসা করিতেছেন, এমন সময় সেই হাসিখুসির ভাগিদার হইবার জন্য আমি গিয়া দাঁড়াইলাম। গৃহিণীরা এক স্বরে ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, 'তুই খুড়শ্বশুর, এখানে কেন, যা পালা।' রবীন্দ্রনাথের মতই 'শুকনো মুখে' চলিয়া আসিতে হইল, বয়স যাহাই হউক-না-কেন সম্বন্ধে খুড়শ্বশুর ছিলাম তো বটে।

আর একটু বড় হইবার পরও রবীন্দ্রনাথকে এইরূপ নিষেধ মানিতে হইল। একবার কলিকাতায় ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ হওয়াতে তাঁহাদের সমস্ত পরিবার পেনেটিতে (বর্তমানে খাস কলিকাতার মেয়েরাও যাহাকে পানিহাটি বলে) ছাতুবাবুর বাগানে গিয়া কিছুদিনের মত ছিলেন। সেইখানে তাঁহার অভিভাবকস্থানীয়েরা বেড়াইতে যাইতেন। একদিন তাঁহারা যখন যাইতেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সঙ্গ লইবার চেষ্টা করিলেন, ফল কি হইল রবীন্দ্রনাথ বলিলেন —

'আমি কৌতূহলের আবেগ সামলাইতে না পারিয়া তাঁহাদের অগোচরে পিছনে পিছনে কিছু দূরে গিয়াছিলাম। ....এমন সময়ে আমার অগ্রবর্তীরা হঠাৎ টের পাইলেন আমি পিছনে আছি। তখনই ভর্ৎসনা করিয়া উঠিলেন, "যাও যাও, এখনি ফিরে যাও।" — তাঁহাদের মনে হইয়াছিল, বাহির হইবার মত সাজ আমার ছিল না। পায়ে আমার মোজা নাই, গায়ে একখানি জামার উপর অন্য-কোনো ভদ্র আচ্ছাদন নাই — ইহাকে তাঁহারা আমার অপরাধ বলিয়া গণ্য করিলেন। কিন্তু মোজা এবং পোষাক পরিচ্ছদের কোনো উপসর্গ আমার ছিলই না, সুতরাং কেবল সেইদিনেই যে হতাশ হইয়া আমাকে ফিরিতে হইল তাহা নহে, ত্রুটি সংশোধন করিয়া ভবিষ্যতে আর একদিন বাহির হইবার উপায়ও রহিল না।'

এই সব কথা স্মরণ করিয়া তিনি ১৯২৯ সনে লিখিলেন, 'আজ সেই শীতের সকালের অনাদৃত রবি জাহাজে চড়ে চলেছে বৃহৎ জগতে।' সেই শীতের সকালটা তাঁর নয়-দশ বৎসর বয়সের। সংগল পাঁচটা মতন, কলিকাতার বাড়ীতে, চির-অভ্যাসমত ভোরে উঠিয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন, গায়ে খুব অল্প কাপড়, সুতির জামার নীচে ইজার মাত্র পরা। এই বাল্যকাল সম্বন্ধে লিখিলেন,

'ছিলুম স্রোতের শেওলার মতো — 'সংসারপ্রবাহের উপরতলে হালকাভাবে ভেসে বেড়াতুম — কোথাও শিকড় পৌঁছয়নি — যেন কারো ছিলাম না, সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত চাকরদের কাছেই থাকতে হত, কারো কাছে কিছুমাত্র আদর পাবার আশা ছিল না।'

তাই তিনি লিখিলেন,—

'শূন্যতার মাঝখানে বসে কেবলই চেয়ে থাকতুম আকাশের দিকে। ছেলেবেলায় বাস্তব জগৎ থেকে দূরে ছিলুম বলেই তখন থেকে চিরদিন আমি "সুদূরের পিয়াসী"।' —

'ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী
বক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার সে কথা যে যাই পাশরি।'

কিন্তু কেহ তাঁহাকে ইচ্ছা করিয়া অনাদর করিত তাহা মনে করিলে ভুল হইবে। শিশু ও বালকদের সম্বন্ধে সে-যুগের রীতিই ছিল তাহারা প্রাপ্তবয়স্কদের জীবনের ভাগ পাইবে না, তাহারা ভৃত্যরাজকতন্ত্রে ভৃত্যদের যত্নে ও শাসনে শিশুর মতই থাকিবে। আমার পিতাও তাঁহার বাল্যবয়স সম্বন্ধে এই কথাই বলিতেন। বিলাতের অভিজাত সমাজেও তাহাই ছিল। সেই সময়ের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

'আমরা ছিলাম চাকরদেরই শাসনের অধীনে। নিজেদের কর্তব্য সরল করিয়া লইবাব জন্য তাঁহারা আমাদের নড়াচড়া এক প্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছিল।'

ইহা শিশু রবীন্দ্রনাথের উপর কি-ভাবে প্রয়োগ হইত তাহার একটি বিবরণ এইরূপ,—

'আমাদের এক চাকর ছিল, তাহার নাম শ্যাম। শ্যামবর্ণ দোহারা বালক, মাথায় লম্বা চুল, খুলনা জেলায় তাহার বাড়ী। সে আমাকে ঘরের একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া আমার চারিদিকে খড়ি দিয়া গণ্ডী কাটিয়া দিত। গম্ভীর মুখ করিয়া তর্জ্জনী তুলিয়া বলিয়া যাইত, গণ্ডীর বাহিরে গেলেই বিষম বিপদ। বিপদটা আধিভৌতিক কি আধিদৈবিক স্পষ্ট করিয়া বুঝিতাম না, কিন্তু মনে বড় একটা আশঙ্কা হইত। গণ্ডী পার হইয়া সীতার কি সর্ব্বনাশ হইয়াছিল তাহা রামায়ণে পড়িয়াছিলাম, এই জন্য গণ্ডীটাকে নিতান্ত আনাড়ীর মত উড়াইয়া দিতে পারিতাম না।'

তখনকার বনিয়াদী বাড়ীতে প্রাপ্তবয়স্ক ও ছেলেদের জীবনযাত্রার যে-প্রভেদ ছিল তাহা ধনী ও দরিদ্রের জীবনযাত্রার পার্থক্যের মত। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

'আমাদের চেয়ে যাঁহারা বড়ো তাঁহাদেব গতিবিধি, বেশভূষা, আহার-বিহার, আরাম আমোদ, আলাপ-আলোচনা সমস্তই আমাদের কাছ হইতে বহুদূরে ছিল। তাহার আভাস পাইতাম কিন্তু নাগাল পাইতাম না। এখনকার কালে ছেলেরা গুরুজনদিগকে লঘু করিয়া লইয়াছে, কোথাও তাহাদের কোনো বাধা নাই এবং না-চাহিতেই তাহারা সমস্ত পায়। আমরা এত সহজে কিছুই পাই নাই। কত তুচ্ছ সামগ্রীও আমাদের পক্ষে দুর্লভ ছিল; বড হইলে কোনো-এক সময়ে পাওয়া যাইবে, এই আশায় তাহাদিগকে দূর ভবিষ্যতের জিম্মায় সমর্পণ করিয়া বসিয়াছিলাম।'

এই অবস্থা বিবেচনা করিয়া তিনি লিখিলেন,

'আমাদের শিশুকালে ভোগবিলাসের আয়োজন ছিল না বলিলেই হয়। মোটের উপরে তখনকার জীবনযাত্রা এখনকার চেয়ে অনেক বেশী সাদাসিধা ছিল। তখনকার কালের ভদ্রলোকের মানরক্ষার উপকরণ দেখিলে এখনকার কাল লজ্জায় তাহার সহিত সকল সম্পর্ক অস্বীকার করিতে চাহিবে।'

বিশেষ করিয়া বালকদের আহারে শৌখীনতার গন্ধও ছিল না। তাহার উপর চাকরেরা কার্পণ্য দেখাইত। যে চাকরটির উপর রবীন্দ্রনাথ ও অন্য বালকদের খাওয়াইবার ভার ছিল তাহার আচরণের বিবরণ তিনি সবিস্তারেই দিয়াছেন, এইরূপে —

'আমাদের জলখাবার সম্বন্ধেও তাহার অত্যন্ত সঙ্কোচ ছিল। আমরা খাইতে বসিতাম। লুচি আমাদের সামনে একটা মোটা কাঠের বারকোশে রাশ-করা থাকিত। প্রথমে দুই-একখানা মাত্র লুচি যথেষ্ট উচু হইতে শুচিতা বাঁচাইয়া সে আমাদের পাতে বর্ষণ করিত....তাহার পর ঈশ্বর প্রশ্ন করিত, আরও দিতে হইবে কিনা। আমি জানিতাম কোন্ উত্তরটি সর্ব্বাপেক্ষা সদুত্তর বলিয়া

তাহার কাছে গণ্য হইবে। তাহাকে বঞ্চিত করিয়া দ্বিতীয়বার লুচি চাহিতে আমার ইচ্ছা করিত না।'

ইহার পর জলখাবারের কথা রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন,—

'বাজার হইতে আমাদের জন্য বরাদ্দমত জলখাবার কিনিবার পয়সা ঈশ্বর (চাকরের নাম) পাইত। আমরা কি খাইতে চাই প্রতিদিন সে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া লইত। জানিতাম, সস্তা জিনিষ ফরমাস করিলে সে খুশী হইবে। কখনও মুড়ি প্রভৃতি লঘু পথ্য, কখনো বা ছোলাসিদ্ধ চিনাবাদাম-ভাজা প্রভৃতি অপথ্য আদেশ করিতাম।'

এইভাবে রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতেই অল্পাহারে অভ্যস্ত হইলেন। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন যে, ইহার জন্য বলবান হইবার পথে বাধা পড়ে নাই। তিনি সমবয়সী অনেককেই কুস্তি ইত্যাদিতে বা অন্যভাবে দেহের বল প্রদর্শনে হারাইয়া দিতে পারিতেন। তবে যখন তিনি বিলাতে ছিলেন, তখন যে-ইংরেজ-গৃহিণীর তত্ত্বাবধানে তিনি ছিলেন সেই মহিলা তাঁহার স্বল্পাহার দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইতেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন, 'তিনি জানতেন না ছেলেবেলা থেকে আমার শরীরে ব্যামো হবার গেট বন্ধ। প্রতিদিন সকালবেলা বরফগলা জলে স্নান করেছি।'

রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক জোড়াসাঁকোর বাড়ীও ছিল সে-যুগের তিন মহলা বাড়ী, পিছনে বাগান ও পুকুরসহ। সদরে প্রাপ্তবয়স্কেরা দিন কাটাইতেন, অন্দরের একভাগে বাড়ীর গৃহিণীরা ও কন্যারা থাকিতেন, অন্য ভাগে আশ্রিতেরা ও চাকরবাকরেরা। সরকারী রান্নার ব্যবস্থাও অন্দরের সেইভাগেই ছিল। অন্দরের দুইভাগের জীবনযাত্রার বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন।

'বাড়ীতে মেয়েদের খোঁপা থেকে বেলফুলের গোড়েমালার গন্ধ ছড়িয়ে যেত বাতাসে। গা ধুতে যাবার আগে ঘরের সামনে বসে সমুখে হাত-আয়না রেখে মেয়েরা চুল বাঁধত। বিনুনিকরা চুলের দড়ি দিয়ে খোঁপা তৈরী হতো নানা কারিগরিতে। তাদের পরণে ছিল ফরাসডাঙ্গার কালাপেড়ে শাড়ি, পাক দিয়ে কুঁচকিয়ে তোলা। নাপতিনি আসত, ঝামা দিয়ে পা ঘষে আলতা পরাতো। মেয়েমহলে তারাই লাগতো খবর চালাচালির কাজে।'

বাড়ীর কাজকর্মের দিকটার বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ এইভাবে দিয়াছেন। সেদিকের ছাতে এইসব দেখা যাইত,—

'ঐখানে মেয়েরা বসত পিতলের গামলা-ভরা কলাই-বাটা নিয়ে। টিপে টিপে টপ টপ করে বড়ি দিত, চুল শুকোতে শুকোতে। দাসীরা বাসি কাপড় কেচে মেলে দিয়ে যেত রোদ্দুরে। কাঁচা আম ফালি করে কেটে কেটে আমসি শুকোনো হত, ছোট বড় নানা সাইজের নানা-কাজ-করা পাথরের ছাঁচে আমের রস থাকে থাকে জমিয়ে তোলা হত, রোদ খাওয়া সর্ষের তেলে মজে উঠত ইচড়ের আচার। কখনো কখনো আমার উপরে ভার পড়ত জাঁতি দিয়ে সুপুরী কাটবার। দাসীরা সন্ধেবেলায় বসে উরুতের উপর সলতে পাকাতো।'

রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন, 'এইসব মেয়েলি কাজে পাড়াগাঁয়ের একটা স্বাদ ছিল।' বাড়ীর সব জায়গায় যাইবার অধিকার ছেলেদের ছিল না। রবীন্দ্রনাথ

সেজন্য সময় কাটাইতেন পিছনের বাগানে। তিনি লিখিয়াছেন, 'বাড়ির ভিতরের বাগান তাঁহার সেই স্বর্গের বাগান (Garden of Eden) ছিল।'

কিন্তু বাড়ীর অনেক জায়গা নিষিদ্ধ ছিল বলিয়া ভিতরেও যাহা থাকিবার নয় তাহা আছে কল্পনা করা যাইত। রবীন্দ্রনাথের সমবয়স্কা একটি মেয়ে তাঁহার খেলার সঙ্গিনী ছিল। সে তাহাকে বলিত যে, বাড়ীর একটা অংশ রাজার বাড়ী। সেটা কোথায় সেই সংবাদ তিনি বালিকার কাছ হইতে বাহির করিতে পারেন নাই। তিনি লিখিলেন, 'কতবার বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, "রাজার বাড়ী কি আমাদের বাড়ির বাহিরে" সে বলিয়াছে, "না, এই বাড়ীর মধ্যেই।" কখনো-কখনো বালিকার কাছে তিনি শুনিতেন, আজ সেখানে গিয়াছিলাম। কিন্তু কখনো তিনি তাহার সঙ্গ ধরিয়া রাজবাড়ী দেখিতে পাইলেন না।

এই সেকালের জীবনযাত্রার মধ্যে শুধু একটা জিনিস ছিল বাঙালীর আধুনিক জীবনের, সেটা তখনই পূর্ণবিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেটা অবশ্য শিক্ষা, সকাল-সন্ধ্যা বাড়ীতে পড়া গৃহশিক্ষকের কাছে, দিনে পড়া স্কুলে। ইহার বিরাম ছিল না। রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ছিলেন এই শিক্ষার কর্তা। তিনি কোনো দিকে একটু ঢিলা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, ইতিহাস, গান ইত্যাদি তো গৃহশিক্ষকের কাছে পড়িতে হইতই, এমন কি ক্যাম্পবেল স্কুলের একটি ছাত্র আসিয়া তাঁহাদের অস্থিবিদ্যা শিখাইত। ইহার কথা স্মরণ করিয়াই রবীন্দ্রনাথ 'কঙ্কাল' গল্পে লিখিয়াছিলেন, 'আমাদের অভিভাবকের ইচ্ছা ছিল আমাদিগকে সহসা সর্ববিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তুলিবেন। তাঁহার অভিপ্রায় কতদূর সফল হইয়াছে যাঁহারা আমাদিগকে জানেন তাঁহাদের কাছে প্রকাশ করা বাহুল্য এবং যাঁহারা জানেন না, তাঁহাদের নিকট গোপন করাই শ্রেয়ঃ।' এই শিক্ষার লক্ষ্য ছিল তিন বালক — ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ, দাদা সোমেন্দ্রনাথ — দুইজনেই তাঁহার দুই বৎসরের বড় — এবং তিনি নিজে।

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন অত্যন্ত কম, তখন তাঁহার চেয়ে বড় বালকেরা স্কুলে ভর্তি হইল। তিনি তাহাদের মুখে স্কুলের বর্ণনা শুনিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—

> 'যিনি আমাদের শিক্ষক ছিলেন তিনি আমার মোহ বিনাশ করিবার জন্য প্রবল চপেটাঘাত করিয়া এই সারগর্ভ কথাটি বলিয়াছিলেন, "এখন ইস্কুলে যাবার জন্য যেমন কাঁদিতেছ, না-যাবার জন্য ইহার চেয়ে অনেক বেশী কাঁদিতে হইবে।"
>
> এতবড়ো অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী জীবনে আর কোনোদিন কর্ণগোচর হয় নাই।'

এক স্কুল হইতে আর এক স্কুলে বদল করিয়া তাঁহাকে চারিটি স্কুলে দেওয়া হইল, শেষ স্কুল সেন্ট জেবিয়ার্স। কিন্তু কোনো ফল হইল না।

রবীন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে লিখিলেন,

'দাদারা মাঝে মাঝে এক-আধবার চেষ্টা করিয়া আমার আশা একেবারে ত্যাগ করিলেন। আমাকে ভর্ৎসনা করাও ছাড়িয়া দিলেন। একদিন বড়দিদি কহিলেন, "আমরা সকলেই আশা করিয়াছিলাম, বড় হইলে রবি মানুষের মতো হইবে, কিন্তু তাহার আশাই সকলের চেয়ে নষ্ট হইয়া গেল।'

এই দিদি সৌদামিনী দেবী, সত্যপ্রসাদের মাতা। তাহার পর কিছুদিন কেবল বাড়ীতে শিক্ষক রাখিয়া পড়াশোনা করানো হইল।

একটা বিষয়ে কষ্ট পাইলেও তাঁহার লাভ হইয়াছিল—সেটা বাংলা ভাষা শিক্ষায়। তিনি যখন ছাত্রবৃত্তি-ক্লাসের এক ক্লাস নীচে বাংলা পড়িতেছিলেন তখন সে-ক্লাসের বাংলা পাঠ্য ছাড়াইয়া অনেক অগ্রসর হইয়া গিয়াছিলেন। সে-সময়ে এবং আমার বাল্যকালেও 'মেঘনাদবধ কাব্য' বুঝিতে পারিলে বাংলা শিক্ষা সন্তোষজনক হইল মনে করা হইত। এই পর্যন্ত পড়িয়া তাঁহার ও তাঁহার সমপাঠীদের বাংলা এতদূর অগ্রসর হইল যে দেবেন্দ্রনাথ বাংলা পড়া বন্ধই করিয়া দিলেন। ব্যাপারটা তামাসার। তাঁহাদের স্কুলের একজন শিক্ষক দ্বারকানাথ ঠাকুরের কিশোরীমোহন মিত্রের লেখা ইংরেজী জীবনী পড়িতে চাহিয়াছিলেন। ইহার জন্য সত্যপ্রসাদ মাতামহের কাছে গেলেন। এবার কাহিনীটা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় দিতেছি—

'সে মনে করিয়াছিল, সর্বসাধারণের সঙ্গে সচরাচর যে প্রাকৃত বাংলায় কথা কহিয়া থাকি সেটা তাঁহার কাছে চলিবে না। সেজন্য সাধু গৌড়ীয় ভাষায় এমন অনিন্দনীয় রীতিতে সে বাক্যবিন্যাস করিয়াছিল যে, পিতা বুঝিলেন, আমাদের বাংলাভাষা অগ্রসর হইতে হইতে শেষকালে নিজের বাংলাত্বকেই প্রায় ছাড়াইয়া যাইবার জো করিয়াছে।'

দেবেন্দ্রনাথ পরের দিন জানাইলেন, 'আজ হইতে তোমাদের আর বাংলা পড়িবার দরকার নাই।' এই সংবাদ যখন বাংলার শিক্ষক নীলরতন পণ্ডিত মহাশয়কে দেওয়া হইল, তিনি বিদায় লইবার সময়ে বলিলেন, 'কর্তব্যের অনুরোধে তোমাদের প্রতি অনেক সময় অনেক কঠোর ব্যবহার করিয়াছি, সে-কথা মনে রাখিয়ো না। তোমাদেব যাহা শিখাইয়াছি ভবিষ্যতে তাহার মূল্য বুঝিতে পারিবে।' তিনি সত্যই বলিয়াছিলেন।

প্রচলিত শিক্ষারীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিরাগ আসিয়াছিল তাঁহার চরিত্রের স্বাধীনতাপ্রিয়তার জন্য। এ-বিষয়ে তিনি শার্লট ব্রন্টির ভগিনী এমিলি ব্রন্টির মত ছিলেন। এমিলি সম্বন্ধে শার্লট লিখিয়াছিলেন,

'Liberty was the very breath of Emily's nostrils; without it she perished. The change from her home to a school and from her very noiseless, very secluded mode of life to one of disciplined routine (though under the kindest of auspices) was what she failed in enduring.'

ইহা রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের বর্ণনা বলা যাইতে পারে। তিনি ইস্কুল পালাইবার প্রসঙ্গে উহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে-কথাগুলি লিখিয়াছিলেন, তাহা

হইতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছিলেন ইস্কুল পালানোর উদ্দেশ্য দুইরকমের হইতে পারে, এক না-পড়া, অন্য ইচ্ছামত পড়া। ইচ্ছামত পড়া সম্বন্ধে বালক রবীন্দ্রনাথের অনিচ্ছা ছিল না। তবে একদিক হইতে স্কুলের শৃঙ্খল তাঁহার পক্ষে কঠিন হয় নাই। এই কথাটা তিনি এইভাবে বুঝাইয়াছেন—'এই বিদ্যালয়ে আমার মতো ছেলের একটা মস্ত সুবিধা এই ছিল যে, আমরা যে লেখাপড়া করিয়া উন্নতিলাভ করিব, সেই অসম্ভব দুরাশা আমাদের সম্বন্ধে কাহারও মনে ছিল না।'

তাঁহার পিতা সামাজিক ব্যাপারে নিয়মপালন সম্বন্ধে কড়া হইলেও কনিষ্ঠ পুত্রের স্বাধীনভাবে চলায় বাধা দিতেন না। রবীন্দ্রনাথের অল্পবয়সে দেবেন্দ্রনাথ প্রায়ই দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়া যাইতেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে তিনি পুত্রের কাছে প্রায় অপরিচিতই ছিলেন বলা চলে। তবে রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন হইবার পর যখন তিনি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া হিমালয়ের মধ্যে ডালহৌসী শহরে লইয়া গেলেন তখন পিতার কর্তব্য ও পিতার উদারতা দুইই দেখা গেল। দুই-এরই পরিচয় দিব।

দেবেন্দ্রনাথ লোকসমক্ষে পোষাকপরিচ্ছদ সম্বন্ধে শৈথিল্য একেবারেই সহ্য করিতে পারিতেন না। রবীন্দ্রনাথ একদিন যখন তাঁহার অভ্যাসমত অপ্রচুর পোষাক পরিয়া পিতার কাছে গেলেন তখন তাঁহাকে চাপকান ও টুপি পরিয়া আসিতে বলা হইল। ডালহৌসী যাইবার সময় ট্রেনেও সেই নিয়মকানুন দেখা গেল। তাহার কথা রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন,—

> 'আমার বয়সে এই প্রথম আমার জন্য পোশাক তৈরী হইয়াছে। কি রং-এর কিরূপ কাপড় হইবে তাহা পিতা স্বয়ং আদেশ করিয়া দিয়াছিলেন। মাথার জন্য একটা জরীর কাজ করা গোল মখমলের টুপি হইয়াছিল। সেটা আমার হাতে ছিল, কারণ নেড়া মাথার উপর টুপি পরিতে আমার মনেমনে আপত্তি ছিল। গাড়িতে উঠিয়াই পিতা বলিলেন, 'মাথায় পরো।' পিতার কাছে যথারীতি পরিচ্ছন্নতার ত্রুটি হইবার জো নাই। লজ্জিত মস্তকের উপর টুপিটা পরিতেই হইল। রেলগাড়িতে একটু সুযোগ বুঝিলেই টুপিটা খুলিয়া রাখিতাম। কিন্তু, পিতার দৃষ্টি একবারও এড়াইত না। তখনই সেটা স্বস্থানে তুলিতে হইত।'

ইহার পর ডালহৌসী পৌঁছিয়াও অন্যদিকে নিয়মপালন কমিল না। রবীন্দ্রনাথ দেখিতেন, 'পিতা আমাকে ঠেলিয়া জাগাইয়া দিতেছেন। তখনো রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। "উপক্রমণিকা" হইতে "নরঃ নরৌ নরাঃ" মুখস্থ করিবার জন্য আমার সেই সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। শীতের কম্বলরাশির তপ্তবেষ্টন হইতে বড় দুঃখের এই উদ্বোধন।' ইহা ছাড়া 'বেলা দশটার সময় বরফগলা ঠাণ্ডা জলে স্নান করিতে হইত। ইহা হইতে কোনোমতেই অব্যাহতি ছিল না; তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে ঘড়ায় গরম জল মিশাইতেও ভৃত্যেরা কেহ সাহস করিত না।'

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ পাহাড়ের বিপদসঙ্কুল জায়গায় বালকপুত্রকে একা একা বেড়াইতে দিতে আপত্তি করিতেন না। ডালহৌসিতে তিনি বাক্রোটা

পাহাড়ে বাংলো নিয়াছিলেন। সেটা নিজ শহরের প্রায় এক হাজার ফুট উপরে। আমি তাহার দক্ষিণ দিকের ঢাল দেখিয়াছি, ঘন পাইনবনে ঢাকা, পা ফসকাইলে বহু নীচে পড়িয়া গুঁড়া হইয়া যাইবার কথা। তবু রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন—

'সেই বনে আমি একলা আমার লৌহফলকবিশিষ্ট লাঠি লইয়া প্রায় বেড়াইতে যাইতাম। বনস্পতিগুলা প্রকাণ্ড দৈত্যের মত মস্ত মস্ত ছায়া লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের কতশত বৎসরের বিপুল প্রাণ। কিন্তু, এই সেদিনকার অতি ক্ষুদ্র একটি মানুষের শিশু অসঙ্কোচে তাহাদের গা ঘেঁষিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা একটি কথাও বলিতে পারে না। বনের ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই যেন তাহার একটা বিশেষ স্পর্শ পাইতাম। যেন সরীসৃপের গাত্রের মত একটা ঘন শীতলতা, এবং বনতলের শুষ্ক পত্ররাশির উপরে ছায়া-আলোকের পর্য্যায় যেন প্রকাণ্ড একটা আদিম সরীসৃপের গাত্রের বিচিত্র রেখাবলী।'

রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার চরিত্র, কার্যকলাপ ও জীবনের কথা পড়িতে পড়িতে একটা আশ্চর্যকর সাদৃশ্য অনুভব করিয়াছি—সেটা বিখ্যাত ফরাসী লেখক শাতোব্রিয়ঁর সহিত। তিনিও বাল্যবয়সে কনিষ্ঠপুত্র হওয়া সত্ত্বেও উপেক্ষিত ছিলেন, মাতার স্নেহ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রই অধিকার করিয়া রাখিয়াছিলেন, চার দিদির মধ্যে তিনটি তাঁহাদের সমাজেই থাকিতেন, শুধু ছোট দিদি লুসিল, তাঁহার চেয়ে চার বছরের বড়, তবে তেমনই উপেক্ষিতা, একমাত্র সঙ্গিনী ছিলেন। তাঁহারা দুইজনে বনে বনে বেড়াইতেন। পিতার শাসন এবং ভয়ও তেমনি ছিল। পড়াশোনাতেও তেমনই শৈথিল্য ছিল, এক স্কুল হইতে অন্য স্কুলে তাঁহাকেও যাইতে হইয়াছিল।

শাতোব্রিয়ঁর শৈশব ও বাল্যজীবনের দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিব। তিনি লিখিয়াছেন,—

'লুসিল ভাল করিয়া পড়িতে পারিত না, আমার পড়া আরও খারাপ ছিল। সকলে তাহাকে বকিত, আমি দিদিদের খামচাইয়া দিতাম, মায়ের কাছে নালিশ পৌঁছিত। আমাকে সকলে দুষ্ট বালক বলিয়া, বিদ্রোহী বলিয়া, অলস বলিয়া, এক কথায় একটি গাধা বলিয়া প্রচার করিল। এই ধারণা পিতামাতার মনেও প্রবেশ করিল। পিতা বলিলেন, "শাতোব্রিয়ঁ-বংশের ছোট পুত্রেরা চিরকাল ডালকুত্তার পিছনে দৌড়িয়াছে, মদ খাইয়াছে, ও ঝগড়া করিয়াছে।" মা আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রশংসা করিয়া আমাকে আরও বিদ্রোহী করিয়া তুলিলেন। আমি ঠিক করিলাম যত অপকার্য সম্ভব তাহা আরও বেশী করিয়া করিব।'

কিশোর বয়সে পৌঁছিবার পর শাতোব্রিয়ঁর সন্ধ্যা এইভাবে কাটিত।

খাইবার পর লুসিলের সঙ্গে পাশাপাশি চেয়ারে বসিয়া থাকিতেন। পিতা ঘরের একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত হাঁটিতেন, ভয়ে দুজনের মুখে একটি কথাও ফুটিত না। দশটা বাজা মাত্র পিতা নিজের শোবার ঘরে চলিয়া যাইতেন। তখন ভাইবোনের মধ্যে কথার ফোয়ারা ছুটিত। মাতাও তাহাতে যোগ দিতেন। সময় হইলে শাতোব্রিয়ঁ মাতাকে তাঁহার শোবার ঘরে পৌঁছাইয়া দিতেন। মাতা তাহাকে খাটের নীচ, চিমনী, দরজার পিছন, কাছের দালান ভাল করিয়া দেখিতে বলিতেন—পাছে কেহ এসব জায়গায়

লুকাইয়া থাকে। এই শাতোর পূর্ব-ইতিহাস, চোরেরই হউক কিংবা প্রেতাত্মারই হউক, সকলেরই মনে পড়িয়া যাইত। চাকরেরা বলিত, তিনশত বৎসর আগেকার এক পূর্বপুরুষ, যাঁহার একটি পা ছিল কাঠের, তিনি রাত্রিতে একটি কালো বিড়াল সঙ্গে লইয়া সারা রাত খট্‌খট্‌ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান।

আর এক বিষয়েও রবীন্দ্রনাথের জীবন ও শাতোব্রিয়ঁর জীবনে সাদৃশ্য দেখা গেল। যখন দেখা গেল, শাতোব্রিয়ঁ ফ্রান্সে কিছু করিবেন না, তখন তাঁহাকে বৎসর দেড়েকের জন্যে আমেরিকায় যাইতে দেওয়া হইল, এই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথকে দেড় বৎসরের মত পাঠানো হইল ইংলন্ডে। তাহার বিবরণ রবীন্দ্রনাথ এইভাবে দিলেন একটি চিঠিতে,—

'আমার বয়স ছিল সতেরো। পড়াশুনোয় ফাঁকি দিয়ে গুরুজনের উদ্বেগভাজন হয়েছি। মেজদাদা (সত্যেন্দ্রনাথ) তখন আমেদাবাদে জজিয়তি করছেন। ভদ্রঘরের ছেলের মানরক্ষার উপযুক্ত ইংরেজী যে করে হোক জানা চাই; সেজন্যে আমার বিলেতে নির্ব্বাসন ধার্য্য হয়েছে। মেজদাদার ওখানে কিছুদিন থেকে পত্তন করতে হবে তার প্রথম ভিত, হিতৈষীরা এই স্থির করেছেন। সিভিল সার্ভিসের রঙ্গভূমিতে আমার বিলিতি কায়দার নেপথ্যবিধান হল।'

পিছনে উদ্দেশ্য ছিল, রবীন্দ্রনাথকে ব্যারিস্টার করিয়া আনা। তাহা অবশ্য হয় নাই। পরজীবনে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিলেন, 'বিলেত গেলেম, ব্যারিস্টার হইনি। জীবনের গোড়াকার কাঠামোটাকে নাড়া দেবার মত ধাক্কা পাইনি।'

বিলাতে থাকার সময়ে তিনি মাঝে মাঝে সত্যেন্দ্রনাথের পরিবারে থাকিতেন, সাধারণত ইংরেজ পরিবারে ছাত্র বা অতিথি হিসাবে থাকিতেন।

প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র, যে দ্বারকানাথ ফ্রান্সের রাজা লুই-ফিলিপকে পরিবার ও সভাসদ সহ হোটেলে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, সেই দ্বারকানাথের পৌত্র বিলাতে দরিদ্র অথবা মধ্যবিত্ত ইংরেজের বাড়ীতে থাকিতেন। তাঁহার ল্যাটিন শিক্ষক ছিলেন অতি দরিদ্র, তাঁহাকে তাঁহার স্ত্রী ও কন্যারা অবহেলা ও তুচ্ছ করিত। সেখান হইতে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থার এক বাড়ীতে গেলেন, কিন্তু সেখানে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে অসদ্ভাব। স্বামী বিরক্ত হইলেই স্ত্রীর প্রিয় কুকুরটিকে মারিয়া ঝাল ঝাড়িতেন। রবীন্দ্রনাথ ইহাতে অশান্তি বোধ করিতেন। তবে দেশে ফিরিয়া আসিবার আগে তিনি একটি অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন ইংরেজ পরিবারে গেলেন, সেখানে তাঁহার খুবই ভাল লাগিয়াছিল। বাড়ীর গৃহিণী তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তাই বিদায় লইবার সময়ে তাঁহার দুই হাত ধরিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, 'এমন করিয়াই যদি চলিয়া যাইবে তবে এত অল্পদিনের জন্য কেন তুমি আসিলে।' তাঁহাকে পিতার আদেশে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল, এ-বিষয়ে নানারকম

জল্পনা-কল্পনা আছে। আমি অল্পবয়সে শুনিতাম।

তিনি এ-সময়ে যাহা দেখিলেন তাহার কথা জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন—

'এই পরিবারে বাস করিয়া আমি একটি জিনিস লক্ষ্য করিয়াছি— মানুষের প্রকৃতি সব জায়গাতেই সমান। আমরা বলিয়া থাকি এবং আমিও তাহা বিশ্বাস করিতাম যে, আমাদের দেশে পতিভক্তির একটা বিশিষ্টতা আছে, য়ুরোপে তাহা নাই। কিন্তু আমাদের দেশের সাধ্বীগৃহিণীর সহিত মিসেস্ স্কটের আমি তো বিশেষ পার্থক্য দেখি নাই। স্বামীর সেবায় তাঁহার সমস্ত মন ব্যাপৃত ছিল।'

আরও লিখিলেন—

'তাঁহার সেই আত্মবিসর্জনের মধুর নম্রতা স্মরণ করিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারি, স্ত্রীলোকের প্রেমের স্বাভাবিক চরম পরিণাম ভক্তি। যেখানে তাহাদের প্রেম আপন বিকাশে কোনো বাধা পায় না সেখানে তাহা আপনি পূজায় আসিয়া ঠেকে। যেখানে ভোগবিলাসের আয়োজন প্রচুর, যেখানে আমোদপ্রমোদই দিনরাত্রিকে আবিল করিয়া রাখে, সেখানে এই প্রেমের বিকৃতি ঘটে; সেখানে স্ত্রী-প্রকৃতি আপনার পূর্ণ আনন্দ পায় না।'

বিলাতফেরত রবীন্দ্রনাথ ব্যারিস্টার না হইলেও বিলাতফেরতের একটা নূতন সম্মিলিত বাঙালী-ইংরেজ রূপ প্রকাশ করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বাল্য হইতে যৌবনে

রবীন্দ্রনাথ বাল্য ও যৌবনের মধ্যে কি পার্থক্য তাহা একটা বিস্ময়কর উপমা দিয়া বুঝাইয়াছিলেন। কিন্তু উহার কথা বলিবার আগে প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুদের মধ্যে বাল্য ও যৌবন সম্বন্ধে কি ধারণা ছিল, তাহার পরিচয় দেওয়া উচিত মনে করি, কারণ উহাই আমাদের বাল্যকালেও জনপ্রচলিত ধারণা ছিল।

প্রথমে বাল্য ও কৈশোর সম্বন্ধে 'উত্তররামচরিত' হইতে উদ্ধৃত করি। চিত্রদর্শন করাইতে করাইতে লক্ষ্মণ, রাম ও অন্য ভ্রাতারা বিবাহের পর যে অযোধ্যা ফিরিয়া আসিবেন তাহা দেখাইলেন। রাম অশ্রুপূর্ণনয়নে বলিলেন, 'হায়, মনে পড়িতেছে, মনে পড়িতেছে। পিতা বাঁচিয়া আছেন, তাঁহার পদতলে জীবন কাটাইতেছি, সবে বিবাহ করিয়া আসিয়াছি, মাতারা সর্বদাই আমাদের চিন্তা করিতেছেন, আমাদের সেই সব দিন চলিয়া গিয়াছে।'

যৌবন সম্বন্ধে ভয়জনক কথাও অল্পবয়সেই পড়িয়াছিলাম 'কাদম্বরী'র বাংলা অনুবাদে। উহাতে মহারাজ তারাপীড়ের মহামাত্য ব্রাহ্মণ শুকনাস যুবরাজ চন্দ্রাপীড়কে উপদেশ দিলেন, 'তাত চন্দ্রাপীড়, প্রকৃতির নিয়মেই যৌবনের দ্বারা যে গহন অন্ধকারের সৃষ্টি হয় তাহাকে সূর্যের আলোক ভেদ করিতে পারে না, মণির আলোক বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না।' এইরূপ সুদীর্ঘ উপদেশ যৌবনের নানা দোষ সম্বন্ধে চলিল। আধুনিক বাংলা কবিতাতেও পড়িলাম — 'হাস, হাস, হাস, শিশু, নহে দিন দূর ...' ইত্যাদি।

পড়িয়া মুখ শুকাইয়া গেল। তাই নিজের অনিবার্য যৌবন সম্বন্ধে যুবতীদের মত 'এই যৌবন কত রাখিব বাঁধিয়া' না বলিয়া, কি করিয়া উহাকে ঠেকাইয়া রাখিব তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য ধরনের কথা 'জীবনস্মৃতি'তে বলিলেন, লিখিলেন —

> 'জীবনের এক-এক পর্যায়ে এক একটি ঋতু বিশেষভাবে আধিপত্য গ্রহণ করিয়া থাকে। বাল্যকালের দিকে যখন তাকাইয়া দেখি তখন সকলের চেয়ে স্পষ্ট করিয়া মনে পড়ে তখনকার বর্ষার দিনগুলি। ... আরও মনে পড়ে শ্রাবণের গভীর রাত্রি, ঘুমের ফাঁকের মধ্য দিয়া ঘনবৃষ্টির ঝম্‌ঝম্ শব্দ মনের ভিতরে সুপ্তির চেয়েও নিবিড়তর একটা পুলক জমাইয়া তুলিতেছে।'

কিন্তু যৌবন সম্বন্ধে লিখিলেন —

> 'আমি যে-সময়কার কথা বলিতেছি (১৮৮৬ সন, তাঁহার বয়স পঁচিশ), তাহার দিকে তাকাইলে দেখিতে পাই, তখন শরৎ ঋতু সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তখনকার জীবনটা আশ্বিনের একটা বিস্তীর্ণ স্বচ্ছ অবকাশের মাঝখানে দেখা যায় — সেই শিশিরে ঝলমল করা সরস সবুজের উপর সোনা-গলানো রৌদ্রের মধ্যে, মনে পড়িতেছে, দক্ষিণের বারান্দায়

গান বাঁধিয়া তাহাতে যোগিয়া সুর লাগাইয়া গুন গুন করিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছি, সেই শরতের সকালবেলায়।—

আজি শরত-তপনে প্রভাতস্বপনে
কি জানি পরাণ কি যে চায়।'

আরও বিশদ করিয়া তিনি লিখিলেন —

'সেই বাল্যকালের বর্ষা এবং এই যৌবনকালের শরতের মধ্যে একটা প্রভেদ এই দেখিতেছি যে, সেই বর্ষার দিনে বাহিরের প্রকৃতিই অত্যন্ত নিবিড় হইয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার সমস্ত দলবল সাজসজ্জা এবং বাজনাবাদ্য লইয়া মহাসমারোহে আমাকে সঙ্গদান করিয়াছে। আর, এই শরৎকালের মধুর উজ্জ্বল আলোটির মধ্যে যে-উৎসব তাহা মানুষের। মেঘরৌদ্রের লীলাকে পশ্চাতে রাখিয়া সুখদুঃখের আন্দোলন মর্ম্মরিত হইয়া উঠিতেছে, নীল আকাশের উপরে মানুষের অনিমেষ দৃষ্টির আবেশটুকু একটা রং মাখাইয়াছে এবং বাতাসের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাবেগ নিশ্বসিত হইয়া বহিতেছে।'

যৌবনের এই শরৎ শুধু বাংলার শরৎই নয় — যখন আমরা বলিতে পারি —

'অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া
দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী-বাওয়া ॥'

ইহা ইংলন্ডেরও শরৎ, যাহার সম্বন্ধে শেলী লিখিয়াছিলেন —

'The day becomes more solemn and serene
When noon is past — there is a harmony
In Autumn, and a lustre in its sky,
Which through the Summer is not heard or seen —'

এবং কীট্‌সও লিখিয়াছিলেন, —

'Season of mists and mellow fruitfulness,
Close bosom - friend of the maturing Sun.'

কিন্তু ইহার পরও প্রশ্ন আছে — তবে কি বসন্তের সঙ্গে যৌবনের কোনও সম্পর্ক নাই? রবীন্দ্রনাথ ভাল করিয়াই জানিতেন যে আছে, কারণ তিনি 'বলাকা'তে লিখিয়াছিলেন —

'যে বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল
লয়ে দলবল
আমার প্রাঙ্গণতলে কলহাস্য তুলে
দাড়িম্বে পলাশগুচ্ছে কাঞ্চনে পারুলে
নবীন পল্লবে বনে বনে
বিহ্বল করিয়াছিল নীলাম্বর রক্তিম চুম্বনে —'

ইহার পর তিনি অবশ্য লিখিলেন, ১৯১৬ সনে সেই বসন্তের পরে কি হইল। কিন্তু অতীতে কি করিয়া যৌবনের সহিত বসন্ত যুক্ত হইয়াছিল তাহার কোনও বিবরণ তিনি দেন নাই। তাঁহার বর্ষাতুল্য বাল্যকাল ও শরৎতুল্য শান্ত যৌবনের কথা তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছিলেন, কিন্তু

যখন বসন্ত হইবার কথা যৌবনের, তখনকার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা ধরাছোঁয়া না-দিবার মত। তিনি 'জীবনস্মৃতি'তে যাহা বলিয়াছেন উদ্ধৃত করিব। ইহা তাঁহার প্রথম জীবনের কাব্যপুস্তক 'ভগ্নহৃদয়' সম্বন্ধে। ইহার আগে তিনি 'ভানুসিংহের কবিতা' অবশ্য লিখিয়াছিলেন, তবে উহাকে অপরিণত বয়সের অনুকরণ ভিন্ন নিজের কথা বলা চলে না। 'ভগ্নহৃদয়' নিজের কথা। উহা বিলাতে থাকিতেই আরম্ভ করিয়াছিলেন, পরে কতকটা ফিরিয়া আসিবার পথে ও কতকটা দেশে ফিরিয়া শেষ করেন। উহা ১৮৮১ সনে প্রকাশিত হয়। তখন পাঠকদের কাছে লেখাটা অনাদৃত হয় নাই, এমন কি সাহিত্যরসিক ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য তাঁহার মন্ত্রীকে পাঠাইয়া জানাইয়াছিলেন যে কাব্যটি তাঁহার ভালো লাগিয়াছে এবং তিনি কবির সাহিত্যসাধনার সফলতা সম্বন্ধে উচ্চ আশা পোষণ করেন। এই আঠারো বছর বয়সের কবিতা সম্বন্ধে তিনি ত্রিশ বছর বয়সে একটি চিঠি লিখিয়াছিলেন। তাহা এইরূপ —

"ভগ্নহৃদয়" যখন লিখতে আরম্ভ করেছিলেম তখন আমার বয়স আঠারো। বাল্যও নয়, যৌবনও নয়। বয়সটা এমন একটা সন্ধিস্থলে যেখান থেকে সত্যের আলোক স্পষ্ট পাবার সুবিধে নেই। একটু একটু আভাস পাওয়া যায় এবং খানিকটা-খানিকটা ছায়া। এই সময়ে সন্ধ্যাবেলাকার ছায়ার মতো কল্পনাটা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অপরিস্ফুট হয়ে থাকে।'

১৮৯১ সনের চিঠিটি উদ্ধৃত করিয়া তিনি 'জীবনস্মৃতি'তে (১৯১২) লিখিলেন, 'আমার পনেরো ষোলো হইতে আরম্ভ করিয়া বাইশ-তেইশ (১৮৮৩-১৮৮৪) এই যে একটা সময় গিয়াছে, ইহা অত্যন্ত একটা অব্যবস্থার কাল ছিল।' তাঁহার যৌবন আরম্ভ হওয়া হইতে পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত ইহার বেশি আর কিছুই তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিলেন না। সুতরাং তাঁহার যৌবনপ্রাপ্তি সম্বন্ধে অন্য উপায়ে কিছু জানা যায় কিনা দেখিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গেও আমি শাতোব্রিয়ঁকে টানিয়া আনিব। আমি মনে করি শাতোব্রিয়ঁর যৌবনপ্রাপ্তির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যৌবনপ্রাপ্তির সাদৃশ্য আছে। উদ্দাম ও উদাসী বালক শাতোব্রিয়ঁ একটা আকস্মিক ঘটনায় একদিনে বাল্য হইতে যৌবনে পদার্পণ করিলেন। উহার কথা তিনি উহ্য না রাখিয়া সরলভাবে তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়া গিয়াছেন।

তখন তাঁহার পনেরো বৎসর পূর্ণ হইতে তিন মাস বাকী আছে, তিনি নৌবাহিনীর কলেজ হইতে পৈতৃক বাড়ী শাতো দো কঁবুরে আসিয়াছেন। এ-সময়কার মনের অবস্থা সম্বন্ধে লিখিলেন —

'অলস জীবনে আবার ফিরিয়া আসিয়া আমি আমার বাল্যজীবনে কি যে অভাব রহিয়াছে, তাহা আরও বেশী অনুভব করিলাম। তাহা আমার কাছে একটা প্রহেলিকা হইয়া দাঁড়াইল।

'আমি উদভ্রান্ত না হইয়া কোনো স্ত্রীলোককে দেখিতে পারিতাম না, কোনও স্ত্রীলোক যদি আমাকে একটি কথাও বলিত তাহা হইলে আমি লজ্জায় লাল হইয়া যাইতাম।

'লোকের সমক্ষে ইহার আগে হইতেই আমার যে অতিরিক্ত ভীতি ছিল, তাহা নারীর সাক্ষাতে এমনই বাড়িয়া উঠিত যে, আমি মনে করিতাম, একটি নারীর সহিত একাকী থাকার অপেক্ষা যে-কোনো মানসিক যন্ত্রণা বাঞ্ছনীয়। কোনো নারী চলিয়া যাওয়ার পর তাহার উদ্দেশে আমার হৃদয়ের সমস্ত অর্ঘ্য সমর্পণ করিতাম।

'আমার স্মৃতিতে ভার্জ্জিল, টিবুলুস, মাসিয়িয়োঁর অঙ্কিত সব চিত্র ভাসিয়া উঠিত। শুধু আমার মাতা ও ভগিনীর মূর্তি এই সকল চিত্রের উপর পবিত্রতার আবরণ টানিয়া দিত। ইহার ফলে, যে-যবনিকাকে আমার স্বভাবদত্ত প্রবৃত্তি ভেদ করিতে চাহিত তাহা আরও দুর্ভেদ্য হইয়া দাঁড়াইত, মাতার প্রতি পুত্রের ও ভগিনীর প্রতি ভ্রাতার স্নেহে যে নিঃস্বার্থতা ছিল, তাহার অপেক্ষা কম নিঃস্বার্থ আসক্তির রূপ সম্বন্ধে আমাকে ভ্রান্ত করিত। কোনো বাদশাহের অবরোধের চরম রূপবতী ক্রীতদাসীর কাছেও যদি কেহ আমাকে লইয়া যাইত, তাহা হইলেও তাহার কাছে আমি যে কি চাহিব তাহা জানিতাম না। তবে একদিন দৈবক্রমে আমার মনে আলোক প্রবেশ করিল।'

রবীন্দ্রনাথও যে নারীর সঙ্গে মিশিবার ব্যাপারে সঙ্কোচ অনুভব করিতেন তাহা পূর্ণবয়স্ক হইয়া লিখিয়াছিলেন। তাঁহার তরুণ ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ বিলাতে শিক্ষিত সুতরাং কলিকাতাতেও তরুণীদের সঙ্গে 'বেশ রীতিমত পাকা স্টাইলে আলাপ চালাচ্ছিল;' ইহা দেখিয়া লিখিলেন,—

'আমার দেখে ভারী কৌতুক এবং বিস্ময়বোধ হচ্ছিল। আমি বোধ হয় আমার বত্রিশ বৎসর বয়সেও অমন নিতান্ত সহজ মধুর সুনিশ্চিতভাবে অবলাজাতির সহিত বাক্যালাপ করতে পারিনে। চল্‌তে গেলে হঁচোট খাই, বলতে গেলে বেধে যায়, হাত দুটো কোথায় রাখি ভেবে পাইনে, লম্বা পা দুখানা সম্বন্ধে একটা কোনো ব্যবস্থা করা কর্তব্য বোধ করি অথচ কিছুই করে ওঠা যায় না — দুটোকে গুটিয়ে রাখব তার মীমাংসা করতে করতে ঠিক কথার ঠিক জবাবটা দিয়ে ওঠা হয় না। ঘরে তিনটে গ্যাসের শিখা এবং এক ঘর লোক থাকতে যে সট্‌ করে চুম্বকাকৃষ্ট লৌহখণ্ডবৎ বিনা দ্বিধায় কোনো কিশোরীর পার্শ্বসংলগ্ন হয়ে অটল প্রতিষ্ঠা লাভ করা সে আমাদের মতো সংশয়াতুর ভীরু প্রাণীদের দ্বারা হওয়া অসম্ভব।'

মনের ভাব কি হইত তাহা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট গদ্যে লেখেন নাই, তবে বাল্যবয়স হইতে বাইশ বৎসর পর্যন্ত অর্থাৎ বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত কবিতা ও গান হইতে উহা অনুমান করা কিছুমাত্র কঠিন নয়। উহার মূলমন্ত্র হিসাবে উনিশ বৎসর বয়সে রচিত একটি গানের কয়েকটি মাত্র কথা উদ্ধৃত করিব —

'ক্ষমা করো মোরে সখী, শুধায়ো না আর —
মরমে লুকানো থাক মরমের ভার;
যে গোপন কথা, সখী, সতত লুকায়ে রাখি
ইষ্টদেবমন্ত্রসম পূজি অনিবার ॥'

এর পর শাতোব্রিয়ঁর যৌবনপ্রাপ্তির বিবরণ — তাঁহার নিজের কথায় উদ্ধৃত করি। তিনি লিখিলেন —

'কঁবুরের এক প্রতিবেশী তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া দিনকয়েকের জন্য আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। স্ত্রীটি খুবই সুন্দরী ছিলেন। জানি না গ্রামে কি একটা কোলাহল উঠিল। সকলেই দেখিবার জন্য আমাদের বসিবার বড় ঘরের জানালার দিকে ছুটিয়া গেল। আমিই সকলের আগে পৌঁছিলাম, কিন্তু সেই অপরিচিতা আমার পিছন পিছন আসিতেছেন দেখিয়া আমি তাঁহাকে জায়গা ছাড়িয়া দিবার জন্য ঘুরিয়া তাঁহার পথে বাধা হইয়া পড়িলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনুভব

করিলাম আমি তাঁহার ও জানালার মধ্যে চাপা পড়িয়া গিয়াছি। ইহার পর কি ঘটিল তাহার জ্ঞান আমার রহিল না।'

কিন্তু ফল কি হইল তাহা তিনি সরলভাবে লিখিলেন —

'সেই একটি মুহূর্তে, নিজে ভালবাসা ও অন্যের ভালবাসা পাওয়া সম্বন্ধে আমার যে-অজ্ঞতা ছিল তাহা কাটিয়া গিয়া আমার চেতনা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, বুঝিলাম ইহাই চরম সুখ।'

তিনি বাল্য হইতে যৌবনে পদার্পণ করিলেন। তরুণ-তরুণীর বক্ষে বক্ষে স্পর্শ যে উন্মাদনার সৃষ্টি করে তাহার আবেশে শাতোব্রিয়ঁ দুই বৎসর ধরিয়া বিভোর হইয়া রহিলেন, লিখিলেন —

'আমি যত নারী দেখিয়াছিলাম তাহাদের সকলের রূপ তিলে তিলে একত্র করিয়া এক মানসীকে সৃষ্টি করিলাম, কিন্তু সেই মানসীর দেহ, কেশরাশি, হাসি সকলই হইয়া গেল সেই যুবতীর যিনি আমাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। সেই মানসী দিনরাত্রি আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তাহাকে একটি বনদেবীর মূর্তি দিয়া তাহার সহিত আমি সারা ভুবন ভ্রমণ করিলাম — ভেনিস, রোম, এথেনস, জেরুজালেম, মেমফিস, কার্থেজ দেখিয়া টাহিটি যবদ্বীপ দেখিলাম, অবশেষে হিমাচলের চূড়ায় বসিয়া দুই জনে দেখিলাম তরুণী উষার ঘুম ভাঙিতেছে; তাহার পর পতিতোদ্ধারিণী নদী বাহিয়া নামিলাম, দেখিলাম সেই নদীর উর্মিমালা কত স্বর্ণচূড় মন্দিরকে বেষ্টন করিয়া নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে; শেষে বাংলাদেশে পৌঁছিয়া দুই জনে গঙ্গার কূলে ঘুমাইলাম, কিন্তু ঘুমের মধ্যেও শুনিলাম একটি ছোট ডিঙ্গির বাঁশের মাস্তুলের মাথায় বসিয়া একটি বাবুই পাখী নিজের দেশের নৌকা-দোলানো গান গাহিতেছে।'

['le bengali chantait sa barcarolle indienne.'

ছোটহাতের bengali-র ফরাসী ভাষায় অর্থ 'বাঙালী' নয়, 'বাবুই পাখী'।]

সমস্তটা শাতোব্রিয়ঁর আত্মজীবনী Memoires d'Outre-tombe হইতে অনুবাদ করিয়া দিলাম — বইটির ইংরেজী অনুবাদ নাই।

ইহার পর শাতোব্রিয়ঁ আরও লিখিলেন,

'তখন হইতে স্বর্গ বা মর্ত্য আমার কাছে তুচ্ছ হইয়া গেল, বিশেষ করিয়া স্বর্গ; আমি উহার উদ্দেশে আর আমার কামনা-নিবেদন করিলাম না; কিন্তু স্বর্গ তবুও আমার গোপন দুঃখের স্বর শুনিল — কারণ আমি যে-দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলাম, সেই দুঃখ প্রার্থনা জানায়।'

রবীন্দ্রনাথ নিজের কৈশোরে প্রেমের উন্মেষ সম্বন্ধে কিছুই খোলাখুলি লেখেন নাই, তবে ইঙ্গিত এত দিয়াছেন যে, তাহা হইতে তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের ইতিহাস উন্মেষ হইতে বিকাশ পর্যন্ত লিখিলে উহা আনুমানিক হইলেও অসত্য হইবে না। তাঁহার মানসিক জীবন যে শাতোব্রিয়ঁর মানসিক জীবনের অনুরূপ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করা চলে না।

একটি গান হইতেই বলা চলে, শাতোব্রিয়ঁ যেমন ফ্রান্স হইতে বাংলাদেশ পর্যন্ত আসিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তেমনই বাংলাদেশ হইতে ইংলণ্ডে গিয়া পৌঁছিলেন। তিনি নিজে এই গানটি গাহিয়া একজন ইংরেজ সঙ্গীতবিদ্‌কে শুনাইয়াছিলেন, তিনি তখনই উহার স্বরলিপি ইউরোপীয় ধরনে করিয়াছিলেন। সেই স্বরলিপি ও গানের কথাগুলি তাঁহার বই হইতেই দিতেছি, —

এই ইংরেজ সঙ্গীতবিদের নাম A. H. Fox Strangways. ইনি ১৯১০-১১ সনে কলিকাতা আসিয়াছিলেন। তিনি গানটার কথা ও স্বরলিপি শুদ্ধভাবে দিলেও উহার যে ইংরেজী অনুবাদ ও ব্যাখ্যা দিলেন তাহা একটা তামাসার ব্যাপার। তাহাতে 'বিদেশিনী'-র অনুবাদ দেওয়া হইল 'O thou Stranger Lady', এবং অর্থ দেওয়া হইল এই 'Lady' আসলে 'intellectual beauty'. আমি জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য, কেউ কি মিঃ ফক্স্ ষ্ট্রেঙ্গওয়েজের সহিত মস্করা করিয়াছিল?

রবীন্দ্রনাথ নিজে 'জীবনস্মৃতি'তে গানটির যে ইতিহাস দিয়াছিলেন, তাহার সহিত আমি বাল্যকাল হইতেই পরিচিত। তিনি লিখিলেন, 'বহু-বাল্যকালে একটা গান শুনিয়াছিলাম, "তোমায় বিদেশিনী সাজিয়ে কে দিলে।" সেই গানের একটি মাত্র পদ মনে এমন একটি অপরূপ চিত্র আঁকিয়া দিয়াছিল যে আজও (১৯১১ সন) ওই লাইনটা মনের মধ্যে গুঞ্জন করিয়া বেড়ায়। একদিন (১৪ই আশ্বিন, ১৩০২ বাংলা সন ইং ১৮৯৫ সন—শিলাইদহে) ওই গানের মোহে আমিও একটি গান লিখিতে

বসিয়াছিলাম। স্বরগুঞ্জনের সঙ্গে প্রথম লাইনটা লিখিয়াছিলাম, "আমি চিনি গো চিনি, তোমারে, ওগো বিদেশিনী।"... ওই সুরের মন্ত্রগুণে বিদেশিনীর এক অপরূপ মূর্তি মনে জাগিয়া উঠিল।'

মনে রাখিতে হইবে, এই দুইটি গানের মধ্যে এক সুরগত ঐক্য ও 'বিদেশিনী' শব্দটির ব্যঞ্জনা ছাড়া আর কোনো ঐক্য নাই। সুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলেও উহার উৎপত্তি লোকোত্তর (Supra-rational); পক্ষান্তরে গানের ভাব শেষ পর্যন্ত লোকোত্তর হইলেও উহার ভাষা একমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা হইতে আসিতে পারে, উহা কখনও জ্ঞানেন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ (Supra-sensual) হইতে পারে না। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের 'বিদেশিনী'কে যদি কেউ নীলনয়না স্বর্ণকুন্তলা কন্যা মনে না করিয়া 'intellectual beauty' বলে তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হইবে যে, সে জীবনে কখনও নারীমূর্তি চোখে দেখে নাই, নিজের দেহে নারীর দেহের স্পর্শ পায় নাই। তবে উহা ইংরেজ লেখকের ভুল নয় — তিনি বাংলা জানিতেন না। কে তাঁহ ...g-pull করিয়াছিল?

এই নারীমূর্তি রবীন্দ্রনাথ কোথায় দেখিয়াছিলেন তাহা অনুমানসাপেক্ষ নয়, তাঁহার নিজের উক্তিই আছে। 'আমি চিনি গো চিনি' গানটি রচিত হয় ১৮৯৫ সনে; ১৮৯০ সনে বিলাতপ্রবাসের সময় যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা তিনি 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী'-তে ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্রথমে এই কথা বলিবার পর 'এখানে রাস্তায় বেরিয়ে সুখ আছে। সুন্দর মুখ চোখে পড়বেই', লিখিলেন —

> 'শ্রীযুক্ত দেশানুরাগ যদি পারেন তো আমাকে ক্ষমা করবেন, আমার বিশ্বাস ইংরাজ মেয়েদের মতো সুন্দরী পৃথিবীতে নেই। নবনীর মতো সুকোমল শুভ্র রঙের উপর একখানি পাতলা টুকটুকে ঠোঁট, সুগঠিত নাসিকা, এবং দীর্ঘপল্লববিশিষ্ট নির্ম্মল নীল নেত্র — দেখে পথকষ্ট দূর হয়ে যায়। শুভানুধ্যায়ীরা শঙ্কিত এবং প্রিয় বয়স্যেরা পরিহাস করবেন, কিন্তু এ-কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে — সুন্দর মুখ আমার সুন্দর লাগে। তাই যদি না হতো বিধাতার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হত।'

তবে তখন তাঁহার বয়স ২৯ বৎসর, যৌবন আসিয়া গিয়াছে, সুতরাং যৌবনপ্রাপ্তি সম্বন্ধে তামাসা করিয়া তাঁহার আঠারো বৎসর বয়সের একটি কাহিনীর কথা বলিব।

তিনি শেষের দিকে ইংলন্ডে যে পরিবারে ছিলেন, যাঁহাদের কথা আমি বলিয়াছি, তাঁহাদের ছোট পুত্রটির নাম ছিল Tom ও সর্বকনিষ্ঠ সন্তান একটি মেয়ে, তাহার নাম ছিল Ethel. তাহারা সকলেই রবীন্দ্রনাথকে Uncle Arthur বলিয়া ডাকিত। কিন্তু Ethel-এর ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথ একমাত্র তারই Uncle Arthur. এ-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন, —

'একদিন Tom তার ছোট বোনকে রাগাবার জন্যে একটু বিশেষ জোর দিয়ে বললে, 'He is my Uncle Arthur! এতে Ethel আমার গলা জড়িয়ে ধরে তার ছোট ঠোট দুটি ফুলিয়ে ফুলিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে দিলে। কত করে তাকে থামাই।'

তখনই রবীন্দ্রনাথের শাতোব্রিয়ঁর মত যৌবনের অনুভূতি হইল এই কথা যদি বলি, কেহ যেন সেটা হাসিয়া উড়াইয়া না দেন। পুরুষের কাছে নারীর দেহের স্পর্শ বয়স-নিরপেক্ষ। আঠারো বৎসর বয়সে আমি গভীর রাত্রিতে ঘোড়ার গাড়ীতে ময়মনসিংহ শহর হইতে নেত্রকোনা শহরে যাইতেছিলাম। পাশে একটি নিঃসম্পর্কিতা বালিকা আমার বুকের উপর ঘুমে ঢুলিয়া পড়িতেছিল। তখন 'বিকলহৃদয় বিবশ শরীর' হইলেও বলিতে হয় নাই—'কোথা আছ ওগো, করহ পরশ নিকটে আসি', পরশ অমনি হইতেছিল ; তাহার স্মৃতি হইতেই তামাসাটা করিলাম।

তৃতীয় অধ্যায়

পায়োলো (দেবর) ও ফ্রাঞ্চেস্কা (ভ্রাতৃবধূ)

দেবর ও ভ্রাতৃবধূর মধ্যে প্রণয় ইউরোপীয় কাব্যে বিখ্যাত এবং বাঙালীর মধ্যে জনপ্রচলিত 'কেচ্ছায়' অখ্যাত। প্রথমে কাব্যে বিখ্যাত যে-কাহিনীটি পাই তাহার কথা বলি। এই কাহিনীর রচয়িতা আর কেহ নন, দান্তে। তাঁহার 'দিভিনা কম্মেদিয়া'-র প্রথম অংশ 'ইনফের্নো'র পঞ্চম সর্গে উহা আছে। কাহিনীটি সত্য ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া লিখিত।

দান্তে 'ইনফের্নো'র দ্বিতীয় আবর্তে নামিয়া দেখিলেন, সেখানে প্রচণ্ড ঝড় ছুটিতেছে, সেই বাত্যার ঘূর্ণিতে অগণিত নারী অসহায় পাখির মত বিতাড়িত হইয়া উঠিতেছে পড়িতেছে ও কাঁদিতেছে। ইহারা সেই সব নারী যাহারা জীবিতকালে প্রেমের বশে ধর্মভ্রষ্ট হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে একজনকে দান্তে চিনিতে পারিয়া করুণাপরবশ হইয়া বলিলেন, 'ফ্রাঞ্চেস্কা! তোমার দুরদৃষ্টের কথা স্মরণ করিয়া আমি অশ্রুপাত করিয়াছি; আমার হৃদয় করুণায় বিগলিত হইয়াছে; তুমি এখন আমাকে বল কি করিয়া প্রেম তোমার দ্বিধাপূর্ণ গোপন বাসনাকে প্রকাশ করিয়া দিল।' ফ্রাঞ্চেস্কা ইহার উত্তরে প্রথমেই যাহা বলিল উহা দান্তের একটি বিখ্যাত চরণ —

'Nessun maggior dolore.
Che ricordarsi del tempo felice
Nella miseria.

(দুঃখের দিনে সুখের দিনের স্মৃতি মনে করিবার মত শোকাবহ ব্যাপার আর কিছুই নাই।)

ফ্রাঞ্চেস্কা রিমিনির রাজকুলের বধূ, দ্বিতীয় মালাতেস্তার জ্যেষ্ঠ পুত্র খঞ্জ ও ক্রূরস্বভাব জানচোত্তোর পত্নী। তাহার বিবাহিত জীবন সুখের হয় নাই; তাই সে মনে মনে অতিশয় সুশ্রী দেবর পায়োলোকে ভালবাসিয়াছিল; পায়োলোও তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল — তবে গোপনে। একদিন কি করিয়া উহা প্রকাশ হইয়া পড়িল সেই কথা ফ্রাঞ্চেস্কা দান্তেকে বলিল, উহার ইংরেজী অনুবাদ দিতেছি, —

'One day together, for pastime we read
Of Lancelot, and how love held him in thrall.
We were alone, and without any dread,
Sometimes our eyes, at the word's secret call,

Met, and our cheeks a changing colour wore.
But it was one page only that did all.
When we read how that smile, so thirsted for,
Was kissed by such a lover, he that may
Never from me be seperated more,
All trembling kissed my mouth.'

ইহার পর ফ্রাঞ্চেস্কা বলিল,'সেদিন আর আমাদের পড়া হইল না,' কিন্তু কোনোদিনই আর হইল না, কারণ তাহার স্বামী লুকাইয়া সবই দেখিতেছিল, সে তখনই ছুটিয়া আসিয়া পত্নী ও ভ্রাতা দুইজনকেই হত্যা করিল। দান্তে এই করুণ কাহিনী শুনিয়া নিজেই মূৰ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

এখন বাঙালীর মধ্যে এই সমাজ-বিরুদ্ধ প্রণয়ের কথা বলি। সাধারণতঃ যাহা ছিল তাহা অবশ্য উহার বিপরীত — ভ্রাতৃবধূ ও দেবরের মধ্যে অত্যন্ত মধুর স্নেহের সম্পর্ক। আমি যে উহা শুধু দেখিয়াছি তাহাই নয়, অনেক স্নেহও পাইয়াছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্য ধরনের সম্পর্কের কানাঘুষাও শোনা যাইত, যাহা অত্যন্ত কুৎসিত, কারণ এইসব আলোচনাতে যাহা প্রচারিত হইত তাহা ব্যর্থ প্রেমের দুঃখজনক গৌরব নয়, হইত কামজ উত্তেজনার বশে অতি নিম্নস্তরের দৈহিক উপভোগের কথা। উহার সত্যমিথ্যা নির্ণয় প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু এইসব নিন্দার পিছনে সত্যও যে কিছু ছিল তাহা অস্বীকার করা চলে না। আমি নিজেও দুয়েকটা সত্য ব্যাপার জানি।

প্রশ্ন উঠিবে, আমি এই প্রসঙ্গের উত্থাপন কেন করিলাম। উত্তর — রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতি প্রচারিত হইয়াছিল। উহার পিছনে ছিল দুইটি সত্য ঘটনার পরম্পরতা। ১৮৮৩ সনের ডিসেম্বর মাসে ২২ বৎসর ৮ মাস বয়স্ক রবীন্দ্রনাথের সহিত একটি বারো বৎসরের বালিকার বিবাহ হয়। উহার চার মাসের মধ্যে, ১৮৮৪ সনের এপ্রিল মাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঁচিশবৎসর বয়স্কা পত্নী কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করিলেন। ইহার সত্য কারণ কখনই প্রকাশ হয় নাই। কিন্তু তখন হইতেই কানাঘুষা আরম্ভ হইল যে, রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার বৌ-ঠাকুরানীর মধ্যে প্রণয় ছিল, তাই দেবরের বিবাহে নিরাশ হইয়া কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সংসারের সহিত রবীন্দ্রনাথ ১৮৮১ সনের মাঝামাঝি হইতে ১৮৮৩ সনে বিবাহ হইবার সময় পর্য্যন্ত যে-ভাবে যুক্ত ছিলেন তাহাতে এই জনশ্রুতি বাঙালী সমাজে ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হইল না।

তাহার উপরে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর সতেরো বৎসর পরে ১৯০১ সনে রবীন্দ্রনাথ 'নষ্টনীড়' গল্পটি প্রকাশ করিয়া এই জনশ্রুতির গৌণ প্রমাণ দিয়া

ফেলিলেন। আমিও বাল্যবয়স হইতেই শুনিতে আরম্ভ করিলাম যে, গল্পটির সহিত রবীন্দ্রনাথের জীবনের সেই সময়ের অভিজ্ঞতা ও ঘটনার যোগাযোগ আছে। কিন্তু গল্পে তিনি দেবর-ভ্রাতৃবধূর মধ্যে ব্যাপারের যে বিবরণ দিলেন, তাহার মধ্যে দেবরের ভ্রাতৃবধূর প্রতি স্নেহ ভিন্ন, বিশিষ্ট অর্থে প্রণয়ের কোন কথা নাই, আছে শুধু ভ্রাতৃবধূর প্রণয়ের। তাহার অতিরিক্ত, স্বামী ভূপতির মানসিক যন্ত্রণার কথাও আছে। ভূপতি মনে মনে বলিল, 'আমার কথা সে একবার ভাবিয়া দেখিল না? আমি কোথায় পলাইব? যে স্ত্রী হৃদয়ের মধ্যে নিয়ত অন্যকে ধ্যান করিতেছে, বিদেশে গিয়াও তাহাকে ভুলিতে সময় পাইব না? নির্জন বন্ধুহীন প্রবাসে প্রত্যহ তাহাকে সঙ্গদান কবিতে হইবে? সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যায় যখন ঘরে ফিরিব তখন নিস্তব্ধ শোকপরায়ণা নারীকে লইয়া সেই সন্ধ্যা কি ভয়ানক হইয়া উঠিবে। যাহার অন্তরের মধ্যে মৃতভার, তাহাকে বক্ষের কাছে ধরিয়া বাখা—সে আমি কতদিন পারিব! আরো কত বৎসর প্রত্যহ আমাকে এমনি করিয়া বাঁচিতে হইবে। যে আশ্রয় চূর্ণ হইয়া ভাঙিয়া গেছে তাহার ভাঙা ইটকাঠগুলা ফেলিয়া যাইতে পারিব না, কাঁধে করিয়া বহিয়া বেড়াইতে হইবে?'

স্ত্রী পবপুরুষকে ভালবাসিয়া স্বামীকে ত্যাগ করিযাছে, এই কাহিনী উপন্যাসে ও ইতিহাসে অনেক পড়িয়াছি, কিন্তু একান্তভাবে পতীপ্রেমিক স্বামীব এইরূপ মানসিক যন্ত্রণার কথা অন্য কোথাও পড়ি নাই। এই গল্পের পিছনে যদি কোনো সত্য ঘটনা থাকিয়া থাকে তবে তাহাকে লইয়া সৌখিন সাহিত্য রচনা ও গবেষণার মধ্যে একটা অমার্জনীয় হৃদয়হীনতা আছে। আমি বলিব, অল্পবযসে 'নষ্টনীড়' পড়িবার পর আজ ৯৩ বৎসর পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত গল্পটি আবার পুরাপুরি পড়িবার সাহস আমার হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ 'নষ্টনীড়' লিখিয়া জনশ্রুতিকে ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ কবিবাব অবকাশ কেন দিলেন তাহা আমি আজ পর্যন্ত ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই। কাদম্বরী দেবীর ব্যাপারে তাঁহার কোনো অপরাধ জ্ঞাতসারে ছিল না তাহা দেখাইয়া জনশ্রুতির বিরুদ্ধে নিজের সাফাই গাহিতে চাহিয়াছিলেন, এই সিদ্ধান্ত করিয়া আমি রবীন্দ্রনাথের অপমান করিব না। তিনি সেই চবিত্রের মানুষ ছিলেন না — তবে কেন?

কিন্তু ইহার পর হইতেই তিনি যেন অবহিত হইলেন। ১৯১২ সনে প্রকাশিত 'জীবনস্মৃতি'-তে তিনি নিজের প্রথম জীবনের যে কাহিনী দিলেন তাহাতে কাদম্বরী দেবী সম্বন্ধে দুইটি ধারা দেখা যায়। প্রথম ধারাতে লিখিত উক্তিতে অতি বাল্যবয়স হইতে ১৮৭৮ সনে বিলাতে যাওয়া পর্যন্ত কাদম্বরী দেবীর স্নেহের ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দাম্পত্যজীবনেব সুখের উল্লেখ আছে। দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

প্রথমটির কালে রবীন্দ্রনাথের বয়স খুবই কম, একদিন গিয়া দেখিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চাকর খুব ভোরবেলা মুনিবের জন্য রুটি টোস্ট করিতেছে। এ-বিষয়ে তিনি পরবর্তী জীবনে লিখিলেন (তারিখ ১৪ই মার্চ ১৯২৯ সন)?

'জ্যোৎদা' তখন বিবাহিত, তাঁর জন্যে ভাববার লোক ছিল, তাঁর জন্য ভোরবেলা থেকেই রুটি-তোস আরম্ভ। আমি ছিলুম সংসার-পদ্মার বালুচরের দিকে, অনাদরের কূলে — সেখানে ফুল ছিল না, ফল ছিল না, ফসল ছিল না, কেবল একলা বসে ভাববার মতো আকাশ ছিল। আর জ্যোৎদা' পদ্মার যে কূলে ছিলেন সেই কূল ছিল শ্যামল — সেখানকার দূর থেকে কিছু গন্ধ আসত, কিছু গান আসত, সচল জীবনের ছবি একটু-আধটু চোখে পড়ত, বুঝতে পারতুম এখানেই জীবনযাত্রা সত্য।'

ইহার পূর্বে 'জীবনস্মৃতি'-তেও বিলাত যাওয়া পর্যন্ত কাদম্বরী দেবীর সহিত তাঁহার স্নেহের সম্পর্কের বিবরণ আছে। কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।—

১। মাতার মৃত্যুর পর কাদম্বরী কি করিলেন তাহার কথা। রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন, --

'বাড়িতে যিনি কনিষ্ঠা বধূ ছিলেন তিনিই মাতৃহীন বালকদের ভার লইলেন। তিনি আমাদিগকে খাওয়াইয়া পরাইয়া সর্ব্বদা কাছে টানিয়া, আমাদের যে কোনো অভাব ঘটিয়াছে তাহা ভুলাইয়া রাখিবার জন্য দিনরাত্রি চেষ্টা করিলেন।'

২। কৈশোরে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চা কাদম্বরীর সহিতই হইত। তাহার বিবরণ এইরূপ —

'সাহিত্যে বউঠাকুরাণীর প্রবল অনুরাগ ছিল। বাংলা বই তিনি যে পড়িতেন কেবল সময় কাটাইবার জন্য, তাহা নহে — তাহা যথার্থই তিনি সমস্ত মন দিয়া উপভোগ করিতেন। তাঁহার সাহিত্যচর্চায় আমি অংশী ছিলাম।......এই সময়ে বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর "সারদামঙ্গল সঙ্গীত" "আর্য্যদর্শন" পত্রে বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। বউঠাকুরাণী এই কাব্যের মাধুর্য্যে অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন। ইহার অনেক অংশই তাঁহার একেবারে কণ্ঠস্থ ছিল। কবিকে প্রায় তিনি মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া খাওয়াইতেন এবং নিজে হাতে রচনা করিয়া তাঁহাকে একখানি আসন দিয়াছিলেন। এই সূত্রে কবির সঙ্গে আমারও বেশ-একটু পরিচয় হইয়া গেল।'

এই প্রসঙ্গে 'ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিলেন তাহারও উল্লেখ করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা দেখিয়া অনেকে বলিতেন,'ছেলেটির লেখবার হাত আছে।' কিন্তু কাদম্বরীর মত ছিল ইহার বিপরীত। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, —

'বউঠাকরুণের ব্যবহার ছিল উল্টো। কোনোকালে আমি যে লিখিয়ে হব, এ তিনি কিছুতেই মানতেন না। কেবলই খোঁটা দিয়ে বলতেন, কোনোকালে বিহারী চক্রবর্তীর মতো লিখতে পারব না। আমি মন-মরা হয়ে ভাবতুম, তাঁর চেয়ে অনেক নীচের ধাপের মার্কা যদি মিলত, তা হলে মেয়েদের সাজ নিয়ে তাঁর খুদে দেওর-কবির অপছন্দ অমন উড়িয়ে দিতে তাঁর বাধত।'

'ছেলেবেলা'-তে কাদম্বরীর সহিত তাঁহার স্নেহের সম্পর্কের আরও

পরিচয় দিয়াছেন, ঝগড়া করাও বাদ দেন নাই। ঝগড়া হইত যে-ধরণের ব্যাপারে তাহার দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। কাদম্বরী তখনকার রেওয়াজ অনুযায়ী পাখী পুষিতেন, তাহার মধ্যে একটা ছিল চীনদেশের শ্যামা। কিন্তু একবার সখ হইল খাঁচায় কাঠবেড়ালী পুষিবার। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'কাজটা অন্যায় হচ্ছে', উত্তর পাইলেন, 'গুরুমশায়গিরি করতে হবে না।'

আর একটা বাঁধা ঝগড়া ছিল কাপড়-পরা সম্বন্ধে। তাঁহাদের ঘরের দরজী নানা রকম বিলাতী সিল্কের জামা-কাপড় আনিয়া দিত, বলিত 'এই হল আজকের দিনের ফ্যাশন।' কাদম্বরীও ইহার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিতেন না। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন, 'আমাকে কী দুঃখ দিত বলতে পারিনে। আমি বউঠাকুরাণীকে জানিয়েছি এর চেয়ে অনেক ভালো, অনেক ভদ্র, সেকেলে সাদা কালোপেড়ে শাড়ি কিংবা ঢাকাই। বারবার অস্থির হয়ে আপত্তি জানিয়েছি। জবাবে শুনেছি, "জ্যাঠামি করতে হবে না।" কাদম্বরী তখন এক সুপারী-কাটা ভিন্ন রবীন্দ্রনাথের কোনো গুণ আছে তাহা মানিতেন না, এমন কি দেবরের চেহারারও খুঁৎ ধরিতেন।

বিলাত যাইবার পূর্ব্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরীর সহিত কিছুদিনের জন্য জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের একসঙ্গে থাকিবার কথাও 'ছেলেবেলা'-তে আছে। দেবেন্দ্রনাথ তখন জোড়াসাঁকোতে বাস করা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সপরিবারে তেতলার বাহিরের ঘরে আসিলেন, অন্তঃপুরে না থাকিয়া। তখন জ্যোতিরিন্দ্র ও রবীন্দ্রের মধ্যে গানবাজনারই চর্চা চলিত। রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন,

> 'দিনের শেষে ছাদের উপর পড়ত মাদুর আর তাকিয়া। একটা রূপার রেকাবিতে বেলফুলের গোড়ে মালা ভিজে রুমালে, পিরিচে এক-গ্লাস বরফ-দেওয়া জল, আর বাটাতে ছাঁচিপান। বউঠাকরুণ গা ধুয়ে, চুল বেঁধে, তৈরী হয়ে বসতেন। গায়ে একখানা পাতলা চাদর উড়িয়ে আসতেন জ্যোতিদাদা, বেহালাতে লাগাতেন ছড়ি, আমি ধরতুম চড়া সুরের গান।'

ঘর ও বারান্দার সংলগ্ন ছাদে কাদম্বরী দেবী বাগান করিয়াছিলেন এইরূপ, —

> 'পিল্পের উপরে সারি সারি লম্বা পাম গাছ, আশে-পাশে চামেলি, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, করবী, দোলনচাঁপা। ছাদ-জখমের কথা মনেই আনেন নি, সবাই ছিলেন খেয়ালী।'

কাদম্বরীর উল্লেখ অন্য রচনাতেও আছে। আমি অল্পবয়সেই 'সরোজিনী-প্রয়াণ' প্রবন্ধে তিন জনের ষ্টীমার যাত্রার কথা পড়িয়া খুবই আমোদ অনুভব করিয়া ছিলাম। তখনও দেবর-ভ্রাতৃবধূর সম্পর্ক ভাইবোনের মতই ছিল। তবে অন্য একটা ব্যাপারও অনুভব করিয়াছিলাম — মনে হইয়াছিল কাদম্বরী যেন ইংরেজীতে যাহাকে highstrung বলে সেইরূপ, এমন কি হিস্টিরিয়া ধাতও যেন তাঁহার মধ্যে আছে। অতি অল্পবয়স হইতেই এই ধরনের বাঙালী যুবতী দেখার ফলে আমার এই

অনুভূতি হইয়াছিল। স্নেহময়ী বৌ-ঠাকুরানী ও তরুণ দেবরের মধ্যে এইরূপ আচরণ ১৮৭৮ সনে রবীন্দ্রনাথ বিলাত যাওয়া পর্যন্ত অটুট ছিল।

(কিন্তু ১৮৮১ সনের মাঝামাঝি দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রার পথ হইতে ফিরিয়া আসার পরই রবীন্দ্রনাথের লেখা অন্যধরনের হইয়া গেল। তিনি সেই সময় হইতে ১৮৮৩ সনে বিবাহ হওয়া পর্যন্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সংসারে ছিলেন — প্রথমে চন্দননগরে গঙ্গাতীরে মোরানসাহেবের বাগানবাড়ীতে, পরে ১০ নম্বর সদর স্ট্রীটে। ইহা ছাড়া জ্যোতিবিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরীর সহিত তিনি দার্জিলিং এবং কারোয়ারেও গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই সময়ের বিবরণে কাদম্বরী দেবীর নাম পর্যন্ত উল্লেখ করিলেন না। লিখিলেন, 'বিলাতযাত্রার আরম্ভ পথ হইতে যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন জ্যোতি দাদা চন্দননগরে গঙ্গার ধারের বাগানে বাস করিতেছিলেন, আমি তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম' (শুধু লিখিলেন 'তাঁহাদের' — বৌ-ঠাকুরানীর উল্লেখ না করিয়া); সদর স্ট্রীটে বাস সম্বন্ধে লিখিলেন, 'জ্যোতি দাদা কিছু দিনের জন্যে চৌরঙ্গীর জাদুঘরের নিকট দশ নম্বর সদর স্ট্রীটে বাস করিতেন'; দার্জিলিং যাওয়া সম্বন্ধে লিখিলেন, 'এমন সময় জ্যোতিদাদারা স্থির করিলেন তাঁহারা দার্জিলিং যাইবেন';'কারোয়ারে যাত্রা সম্বন্ধেও তাই', লিখিলেন, 'আমরা সদর স্ট্রীটের দল কারোয়ার সমুদ্রতীরে আশ্রয় লইয়াছিলাম।' অথচ কাদম্বরী প্রত্যেকটি ব্যাপারেই ছিলেন।)

শুধু পরজীবনে (১৯৩৭ সনে) 'ছেলেবেলা' লিখিবার সময়ে, এই বইটির প্রসঙ্গ না হইলেও, অন্যমনস্কভাবে গঙ্গাতীরে বাগানবাড়ীতে বাস করিবার সময়ে যে কাদম্বরীও ছিলেন তাহার উল্লেখ করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তখনই মনে পড়িয়া গেল —'ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছি যৌবনের সদর দরজায়। আবার ফিরতে হল সেই ছেলেবেলার সীমানার দিকে।'

এই একটিমাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া রবীন্দ্রনাথের কোনো লেখাতেই কাদম্বরীর নাম ১৮৮১ সনের পরেকার ঘটনায় বিবৃতিতে নাই এমন কি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহিত ঘনিষ্ঠতার কথাও কাদম্বরীর মৃত্যুর পর আর বিশেষ নাই। আমার মনে হয়, এই ঘটনার পর এই সময়ের স্মৃতি রবীন্দ্রনাথের কাছে পীড়াদায়ক হইয়া গিয়াছিল। 'ছেলেবেলা'তে যে ব্যতিক্রম হইয়াছে তাহার কারণ আমি এই মনে করি যে, পীড়ার কারণ চন্দননগরে বাস করিবার সময়ে দেখা দেয় নাই। আরও স্পষ্ট করিয়া বলি, স্নেহময়ী ভ্রাতৃবধূর মৃত্যু ও স্নেহময় ভ্রাতার সংসারের প্রতি বৈরাগ্য ও অজ্ঞাতবাসের জন্য তিনি অপরাধী বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু অপরাধী মনে করিবার কারণ ঘটিয়াছিল ১০ নং সদর স্ট্রীটে আসিবার পর। সে যাহাই হউক, 'জীবনস্মৃতি'-তে তিনি সমস্ত সম্পর্কটার উপর

—কবির সাহিত্যের সঙ্গী—

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কাদম্বরী দেবী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
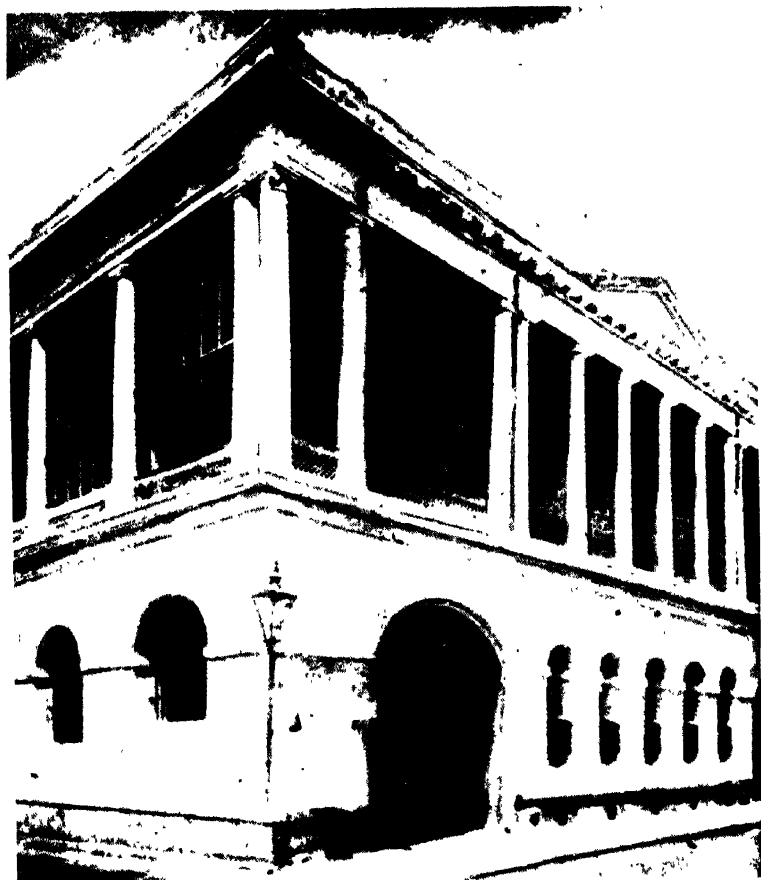
সদর স্ট্রীটের বাড়ি

যবনিকা টানিয়া দিয়াছিলেন। ইহা উদ্ঘাটন করিবার অধিকার আমাদের নাই।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই সঙ্কোচকে শ্রদ্ধা করিলেও তাঁহার সম্বন্ধে লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া দুইটি সত্য ব্যাপারকে এড়াইবার উপায় নাই। উহাদের একটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিনষ্ট জীবন, অপরটি কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে দুর্বোধ্য কিছুই নাই, শুধু পত্নীর শোচনীয় মৃত্যুই ইহার কারণ হইতে পারে, অবিশ্বাসিনী হইয়াছিলেন ইহা বাদ দিলেও — কেবলমাত্র মনে রাখা উচিত হইবে যে, এই দুঃখ লইয়া জ্যোতিরিন্দ্র আরও একচল্লিশ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। পত্নীর মৃত্যুর সময়ে তাঁহার বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ হইয়াছিল।

কিন্তু কাদম্বরী দেবী সম্বন্ধে প্রশ্ন আছে। যাহার উত্তর নিশ্চিত ভাবে দেওয়া সম্ভব নয়, যাহার সম্বন্ধে অনুমান মাত্র করা চলে, তাহাও একাধিক। কাদম্বরী আত্মহত্যা করিলেন কেন?

প্রথম উত্তর, সত্য হউক আর না-ই হউক, সহজ — প্রেমে নিরাশ হইয়া। ইহা নারীদের পক্ষে কোনো কোনো অবস্থায় সম্ভব বলিয়া মানা যাইতে পারে। কিন্তু কাদম্বরীর ক্ষেত্রে, তাঁহার অবস্থা ও বয়স বিবেচনা করিলে, সকলদিকে তাঁহার পারিবারিক সম্বন্ধের হিসাব লইলে স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। মনে রাখিতে হইবে তিনি রবীন্দ্রনাথের বিবাহের পরই আত্মহত্যা করেন নাই, নিজের মনকে বুঝিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন। অবশ্য নৈরাশ্য যদি হইয়া থাকে তাহা হইলে বাঁচিয়া থাকিবার স্বাভাবিক ইচ্ছা আঘাত পাইয়া দুর্বল হইয়া থাকিতে পারে।

দ্বিতীয় উত্তর হইতে পারে, স্বামীর মনের অবস্থা দেখিয়া। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনোভাব যদি ভূপতির মত হইয়া থাকে তাহা হইলে উহা দেখিবার পর অনুতপ্ত হইয়া এবং পূর্বসম্বন্ধ কোনোভাবে ফিরাইয়া আনিবার পথ না দেখিয়া কাদম্বরীর পক্ষে জীবনের অবসান করা সম্ভব ছিল।

এই দুটি অনুমান ছাড়া তৃতীয় আর একটি অনুমানও করা যাইতে পারে — উহা একটা দুরপনেয় ও অসহনীয় কলঙ্কের অনুভূতি। এটা রবীন্দ্রনাথের বিবাহের সহিত যুক্ত হওয়া অসম্ভব নয়। হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের বিবাহ তাঁহাদের জমিদারি-সেরেস্তার সামান্য কর্মচারীর, তাহাও পূর্ববঙ্গীয়ের, কন্যার সহিত হইল কেন?

আমি অল্পবয়সে গল্প শুনিয়াছিলাম এই যে, দেবেন্দ্রনাথের কানে পৌঁছাইয়াছিল তিনি কারোয়ারে একটি রূপসী কোঙ্কনী তরুণী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, এই কারণে পিতা তাঁহাকে কারোয়ার হইতে ফিরাইয়া আনেন;

রবীন্দ্রনাথ ইহাতে রাগ করিয়া স্থির করিলেন, তিনি যাহাকে প্রথম দেখিবেন তাহাকেই বিবাহ করিয়া ফেলিবেন, সামাজিক মর্যাদার অপেক্ষা না রাখিয়া। এইরূপ কিছু হইয়া থাকিলে রবীন্দ্রনাথের বিবাহে বাংলার প্রাচীন রূপকথারই পুনরাবৃত্তি দেখা গিয়াছিল।

কিন্তু আর একটা সম্ভাবনার কথাও বিবেচনা করিতে হইবে। কেহ কি দেবেন্দ্রনাথের কানে রবীন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবীর মধ্যে অবৈধ প্রণয়ের কথা তুলিয়াছিল? দেবেন্দ্রনাথের বৃহৎ পরিবারে যে-আড়াআড়ি ছিল তাহাতে এই রূপ ধারণা করা অসঙ্গত হইবে না। সুতরাং মনে করা যায়, দেবেন্দ্রনাথ বিরক্ত হইয়া তখনই রবীন্দ্রনাথকে শিলাইদহে পাঠাইয়া এইরূপ বিবাহ দিলেন।

ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে কাদম্বরী দেবীর পক্ষে অত্যন্ত মর্মবেদনা পাওয়া অনিবার্য। শ্বশুর তাঁহাকে কলঙ্কিনী ভাবিলেন, এই ধারণার বশে আত্মহত্যা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব।

অন্য অবস্থায় কোনো যুবতীর এইরূপ কলঙ্ক হইলে তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় হইত। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। একটি বিধবা তরুণী ভাই-এর দ্বারা অসহনীয় ভাবে অপমানিত হইয়া চিরজীবন কলঙ্কিনী হইয়া থাকিবার গ্লানিতে আত্মহত্যা করিতে চলিয়াছে — গলায় কলসী বাঁধিয়া দিঘিতে ডুবিয়া। তখন গভীর রাত্রি। কিন্তু একটি যুবক তাহাকে অনেকদিন ধরিয়া ভালবাসিয়াছিল। অপবাদ শুনিবার পর সে, তরুণী জীবনের অবসান করিতে পারে এই আশঙ্কা হইতে গোপনে তাহার উপর লক্ষ্য রাখিতেছিল। তরুণী যখন গলায় কলসী বাঁধিয়া জলে ঝাঁপ দিতে যাইতেছে তখন শুনিল কে একজন তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল। চমকিয়া দেখিল, তাহার পিছনে একজন দীর্ঘাকৃতি পুরুষ দাঁড়াইয়া। সে বলিল, 'আত্মহত্যা করো না।'

তরুণী —'আমি আত্মহত্যা করব আপনি কি করে জানলেন?'

যুবক —'তবে গলায় কলসী বেঁধেছ কেন?'

উত্তর না পাইয়া যুবক জিজ্ঞাসা করল, 'আত্মঘাতী হলে কি হয় জান?'

তরুণী —'কি?'

যুবক —'অনন্ত নরক।'

তরুণী শিহরিয়া উঠিয়া গলার কলসী খুলিয়া রাখিল, কিন্তু বলিল, 'এ সংসারে আমার স্থান নেই।'

যুবক —'এ সংকল্প ত্যাগ কর।'

তরুণী —'আমার কলঙ্ক রটেছে, আমার বাঁচা হয় না।'

যুবক —'মরলেই কি কলঙ্ক যাবে?'

তরুণী —'যাক না যাক্, আমি তা শুনতে পাবো না।'

যুবক —'ভুল বুঝেছ, তুমি মরলে এ-কলঙ্ক চিরকাল ছায়ার মত তোমার নামের পাশে ঘুরে বেড়াবে। বেঁচে দেখ, এ মিথ্যা কলঙ্ক কখনও চিরস্থায়ী হবে না।'

তরুণী —'কিন্তু কোথায় গিয়ে বেঁচে থাকব?'

যুবক —'আমার সঙ্গে চল।'

তরুণী পূর্বে এই যুবকের সম্বন্ধে ঘোরতর অপরাধ করিয়াছিল, তাই এই কথা মানিয়া লইবার অধিকার তাহার নাই মনে করিল; উত্তর দিল, 'আমি যাব না' ও জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল; কিন্তু মরিল না। জ্ঞান হইলে দেখিল সে একটি সুসজ্জিত কক্ষে পালঙ্কের উপর শুইয়া আছে, পাশে তাহার প্রণয়ী দাঁড়াইয়া, তখন কাতরস্বরে বলিল, 'কেন আমাকে বাঁচালে?'

কিন্তু তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, ভালবাসিবার কেহ থাকিলে সহস্র কলঙ্কেও বাঁচাই সুখের। 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিয়া সেই মুহূর্তে তাহা প্রকাশ করিয়াও ফেলিল।

রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই আশ্বাস দিবার উপায় ছিল না, তাই অভাগিনী কাদম্বরীর নামের পাশে পাশে কলঙ্ক ছায়ার মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

কাদম্বরী দেবীর কথা বলিলাম, এখন এই কাহিনীতে রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে ছিলেন তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। ইহাতে কোনো ঘটনার উল্লেখ নাই অর্থাৎ বাহ্যিক ব্যাপার নাই। তিনি নিজে এই সময়ের কথা 'জীবনস্মৃতি'র দুইটি অধ্যায়ে বলিয়াছেন — প্রথমটি 'প্রভাতসঙ্গীত', দ্বিতীয়টি 'মৃত্যুশোক'। এই দুইটিতে শুধু তাঁহার মানসিক অবস্থার বিবরণ আছে, কাদম্বরী দেবীর নামের যে উল্লেখমাত্র নাই তাহা আগেই বলিয়াছি।

ইহা অবশ্য আমি জানি যে, এই বিবরণের সহিত কাদম্বরী দেবীকে যুক্ত করা হইয়াছে। এ-বিষয়ে সরাসরি প্রমাণ থাকিবার কথা নয়, অনুমানের জোরেই ইহা করা হইয়াছে। এই সব অনুমানের কোনো ভিত্তি যে নাই, তাহা আমি বলিব না। দুইটি অধ্যায় পড়িলেই মনে হয় উহাদের জীবন্ত ও মৃতা নায়িকা নেপথ্য হইতে চাহিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে-ক্ষেত্রে কাহারও নাম করেন নাই, আমিও এ বিষয়ে সমস্ত জল্পনা-কল্পনাকে পাশে ঠেলিয়া রাখিয়া শুধু বর্ণিত মানসিক অবস্থারই আলোচনা করিব, এইসব মানসিক অবস্থার স্রষ্টা যিনি তাঁহাকে অনামিকা করিয়াই রাখিব।

'প্রভাতসঙ্গীত' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মনের মধ্যে একটা অনুভূতির আকস্মিক আবির্ভাবের কথা লিখিয়াছেন। তিনি লিখিলেন,

'জ্যোতিদাদা কিছুদিনের জন্য চৌরঙ্গী জাদুঘরের নিকট দশ নম্বর সদর স্ট্রীটে বাস করিতেন। আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। এখানেও একটু একটু করিয়া 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' ও একটি একটি করিয়া 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' লিখিতেছি, এমন সময়ে আমার মধ্যে হঠাৎ একটা কি উলটপালট হইয়া গেল।'

এই উলটপালটের ক্ষেত্র অবশ্য তাঁহার মন, কিন্তু বস্তুগত অবলম্বন দুইটি বাড়ি — জোড়াসাঁকোর পুরাতন বাড়ী ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সদর স্ট্রীটের বাড়ী। পুরাতন বাড়ীতেই যেন তাঁহার মন কোনো আভাস বা ইঙ্গিত পাইল যে, তাহাতে একটা কি অপরিচিত ভাব প্রবেশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। এ-বিষয়ে তিনি লিখিলেন, —

'একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়ীর ছাদের উপর অপরাহ্নের শেষে বেড়াইতেছিলাম। দিবাবসানের ম্লানিমার উপরে সূর্যাস্তের আভাটি জড়িত হইয়া সেদিনকার আসন্ন সন্ধ্যা আমার কাছে বিশেষভাবে মনোহর হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। পাশের বাড়ীর দেওয়ালগুলো পর্য্যন্ত আমার কাছে সুন্দর হইয়া উঠিল। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, পরিচিত জগতের উপর হইতে এই যে তুচ্ছতার আবরণ একেবারে উঠিয়া গেল এ কি কেবলমাত্র সায়াহ্নের

আলোকসম্পাতের একটি জাদুমাত্র। কখনোই তা নয়। আমি বেশ দেখিতে পাইলাম, ইহার আসল কারণটি এই যে, সন্ধ্যা আমারই মধ্যে আসিয়াছে, আমিই ঢাকা পড়িয়াছি। দিনের আলোতে আমিই যখন অত্যন্ত উগ্র হইয়াছিলাম তখন যাহা-কিছুকেই দেখতে-শুনিতে ছিলাম সমস্তকে আমিই জড়িত করিয়া আবৃত করিয়াছি। এখন সেই আমি সরিয়া আসিয়াছে বলিয়াই জগৎকে তাহার নিজের স্বরূপে দেখিতেছি। সে-স্বরূপ কখনোই তুচ্ছ নহে — তাহা আনন্দময়, সুন্দর।'

এখানে এই কথাগুলির কোনো ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা না করিয়া একজন ইংরেজ কবির দুইটি মাত্র ছত্র উদ্ধৃত করিব —

'Love took up the harp of Life, and smote on all
The chords with might;
Smote the chords of Self, that trembling,
Passed in music out of sight

রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন যে, ইহার পব তিনি মাঝে মাঝে ইচ্ছাপূর্বক নিজেকে যেন সরাইয়া ফেলিয়া জগৎকে দর্শকের মত দেখিতে চেষ্টা করিতেন ও তাঁহার মনটা খুশী হইয়া উঠিত। কিন্তু এই অবস্থাটা স্থায়িত্ব লাভ করে নাই, করিল কিছুদিন পরে একটা অভিজ্ঞতা হইতে। সেটা এইরূপ —

'সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ করি ফ্রি-স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সবিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্ব সংসাব সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবাবে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপেব উপব তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না। এমনি হইল আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না।'

নির্ঝর বলিল,

'আজি এ প্রভাতে রবির কব
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত পাখির গান।
না জানি কেন রে এত দিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ!

কি জানি কি হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ —
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
ওরে, চারিদিকে মোর
এ কি কারাগার ঘোর —
ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর।
ওরে আজ কি গান গেয়েছে পাখি,
এসেছে রবিব কর।'

ছয়শত বৎসর আগে দান্তেও হঠাৎ একটা ঘটনার পর বলিয়াছিলেন, 'Incipit vita nova, Ecce deus fortior me, Qui veniens dominibatur mihi.' (আজ হইতে নবজীবন আরম্ভ হইল। দেখ, এই দেবতা যিনি আমার উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে আসিলেন তিনি আমার চেয়ে শক্তিমান।)

কিছুকাল তাঁহার এইরূপ আত্মহারা অবস্থা ছিল। এই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পত্নী ও ভ্রাতাকে লইয়া দার্জিলিং গেলেন। রবীন্দ্রনাথ ভাবিলেন, 'এ আমার হইল ভাল — সদর স্ট্রীটের শহরের ভিড়ের মধ্যে যাহা দেখিলাম হিমালয়ের উদার শৈলশিখরে তাহাই আরও ভালো করিয়া গভীর করিয়া দেখিতে পাইব। অন্তত এই দৃষ্টিতে হিমালয় আপনাকে কেমন করিয়া প্রকাশ করে তাহা জানা যাইবে। কিন্তু সদর স্ট্রীটের সেই তুচ্ছ বাড়িটারই জিত হইল। হিমালয়ের উপরে চড়িয়া যখন তাকাইলাম তখন হঠাৎ দেখি, আর সেই দৃষ্টি নাই। বাহির হইতে আসল জিনিষ কিছু পাইব এইটে মনে করাই বোধ করি আমার অপরাধ হইয়াছিল।'

তাঁহার এই সব উক্তির দার্শনিক ব্যাখ্যা হইয়াছে, কিন্তু তিনি যে-ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে তাঁহার উপন্যাস '*গোরা*'তে *দিয়াছিলেন* উহার সহিত এগুলিকে কেহই যুক্ত করিল না। ব্যাখ্যাটা এইরূপ, —

'বিনয় বলিল, "আমি তোমাকে নিশ্চয় বলিতেছি, মানুষের সমস্ত প্রকৃতিকে এক মুহূর্তে জাগ্রত করিবার উপায় এই প্রেম। যে কারণেই হউক আমাদের মধ্যে এই প্রেমের আবির্ভাব দুর্ব্বল, সেইজন্যেই আমরা প্রত্যেকেই আমাদের সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত, আমাদের কি আছে, তাহা আমরা জানি না, যাহা গোপনে আছে তাকে প্রকাশ করিতে পারিতেছি না, যাহা সঞ্চিত আছে তাহাকে ব্যয় করা আমাদের অসাধ্য, সেই জন্যে চারিদিকে এমন নিরানন্দ এমন নিরানন্দ"।'

এই প্রসঙ্গে বিনয় আরো যখন বলিল, 'কোনো কোনো মাহেন্দ্রক্ষণে নরনারীর প্রেমকে আশ্রয় করিয়া একটি অনির্ব্বচনীয় অসামান্যতা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে,' গোরা তখন সেই কথাগুলি আগের মত হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিল না, মনে মনে স্বীকার করিল, 'তাহা সামান্য মিলন নহে, তাহা পরিপূর্ণতা, তাহার সংস্পর্শে সকল জিনিষেরই মূল্য বাড়িয়া যায়, তাহা কল্পনাকে দেহ দান করে ও দেহকে প্রাণে পূর্ণ করিয়া তোলে।'

ইহার পরও কথা আছে। 'জীবনস্মৃতি'-তে রবীন্দ্রনাথ সদর স্ট্রীটে বাস করিবার সময়ে তাঁহার মনের 'উলট্-পালট' হইবার যে-বিবরণ দিলেন, তাহার পূর্ব্বাভাষ যে দুই বৎসর আগে প্রকাশিত 'গোরা'-উপন্যাসে ছিল, তাহা দেখাইয়াছি। উহার অতিরিক্ত আরও কিছু আছে, তাহারও পরিচয় দেওয়া প্রাসঙ্গিক মনে করি। উহা এইরূপ। —

এই আভাষ প্রথমত পাই স্থানের বর্ণনাতে। বিনয় ও পরেশবাবুর বাড়ী

যে হেদুয়ার কাছে ও পরস্পর কাছাকাছি, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কিন্তু গোরাদের বাড়ী কোথায় সে-বিষয়ে তিনি অস্পষ্টতা রাখিয়াছেন। তবে এইটুকু বলা যায় যে, গোরা ও বিনয় যখন দেখা করিবার জন্য এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ীতে হাঁটিয়াই যায়, তখন দুই বাড়ীর মধ্যে দূরত্ব বেশী নয় — মাইলখানেকের মত — অর্থাৎ বৌবাজারের দক্ষিণে অথবা শ্যামবাজারের উত্তরে হইবার নয়।

অথচ এই অঞ্চলের মধ্যে এমন কোনো রাস্তা বা গলি নাই যাহার সহিত, উপন্যাসে গোরাদের বাড়ীর অবস্থান সম্বন্ধে যা কিছু উল্লেখ আছে তাহার মিল হয়। উল্লেখ এইরূপ —

(১) 'গির্জ্জার ঘড়িতে এগারোটা বাজিল।' (সুতরাং গোরার বাড়ীর কাছে বড় গির্জ্জা আছে।)

(২) 'তাহাদের গলিটা পূর্ব্বের দিকে একটা বড় রাস্তায় পড়িয়াছে। সেই বড় রাস্তার পূর্ব্বপ্রান্তে একটা ইস্কুল আছে; সেই ইস্কুলের সংলগ্ন জমিতে একটা পুরাতন জামগাছের মাথার উপরে পাতলা এক খণ্ড সাদা কুয়াশা ভাসিতেছিল এবং তাহার পশ্চাতে আসন্ন সূর্য্যোদয়েব অরুণরেখা ঝাপসা হইয়া দেখা দিতেছিল।'

(৩) 'গোরা' ছাদের উপর দাঁড়াইয়া পূর্ব্বদিকের রক্তিম আকাশে চাহিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।'

এইসব বর্ণনার সহিত রবীন্দ্রনাথ সদর স্ট্রীটের বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়াইয়া ফ্রী স্কুল স্ট্রীট ও ফ্রী স্কুলের বাগানের পিছনে সূর্য্যোদয়ের দৃশ্যের যে-বর্ণনা দিয়াছিলেন তাহার তুলনা করিলে বোঝা যাইবে যে, রবীন্দ্রনাথ অজ্ঞাতসারে গোরাদের বাড়ীর সহিত সদর স্ট্রীটের বাড়ীর অবস্থানের সাদৃশ্য দেখাইয়া ফেলিলেন — যদিও বাস্তবক্ষেত্রে উহা সম্ভব ছিল না। ইহাও বলা প্রয়োজন যে, বিনয় নিজের বাড়ী হইতে গোরার বাড়ী আসিয়াছিল সেদিন নিজের বিবাহের সংবাদ দিবার জন্য। কার্যত সূর্যোদয়ের আগে এতদূর আসা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়, বিশেষত জানুয়ারী মাসের ঠাণ্ডাতে। তবু রবীন্দ্রনাথ নিজে যাহা দেখিয়াছিলেন গোরাকেও তাহা দেখাইবার জন্য বিনয়কে নিজের বাড়ী হইতে 'অন্ধকার থাকিতেই' রওনা করাইলেন। তবু একটা ভুল করিলেন — বিনয় গোরাকে পাইল ঠাকুরঘরে পূজায় নিযুক্ত, কিন্তু হিন্দুরা সূর্যোদয়ের আগে পূজা করে না। Association of ideas or feelings বড় বিপজ্জনক জিনিষ, উহার বশে ইচ্ছা না থাকিলেও কবুল হইয়া যায়।

এই দৃশ্য দেখিবার পর গোরার মনে যে-ভাব আসিল তাহার বিবরণ রবীন্দ্রনাথ যাহা দিলেন, তাহাতেও এই আশ্লেষ আসিয়া গেল। উহা উদ্ধৃত

করিতেছি। —

'বিনয় চলিয়া গেল, বেলা বাড়িতে লাগিল। কিন্তু সে-সঙ্গীত কোনোমতেই থামিতে চাহিল না। সমুদ্রগামিনী দুই নদী একসঙ্গে মিলিলে যেমন হয়, তেমনি বিনয়ের প্রেমের ধারা আজ গোরার প্রেমের উপর আসিয়া পড়িয়া তরঙ্গের দ্বারা তরঙ্গকে মুখরিত করিতে লাগিল। গোরা যাহাকে কোনোপ্রকারে বাধা দিয়া, আড়াল দিয়া, ক্ষীণ করিয়া নিজের অগোচরে রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহাই আজ কূল ছাপাইয়া আপনাকে সুস্পষ্ট ও প্রবল মূর্ত্তিতে ব্যক্ত করিয়া দিল। তাহাকে অবৈধ বলিয়া নিন্দা করিবে, তাহাকে তুচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিবে এমন শক্তি আজ গোরার রহিল না।'

উপন্যাসে গোরার মনে এই ভাব দিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ কি অন্যমনস্কভাবে নিজের মনের ভাবই বেনামীতে প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন না? আমার মনে হয় গোরা উপন্যাসের এইসব কথাতে 'জীবনস্মৃতি'-র 'প্রভাতসঙ্গীত' অধ্যায়টি বুঝিবার সঙ্কেত আছে।

রবীন্দ্রনাথের এই সব উক্তির গভীর ও প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে দুইটি প্রসঙ্গের আলোচনার আবশ্যক আছে — প্রথমত, পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে সম্পর্ক তাহার দেশকাল নিরপেক্ষ রূপ কি? দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালে বাঙালীর মধ্যে এ-বিষয়ে কি ধারণা ও অনুভূতি ছিল। দুইটি সম্বন্ধেই আমার বক্তব্য সংক্ষেপে বলি।

প্রথমত, পুরুষ ও নারীর সম্পর্কের মত জটিল সম্পর্ক মানুষের মধ্যে আর একটিও নাই, উহা যে শুধু নানা বেশে দেখা দেয় তাই নয়, ছদ্মবেশেও দেখা দেয়। এই সম্পর্ক যেমন অবিচ্ছেদ্য, তেমনই বিচিত্র। ইহা পুরুষের সহিত পুরুষের সম্পর্কের মত বন্ধুত্বের সম্বন্ধ হইতে পারে, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে আত্মীয়ের সহিত আত্মীয়ের স্নেহের সম্পর্ক হইতে পারে। তবে স্ত্রী-পুরুষের এই ধরনের সম্পর্কেও স্ত্রী-পুরুষের বিশেষ যে-সম্পর্ক, যাহা জৈবধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহারও আশ্লেষ আসিয়া যায়। ইহা ঘটে পুরুষ পুরুষ এবং নারী নারী বলিয়া।

আমার এই অনুভূতি অল্পবয়সেই আসিয়াছিল। তখন আমি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে যাইব, একদিন আমার এক যুবতী বৌদিদিকে বলিলাম, 'জানেন, ছেলেরা মা সুন্দরী হইলে খুবই খুশী হয় ও গর্ব অনুভব করে।' তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'সে আবার কি?' পুরুষ-নারীর সম্পর্ক এইভাবে প্রধানত জৈববৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উহাতে জৈববৃত্তির মানুষের সৃষ্ট ঘৃণ্য বিকার যেমন থাকিতে পারে, তেমনি মানুষেরই সৃষ্ট দিব্য রূপও থাকিতে পারে। নরনারীর সম্পর্কের বিস্তৃত স্বরগ্রামের মধ্যে কোনো বিশেষ দুইটি নরনারীর সম্পর্ক কোন্ পর্দায় থাকিবে তাহা বলা প্রায় অসম্ভব, এক পর্দায় থাকিতে পারে, নানা পর্দাতেও থাকিতে পারে।

ইহার পরও আর একটা কথা বলা প্রয়োজন — একই পুরুষ ও একই

নারীর মধ্যে অনেকদিনের স্থির সম্পর্কও হঠাৎ একদিন অন্য রূপ ধারণ করিতে পারে, অর্থাৎ যেটা বন্ধুত্ব বা স্নেহের সম্পর্ক ছিল তাহা বিশিষ্ট অর্থে নরনারীর প্রেমের সম্পর্ক হইয়া দাঁড়াইতে পারে। এই সব পরিবর্তন যুক্তির বাধ্য নয়, যুক্তিগোচরও নয়।

আরও বলা প্রয়োজন, বিবাহবন্ধনে প্রেম থাকিতেও পারে, নাও থাকিতে পারে। বিবাহিত জীবনে প্রেম থাকিবেই ইহা বলা চলে না। সুতরাং বিবাহবন্ধনে সন্তানের জন্ম প্রেমের ফল নাও হইতে পারে। বাঙালী সমাজে বাল্যবিবাহের জন্য অনেক সময়েই সন্তানের জন্ম শুধু জৈববৃত্তি হইতে হইত, উহার জন্য প্রেমের আবশ্যক হইত না। পরজীবনেও প্রেমবিহীন বিবাহবন্ধনে, এমন কি স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি বিরাগ থাকিলেও, সন্তান-জন্মে বাধা জন্মিত না।

এইবার আমার দ্বিতীয় বক্তব্যে আসি। সেটা এই — রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালে শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে নরনারীর প্রেম সম্বন্ধে কি ধারণা ও অনুভূতি ছিল? আমি আমার 'আত্মঘাতী বাঙালী'-র প্রথম খণ্ডে লিখিয়াছি যে, ইংরেজ শাসনের দ্বিতীয় যুগে, অর্থাৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবার পর হইতে নারীর সন্ধানই বাঙালীজীবনে তীব্রতম সন্ধান হইয়া দাঁড়াইল। আমি বলিলাম, ইহার আগের যুগে অর্থান্বেষণ হইয়াছিল বাঙালীর কর্মযোগ, পরের যুগে নারীর সন্ধান হইল বাঙালীর ভক্তিযোগ। উহা বঙ্কিমচন্দ্র আরম্ভ করিলেন, রবীন্দ্রনাথ চালাইলেন, আমি বলিব শরৎচন্দ্র শেষ করিলেন।

বাঙালীর এই যে সন্ধান. উহার পিছনে কি যে ছিল তাহার বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশও নাই। উহা ইউরোপের 'রোমান্টিক মুভমেন্ট' — যাহার অভিঘাত বাঙালীর উপর প্রধানত পড়িতেছিল ইংরেজী সাহিত্যের ভিতর দিয়া। ইহা যেমন আসিতেছিল সেকস্‌পীয়র হইতে তেমনই আসিতেছিল পরবর্তী রোমান্টিক যুগের কবিদের কাছ হইতে। এটা রবীন্দ্রনাথ ভাল করিয়াই জানিতেন। তাই তিনি লিখিয়াছিলেন —

> 'ইংরেজী সাহিত্যে আর একদিন যখন পোপ-এর কালের টিমাতেতালা বন্ধ করিয়া ফরাসী বিপ্লবনৃত্যের ঝাঁপতালের পালা আরম্ভ হইল, বায়রন সেই সময়কার কবি। তাঁহার কাব্যেও সেই হৃদয়াবেগের উদ্দামতা আমাদের এই ভালোমানুষ সমাজের ঘোমটা-পরা হৃদয়টিকে, এই কনে বউকে উতলা করিয়া তুলিয়াছিল। তাই ইংরেজী সাহিত্যালোচনার সেই চঞ্চলতা আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। সেই চঞ্চলতার ঢেউটাই বাল্যকালে আমাদিগকে চারিদিক হইতে আঘাত করিয়াছে। সেই প্রথম জাগরণের দিন সংযমের দিন নহে, উত্তেজনারই দিন।'

রোমান্টিক কবিরা প্রেমের দিগ্বিজয়ী শক্তির কথা যেমন কাব্যে প্রচার করিলেন, তেমনই নিজেদের জীবনে দেখাইলেন। ইহা ইংলণ্ডে শুধু

বায়রন, শেলী, কীটস্-ই নয়, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ পর্যন্ত প্রমাণ করিলেন; ফ্রান্সে দেখাইলেন হ্যুগো, লামার্তিন, ম্যুসে, আলফ্রেড দো ভিঞি; ইতালীতে দেখাইলেন আলফিয়েরী, আরও নাম করিতে পারিতাম।

ইহার চেয়েও চাঞ্চল্যকর কথা, 'রোমান্টিক মুভমেন্ট' হইতে বাঙালীও যাহা শিখিল তাহা এই — প্রেম অহৈতুকী, পাত্রাপাত্র বিচার করে না, পাপীকেও ভালবাসিতে হইবে। যুবক বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৬৯ সনে) তাহা বলিলেন —

> হেমচন্দ্র। 'তোমার উপদেষ্টা কি বলিয়াছেন প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নাই, পাপাসক্তকেও ভালবাসিতে হইবে?'
>
> মনোরমা। 'পাপাসক্তকেও ভালবাসিতে হইবে; প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নাই। সকলকেই ভালবাসিবে। প্রণয় জন্মিলেই তাহাকে যত্নে স্থান দিবে, কেন-না প্রণয় অমূল্য। ভাই, যে ভাল তাহাকে কে না ভালবাসে? যে মন্দ তাকে যে আপনা ভুলিয়া ভালবাসে আমি তাকে বড় ভালবাসি। কিন্তু আমি তো উন্মাদিনী।'

রবীন্দ্রনাথও শেষজীবনে লিখিয়াছিলেন,

> 'জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে
> যে অভাগিনী পাপের ভারে
> চরণে তব বিনতা —
> ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না আমার এ ক্ষমাহীনতা।'

কেন-না ঘোর পাপে অপরাধিনী প্রিয়াকে এই প্রেমিক বুকে লইতে পারে নাই। যিনি প্রেমের এই মহিমার কথা বৃদ্ধবয়সে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তিনি যৌবনে প্রেমের গান জয়জয়ন্তী রাগিণীতে গাহিবেন তাহা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার।

পঞ্চম অধ্যায়

মৃত্যুশোক

এইবার 'জীবনস্মৃতি'র 'মৃত্যুশোক' অধ্যায়টির আলোচনা করিব। অধ্যায়টি দীর্ঘ নয়, ছাপায় তিনটি পুরা পৃষ্ঠামাত্র। কিন্তু ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলে ভুল হইবে যে, অধ্যায়টির বক্তব্য সহজবোধ্য বা বক্তব্যের ভাষাও সরল। ইহার দুরূহতা লেখকের দিক হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ নিজে, পাঠকদের দিক হইতে সৃষ্ট হইয়াছে তাহাদের মনোবৃত্তি হইতে। মোটের উপর অধ্যায়টির আসল অর্থ কি তাহা আবিষ্কার করা সহজ নয়।

প্রথমে রবীন্দ্রনাথ কি করিয়াছেন তাহার কথা বলি। যেমন 'প্রভাতসঙ্গীত' অধ্যায়ে তেমনই এই অধ্যায়েও কাহারও নাম করিলেন না। শুধু ইহাই নয়, আরও অস্পষ্টতার সৃষ্টি করিলেন এই কথা বলিয়া— 'ইতিমধ্যে বাড়িতে পরেপরে কয়েকটি মৃত্যু ঘটনা ঘটিল।' ইহার ইঙ্গিত এই যে, তাঁহার মৃত্যুশোক কোনো একজনের মৃত্যু হইতে হয় নাই, হইয়াছে পরিবারের একাধিক ব্যক্তির মৃত্যু হইতে। অথচ অধ্যায়টি মন দিয়া পড়িলে স্পষ্ট অনুভূত হয় যে উহার বিষয় একজনেরই মৃত্যু।

ইহা ছাড়া তারিখ এবং বয়স সম্বন্ধেও গোল বাধাইলেন। তিনি লিখিলেন, 'আমার চব্বিশ বৎসর বয়সের সময় মৃত্যুব সঙ্গে যে-পরিচয় হইয়াছিল উহা স্থায়ী পরিচয়।' তাঁহার চব্বিশ বছব বয়স পূর্ণ হইয়াছিল ১৮৮৫ সনের মে মাসে, কিন্তু অন্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু হইয়াছিল ১৮৮৪ সনের এপ্রিল মাসে, অর্থাৎ এক বৎসর পূর্বে। এইসব গোলমালের কারণ কি আমি বলিতে পারিলাম না।

রবীন্দ্রনাথ আরও বাধা সৃষ্টি করিলেন, অথবা তিনি নিজে ইচ্ছা করিয়া সৃষ্টি না করিলেও সৃষ্ট হইল অধ্যায়টির ভাষা (diction) ও রীতি (style) হইতে। সমগ্র 'জীবনস্মৃতি'রই ভাষা ও রীতি সহজ নয়। আমাদের প্রাচীন অলঙ্কার-শাস্ত্রে যাহাকে স্বভাবসৌন্দর্য, প্রসাদগুণ, প্রাঞ্জলতা প্রভৃতি গুণ বলে তাহার অভাব 'জীবনস্মৃতি'তে আছে। অলঙ্কারশাস্ত্রের ভাষাতেই বলিব, উহা নির্ভাজ বৈদর্ভী রীতিতে লেখা নয়, অনেকটা গৌড়ী রীতিতে লিখিত। তাঁহার ভাইঝি-জামাই প্রমথ চৌধুরী খুড়শ্বশুরকে লক্ষ্য না করিয়াও বলিয়াছিলেন, গৌড়ী রীতি 'অক্ষরডম্বর', অর্থাৎ ইংরেজিতে যাহাকে বলে bombastic. Bombastic লেখা কৃত্রিম হইয়া থাকে লেখকের মনের কৃত্রিমতা হইতে। আসলে রবীন্দ্রনাথের মন বা ভাষা কিছুই

কৃত্রিম নয়, তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা অকপটভাবে, তাহার ভাষা তাঁহার মনোভাবেরই অনুরূপ।

ভাষা ও রীতি সম্বন্ধে এই বলিব যে দুইটির কোনটিই ইংরেজ কবি পোপ বা ইংরেজ ঐতিহাসিক গিবনের ভাষা ও রীতির মত literary diction নয়। তাঁহার গদ্যকে বার্কের ইংরেজী গদ্যের মত বলা চলে, অর্থাৎ অলঙ্কারবহুল হইলেও স্বাভাবিক, লেখকের মন যাহা ভাষাও তাহাই। সুতরাং আত্মপ্রকাশের দিক হইতে তাঁহার ভাষাকেও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের natural diction বলিতে পারি। 'জীবনস্মৃতি'র এই অধ্যায়টি সম্বন্ধে আরও বিশেষ করিয়া এই কথা বলা যাইতে পাবে, আসলে ইহার ধর্ম কাব্যের, সুতরাং এইরূপ কাব্যের সৃষ্টি সম্বন্ধে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যাহা বলিয়াছেন তাহা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। ইংরেজ কবির কথাগুলি এইরূপ,—

'Poetry is spontaneous overflow of powerful feelings; it takes its origins from eomotion recollected in tranquillity.'

আসলে এই অধ্যায়টিতে যে দুরূহতা দেখা যায় তাহা আসিয়াছে রবীন্দ্রনাথের মনের বৈদগ্ধ্য ও সূক্ষ্মতা হইতে। এই অধ্যায়টির ভাব তাঁহার মনের বিসর্পিত গুহায় নিহিত, সুতরাং উহার ভাষাগত রূপ সরল রেখার মত হওয়া সম্ভব ছিল না।

এই কারণেই এই অধ্যায়টি বুঝিবার পক্ষে বাধা বাঙালী পাঠকসমাজের মন হইতেও সৃষ্ট হইয়াছে এবং হইবে। সাধারণ বাঙালীর মন অগভীর, কিন্তু এইজন্যই সে রচনাতে ভাষার ঝঙ্কার ও বাহুল্য আনিয়া সেই অগভীরতাকে ঢাকিবার চেষ্টা করে। এই অভ্যাসের জন্যেই আবার কোনো রচনাতে অলঙ্কার ও জটিলতা দেখিলে মনে করে উহা কথার মারপ্যাঁচ মাত্র, উহাতে ওস্তাদি দেখানো ছাড়া গভীর ভাবের প্রকাশ নাই। ইহা মনে করা বাঙালী পাঠকের পক্ষে আরও স্বাভাবিক এই কারণে যে, অধিকাংশ বাঙালী লেখকই অমায়িক ও অকপট নয়, উহাদের রচনারীতি লেখক বলিয়া বাহবা পাইবার উপায়মাত্র। সুতরাং 'জীবনস্মৃতি'র এই অধ্যায়টিকে 'কাব্যি ক'রে কথা কওয়া' বলিয়া ভুল করা বাঙালী পাঠকের পক্ষে অস্বাভাবিক আচরণ নয়। আসলে অধ্যায়টিতে তিনি তাঁহার মনের গভীর ভাব গভীর ভাবে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তবে ভাবটাই যখন সহজ নয়, ভাষাও সহজ হইতে পারে নাই।

এই সব ছাড়া মৃত্যু সম্বন্ধে এই অধ্যায়টি পড়িতে গিয়া সর্বোপরি এই কথাটা মনে রাখিতে হইবে যে, ইহাতে তিনি ১৮৮৪ বা ১৮৮৫ সনে যাহা অনুভব করিয়াছিলেন, সেই সদ্যসম্ভূত ভাবই লিপিবদ্ধ করেন নাই। এই

অধ্যায়টি তিনি লিখিয়াছিলেন, অনেক পরে, ১৯১১ সনে। তখন মৃত্যুর অভিজ্ঞতা তাঁহার আরও অনেক হইয়াছিল— তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু, কন্যার মৃত্যু, পুত্রের মৃত্যু, পিতার মৃত্যু, আরও দুই-একটি স্নেহের পাত্রের মৃত্যু। সুতরাং ১৮৮৪-৮৫ সনের মৃত্যুকে পরবর্তী মৃত্যুর অভিজ্ঞতা হইতে দেখিয়াছিলেন। তিনি নিজেও লিখিলেন যে, সেই পূর্ববর্তী মৃত্যু 'পরবর্ত্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদ-শোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে।' এই শোকের স্মৃতি যদি পরবর্তী শোকের সহিত মিলিয়া থাকে, তাহা হইলে পরবর্তী শোকের আঘাতও পূর্ববর্তী শোকের উপর পড়িয়াছে। সুতরাং এই অধ্যায়টিকে রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাশ বৎসর বয়সে মৃত্যু সম্বন্ধে যে-ধারণায় পৌঁছিয়াছিলেন উহাকে পিছনের দিকে ফেলা বলা যাইতে পারে।

ভূমিকা অনেক করিলাম। এখন রবীন্দ্রনাথ এই অধ্যায়ে যাহা বলিলেন তাহার যতটুকু আমি বুঝিয়াছি তাহা লিখিতেছি, সব বুঝিয়াছি জোর করিয়া বলিব না। 'প্রভাতসঙ্গীতে' প্রেমের আবির্ভাব হইলে প্রেমিকের মনে যে উচ্ছলতার সৃষ্টি হয়, তাহার বিবরণ তিনি দিলেন। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই এই উচ্ছলতা মৃত্যুর আঘাত পাইল। এই আঘাত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ক্রমিক এই কয়েকটি মানসিক অবস্থার পরিচয় দিলেন,—

১। মাতার মৃত্যু তিনি স্বচক্ষে দেখেন নাই, তখন ঘুমাইয়া ছিলেন, কিন্তু প্রভাতে যাহা দেখিলেন, সে সম্বন্ধে লিখিলেন, 'যখন মা'র মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম তখন সে-কথার অর্থ ভালো করিয়া বুঝিতেই পারিলাম না। বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম তাঁহার সুসজ্জিত দেহ প্রাঙ্গণে খাটের উপর শয়ান। কিন্তু, ও-মৃত্যু যে ভয়ঙ্কর সে-দেহে তাহার কোনো প্রমাণ ছিল না, সেদিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে-রূপ দেখিলাম তাহা সুখসুপ্তির মতই প্রশান্ত ও মনোহর।' শুধু শ্মশানে যাইবার সময়ে তাঁহার হৃদয়ে শোকের ঝড় বহিয়া গেল।

২। এই শোক স্থায়ী হয় নাই। তাহার কারণ প্রাণশক্তি। তিনি লিখিলেন, 'শিশুকালে সেই প্রাণশক্তি নবীন ও প্রবল থাকে, তখন সে কোনো আঘাতকে প্রবলভাবে গ্রহণ করে না, স্থায়ী রেখা আঁকিয়া রাখে না। এই জন্যে জীবনে প্রথম যে-মৃত্যু কালো ছায়া ফেলিয়া প্রবেশ করিল তাহা আপনার কালিমাকে চিরন্তন না করিয়া ছায়ার মতই একদিন নিঃশব্দপদে চলিয়া গেল।'

৩। তবে ১৮৮৪-৮৫ সনে মৃত্যুর সঙ্গে তাঁহার যে পরিচয় হইল তাহার অভিঘাত স্থায়ী হইয়া রহিল, কিন্তু একভাবে নয়। প্রথম ভাব এইরূপ—রবীন্দ্রনাথ জীবনকেই চরম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, 'এমন

সময়ে কোথা হইতে মৃত্যু আসিয়া এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ জীবনটার একটা প্রান্ত যখন এক মুহূর্তের মধ্যে ফাঁক করিয়া দিল, তখন মনটার মধ্যে সে কি ধাঁধাই লাগিয়া গেল।' জীবনের বস্তুগত সাথী, যেমন গাছপালা, মাটিজল, চন্দ্রসূর্য, গ্রহতারার মত যাহা নিশ্চিত বলিয়া মনে হইত 'সেই নিকটের মানুষ যখন এত সহজে এক নিমেষে স্বপ্নের মত মিলাইয়া গেল তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল, এ কি অদ্ভুত আত্মখণ্ডন।' তাঁহার জীবনে একটা অতলস্পর্শ অন্ধকার প্রকাশিত হইল। তিনি ভাবিলেন, এই অন্ধকার অতিক্রম করিতে না পারার মত দুঃখ আর কিছু নাই।

৪। কিন্তু এই দুঃসহ দুঃখের ভিতর দিয়া তাঁহার মনে আর একটা ভাব আসিল— উহা আনন্দের। ইহাতে তিনি নিজেই আশ্চর্য হইয়া গেলেন। তিনি সহসা বুঝিলেন যে মানুষ নিশ্চল সত্যের পাথরে গাঁথা দেয়ালের মধ্যে চিরদিনের মত কয়েদি নহে। ঐহিক জীবনের প্রতি তাঁহার অন্ধ আসক্তি চলিয়া গিয়াছিল বলিয়াই তিনি যে-দুঃখ পাইতেছিলেন তাহা দূর হইল। উহার পরিবর্তে তিনি যাহা পাইলেন তাহা এই—'জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্যে যে-দূরত্বের প্রয়োজন মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম, তাহা বড় মনোহর।'

এই কথাগুলিকে যদি সৌখীন কাব্যকথা বলিয়া ধরিয়া সৌখীন ভাবেই গ্রহণ না করা যায়, তাহা হইলে এগুলি দুর্বোধ্য হেঁয়ালি বলিয়া মনে হইবে, প্রশ্ন জাগিবে—মৃত্যুশোক হইতে আনন্দের উদ্ভব কি করিয়া হইতে পারে? ইহার উত্তর পাওয়া কঠিন নয়। মৃত্যুকে উপেক্ষা করিবার শক্তি আসে ধর্মবোধ (religious feeling) হইতে। উহার বশে যদি কেহ মানুষের অস্তিত্ব জন্মমৃত্যুর দ্বারা সীমাবদ্ধ বলিয়া না মানিয়া, মৃত্যুর পরপারে অনন্ত বলিয়া মানে, তাহা হইলে ইহলোকে কোনো কিছুর অবসান হইল বলিয়াই উহার অবসান চিরদিনের মত হইল মনে করিয়া দুঃখবোধ করিতে পারে না, বরঞ্চ মনে করে যাহা মৃত্যুর বন্ধনে ইহজগতে শৃঙ্খলিত ছিল তাহা সেই শৃঙ্খল ভাঙিয়া অনন্ত জীবন পাইল। তখন সে খৃষ্টধর্মের ভাষায় বলিতে পারে--

'When this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?'

রবীন্দ্রনাথের পরলোকে অবিচলিত বিশ্বাস সারাজীবন ধরিয়াই ছিল, সুতরাং তিনি মৃত্যুর সদ্য আঘাত, যে আঘাত সাময়িক, অস্থায়ী ঐহিক

আঘাত মাত্র, তাহা হইতে যে কিছুদিনের মধ্যেই মুক্ত হইবেন এই ধারণা করা সঙ্গত বলিয়াই মনে হইবে। তিনি নিজেই কিছুদিন পরে লিখিলেন,—

'দুর্গম পথ এ ভবগহন, কত ত্যাগ শোক বিরহদহন,
জীবনে মৃত্যু করিয়া বহন প্রাণ পাই যেন মরণে'—

যাহা কিছু আমাদের কাছে নশ্বর বলিয়া মনে হয় মৃত্যু যদি তাহাকেই অনন্ত প্রাণ দেয় তাহা হইলে মৃত্যু হইতে আনন্দের উৎস উঠিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ইহার পরেও কথা আছে। মৃত্যু হইতে আনন্দ পাইলেও তিনি সাংসারিক জীবনে একটা বিপরীত আচরণ দেখাইলেন। ইহার কথা তিনি নিজে এইভাবে লিখিয়াছেন,—

'সেই সময়ে আবার কিছুকালের জন্যে আমার একটা সৃষ্টিছাড়া রকম মনের ভাব ও বাহিরের আচরণ দেখা গিয়াছিল। সংসারের লোকলৌকিকতাকে নিরতিশয় সত্য পদার্থের মত মনে করিয়া তাহাকে সদাসর্ব্বদা মানিয়া চলিতে আমার হাসি পাইত। সে-সমস্ত যেন আমার গায়েই ঠেকিত না। কে আমাকে কি মনে করিবে, কিছুদিন এ দায় আমার মনে একেবারেই ছিল না। ধুতির উপরে গায়ে কেবল একটা মোটা চাদর এবং পায়ে একজোড়া চটি পরিয়া কতদিন থ্যাকারের বাড়ীতে বই কিনিতে গিয়াছি। আহারের ব্যবস্থাটাও অনেক অংশে খাপছাড়া ছিল। কিছুকাল ধরিয়া আমার শয়ন ছিল বৃষ্টি বাদল, শীতেও তেতালায় বাহিরের বারান্দায়...' ইত্যাদি।

কিন্তু তিনি ইহাও লিখিলেন, 'এ-সমস্ত যে বৈরাগ্যের কৃচ্ছ্রসাধন তাহা একেবারেই নহে। এ যেন আমার একটা ছুটির পালা।' ইহার অর্থ কি?

অর্থ পাওয়াও কঠিন নয়। অর্থ এই, এই সবই পার্থিব নশ্বর জীবনের আনুষঙ্গিক, ইহাদের অমর অস্তিত্ব নাই, সুতরাং ইহাদের প্রতি আসক্তিতে গৌরব কিছুই নাই। ইহা 'অল্প লইয়া থাকা', যাহার জন্য 'যাহা যায় তাহা যায়।' অবশ্য রবীন্দ্রনাথের এই সাময়িক বৈরাগ্য, বাহ্যিক সৌষ্ঠব রাখিবার জন্যে যে শ্রম করিতে হয় ও স্বাধীনতার যতটুকু ক্ষয় হয় তাহার সম্বন্ধে তিনি বাল্যবয়সে যে অধৈর্য অনুভব করিতেন তাহারই অন্য রূপ। যে-বিরাগ তাঁহার চরিত্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহাকে শোকের আঘাতে তিনি আরও সম্পূর্ণরূপে দেখাইতে চাহিলেন।

কিন্তু যে সব জিনিস মূলত সত্য, সুন্দর, মহান্‌, এবং কাম্য, যেগুলি ইহলোকের হইলেও ইহলোকের আনুষঙ্গিক মাত্র নয়, সেগুলির প্রতি তাঁহার বিরাগ জন্মিল না। তিনি বস্ত্র সম্বন্ধে উদাসীন হইলেও থ্যাকার-স্পিংক-এর দোকানে গিয়া বই কিনিতে লাগিলেন কারণ উহা মানসিক জীবনের অবলম্বন। এই ধরনের জিনিস যাহা ইহলোকে অসম্পূর্ণ, বিপদের দ্বারা আক্রান্ত ও বিনাশের সতত সম্মুখীন সেগুলি মৃত্যুর সিংহদ্বার পার হইয়া অনন্তের দেশে পৌছিবে ইহাই সারা জীবন জুড়িয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

সেজন্য তিনি ইহাও মনে করিতে পারিলেন যে, প্রেমও অনন্তলোকে স্থান পাইবে, যদি তাহা সত্যকার প্রেম হয়, শুধু সমাজের নিয়মবিরুদ্ধ বলিয়া উহা পরলোকে অমরত্ব পাইবার অযোগ্য হইবে না। রবীন্দ্রনাথের বাল্যবয়সে প্রেম সম্বন্ধে এই ধারণাটা প্রচলিত ছিল—বঙ্কিমচন্দ্রে উহা পাই। প্রতাপের মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি লিখিলেন, 'যাও প্রতাপ, অনন্তধামে। যাও, যেখানে ইন্দ্রিয়জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেখানে যাও।' এই বিশ্বাসের ঐহিক প্রতিরূপ বঙ্কিমচন্দ্রেরই 'রজনী' উপন্যাসেও পাই। অমরনাথ লবঙ্গলতার কাছে বিদায় লইবার সময়ে বলিল—

'আমি সে স্নেহের ভিখারী আর নহি। তোমার এই সমুদ্রতুল্য হৃদয়ে কি আমার জন্য এতটুকু স্থান নাই?'

লবঙ্গ উত্তর দিল—

'না, যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং মহাদেব হইলেও তাঁহার জন্য আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই। লোকে পাখী পুষিলে যে-স্নেহ করে ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে-স্নেহও কখনো হইবে না।'

অমরনাথ শুধু ভাবিল— 'ইহলোকে?' অবশ্য এও বুঝিল লবঙ্গের কাছে পরলোকে স্নেহ স্বতন্ত্র ব্যাপার।

রবীন্দ্রনাথ ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার পরলোকে আস্থা সম্বন্ধে আলোচনা পরে করিব। এখানে শুধু পরলোকে প্রেমের কি স্থান এই বিষয়ে কিছু বলিব। তিনি পরজীবনে লিখিলেন—

'যে প্রেম সম্মুখ পানে
চলিতে চালাতে নাহি জানে,
যে প্রেম পথের মধ্যে পেতেছিল নিজ সিংহাসন,
তার বিলাসের সম্ভাষণ
পথের ধূলার মত জড়ায়ে ধরেছে তব পায়ে—
দিয়েছ তা ধূলিরে ফিরায়ে।'

তাহা হইলে কি বলিতে হইবে, ইহজগতে যে প্রেম ছিল বা রহিল, যে-প্রেম মৃত্যুর সহায়তায় অমরত্ব পাইল না, তাহা কাম্য নয়, এমন কি অন্যায়? রবীন্দ্রনাথ ইহা স্পষ্ট করিয়া কখনো বলেন নাই, কার্যতও এইরূপ বিশ্বাসের পরিচয় দেন নাই। অন্ততপক্ষে এটা অকাট্য সত্য, জীবনের শেষে মৃত্যু যেমন সত্য তেমনই সত্য যে, যতদিন দেহে প্রাণ আছে ততদিন মানুষ শুধু যে প্রেমের আকাঙ্ক্ষা করিবে তাহাই নয়, নিজেও ভালবাসিবে, একজন গেলে আর একজনকে ভালবাসিবে।

এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজে কিছু না বলিলেও আমার মনে হয় আমার ধারণার মত একটা ধারণা তাঁহারও ছিল বলা যাইতে পারে। আমার ধারণাটা কি তাহা বলি। আমি অতি অল্পবয়সে 'প্রবাসী' পত্রিকাতে বিখ্যাত ইংরেজ

চিত্রকর জি এফ ওয়াট্‌সের 'প্রেম ও মৃত্যু' এই চিত্রের রঙীন প্রতিলিপি দেখিয়াছিলাম। তখন উহার অর্থ বুঝি নাই, কিন্তু যৌবন হইবার পর বুঝিলাম জীবন, প্রেম ও মৃত্যুর মধ্যে যে-সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা অবিচ্ছেদ্য। প্রেম ভিন্ন জীবনের স্রোত বহিতে পারে না, অথচ মৃত্যু প্রেমকে লইয়া যায়, সেজন্য মৃত্যুকেও প্রেমের সহায়ক করিতে হইবে। এই বিশ্বাসের বশে ১৯২৪ সনে আমি ইংরেজিতে একটা গল্প লিখিয়াছিলাম, তাহা আমি আমার আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে ছাপাইয়াছি। উহার বিষয়টা এইরূপ—এক সওদাগরী আপিসের কয়েকজন কেরানী তাহাদের একটি বৃদ্ধ সহকর্মীকে সৎকারের জন্য নিমতলাঘাটে লইয়া গিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে একটি যুবক কেরানী ছিল।

সে কি অনুভব করিয়াছিল তাহাই বর্ণনা করিয়াছিলাম। মৃতদেহকে ঘাটে লইয়া গিয়া যখন স্নান করাইতেছিল তখন চারিটি অল্পবয়স্কা বেশ্যা দূর হইতে সেই নগ্ন দেহটি দেখিতে লাগিল। ইহাদের একজনের বর্ণনা আমি এইরূপ দিলাম—

'One of them was in white, and the rest were in blue How much fresher and younger they looked. he thought. than the women he knew. The girl in white, especially, was a very winsome creature. She was a brunette with long eyelashes and a budlike mouth. Every line of her faultless figure could be guessed through her half-transparent muslin sari She stood a little apart, gazing at the dead man with wide wondering eyes, bending forward in her perplexity. She looked, so it seemed to all who saw her there, like a phantom of the spirit of life '

অবশ্য সৎকারের সময়ে যুবকের ইহাব কথা মনে ছিল না। কিন্তু সৎকার শেষ হইলে সে যখন বাড়ী ফিরিতেছিল, তখন তাহার মূর্তি আবার স্মরণপথে আসিল, আমি গল্পটাতে লিখিলাম—

'On that cold winter evening, as he walked along the street, shivering and chattering in his teeth in his wet clothes, a terrifying desire took possession of him, he wanted a woman's love, a love which would give a sharp edge of agony to his pertrified suffering. In a wild vision he saw death and love enlaced together in an eternal embrace. He could feel their arms about him, their warm breath was on his face. When he looked into their eyes, he recognized the countenance of the girl he had seen at the ghat. Could he not take shelter in that bosom, lose himself in that soft flesh, and find there a delicious, aching annihilation for his starved body and senses?'

বলা প্রয়োজন, অথবা নিষ্প্রয়োজন যে, এই বর্ণনা কেউ স্বচক্ষে না দেখিয়া দিতে পারে না। আমিও ১৯২২ সনে আমার এক বৃদ্ধ আত্মীয়ের সৎকারের জন্য নিমতলা ঘাটে গিয়া তাঁহার দেহ গঙ্গায় স্নান করাইবার সময়ে এই চারিটি তরুণী বেশ্যাকে দেখিয়াছিলাম। যেমন দেখিয়াছিলাম তেমনটিই লিখিয়াছিলাম। সেই বয়সেই আমার অনুভূতি আসিয়াছিল যে,

মৃত্যু প্রেমকে আঘাত করিতে পারে বটে প্রেমের অবলম্বন দেহকে গ্রাস করিয়া; কিন্তু দেহে যতক্ষণ প্রাণ থাকে ততক্ষণ দেহ মৃত্যুকেও প্রেমের দাস করিয়া উহার শক্তি বাড়াইতে পারে; বিরহ প্রেমে আরও তীব্রতা আনে, এ-কথা সকলেই বলে, মৃত্যু অনন্ত বিরহ—তাই উহা প্রেমের সহায়ক।

আমি ছাব্বিশ বৎসর বয়সে এইরূপ অনুভূতির বশে গল্পের কথাগুলি লিখিয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথও এইরূপ অনুভূতির বশ হইয়াছিলেন কিনা এ সম্বন্ধে আমার অনুমান যাহাই হউক বলিবার অধিকার আমার নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কড়ি ও কোমল

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে নিজের জীবনের কাহিনী ১৮৮৬ সন, অর্থাৎ তাঁহার পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত আনিয়াছিলেন, এবং তাঁহার স্মৃতিকথার শেষ অধ্যায়ের নাম দিয়াছিলেন 'কড়ি ও কোমল'। এই বৎসরেই তাঁহার কবিতার বই 'কড়ি ও কোমল'ও প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং মনে করা স্বাভাবিক যে, শেষ অধ্যায়ে বইটির আলোচনা থাকিবে। আসলে কিন্তু অধ্যায়টাতে বইটা অথবা উহার কবিতাগুলির সম্বন্ধে একটি কথাও নাই। তবে 'কড়ি ও কোমল' শব্দ দুইটা আছে অন্য প্রসঙ্গে। সেই প্রসঙ্গটার ধর্মের জন্যই তিনি অধ্যায়টারও নাম দিয়াছিলেন 'কড়ি ও কোমল'।

এই ধর্ম কি তাঁহার নিজের কথা উদ্ধৃত করিয়াই বুঝাইব। তিনি লিখিলেন, 'শরৎকালে "কড়ি ও কোমলে" — কেবলমাত্র আকাশে মেঘের রঙ্গ নহে, সেখানে মাটিতে ফসল দেখা দিতেছে।' প্রকৃতির দিক হইতে উহা অসম্ভব ব্যাপার। শরৎকাল ঠিক ফসল কাটিবার ঋতু না হইলেও ফসল পাকিবার বটে। তবে রবীন্দ্রনাথ শরতে ফসলের অঙ্কুর দেখা দিবার কথা কেন বলিলেন?

ইহার কারণ এই, তিনি নিজের পরিণত যৌবনকালকে শরৎকাল বলিয়া মনে করিতেন। ইহাও মনে করিতেন যে, তিনি এই যৌবন-শরতে পৌঁছিয়াছেন জীবননদীর স্রোতে স্বাভাবিক ভাবে না চলিয়া উজান বাহিয়া — অর্থাৎ মৃত্যু হইতে জন্মে, শোক হইতে আনন্দে, আবদ্ধতা হইতে উন্মুক্ততায় বিপরীতভাবে আসিয়া। তাঁহার জীবনের ধারা যে এইভাবে চলিয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং ঋতুগুলির মধ্যে তাঁহার যৌবন শরৎকাল হইয়া গিয়াছিল, তাই যৌবনের ধর্মেই উহাতে দেরী করিয়া অকালে ফসল ফলিতে আরম্ভ করিল।

আবার তাঁহার যৌবনের সুরও হইয়াছিল কড়িতে এবং কোমলে, শুধু কড়িতে নয়, শুধু কোমলেও নয়। ইহা সাধারণ মানুষের কথা ধরিলে বিসম্বাদী বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার ক্ষেত্রে নয়। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, সুতরাং নিজের জীবনের একটা পর্বে সুর কড়িতে যেমন বাজিয়াছিল কোমলেও তেমনি বাজিয়াছিল, এরূপ কথা বিশেষ চিন্তা না করিয়া লেখেন নাই।

কিন্তু ইহা মনে করিলে সত্য ধারণা হইবে না যে, তাঁহার তখনকার জীবনে দুই ধারার মধ্যে একটা ধারাই শুধু কড়িতে বা শুধু কোমলে বাজিয়াছিল। আসলে দুইটি ধারা পরস্পরবিরোধী হইলেও প্রত্যেকটির মধ্যেই যেমন কড়িতে সুর ছিল তেমনই কোমলেও সুর ছিল; অর্থাৎ মৃত্যু, শোক এবং আবদ্ধতার ধারাতে যেমন কড়ি ও কোমল দুইই ছিল, তেমনই জন্ম, আনন্দ এবং উন্মুক্ততার ধারাতেও কড়ি এবং কোমল ছিল। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে' — 'কড়ি ও কোমল' বইটির এই প্রথম কবিতাটি মৃত্যুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা — ইহার সুর কড়িতে; কিন্তু 'কবে পড়িবে বেলা, ফুরাবে সব খেলা, নিবাবে সব জ্বালা শীতল জল' মৃত্যুকামনার কথা — ইহার সুর কোমলে। আবার, 'কেন এলি রে, ভালোবাসিলি, ভালোবাসা পেলিনে, সংসারেতে উঁকি মেরে চলে গেলি নে' — প্রেম হইতে বঞ্চিত হইবার বিলাপ; ইহা কড়ির পর্দায়; কিন্তু 'আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন, তোমাতে করিব বাস, দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ মাস' — ইহাও প্রেম হইতে বঞ্চিত হইবার গান, তবে কোমলের পর্দায়।

ইহার পর কাব্য হইতে জীবনের দিকে চাহিয়া দেখি, এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মানসিক অস্তিত্বের একটা সন্ধিস্থলে, একটা দোটানার মধ্যে ছিলেন, এক জীবনকে পিছনে ফেলিয়া নূতন জীবনের দিকে চলিয়াছিলেন — ইহাদের একটা অতীতে আবদ্ধ; অপরটা ভবিষ্যৎমুখীন। মৃত্যু, শোক এবং আবদ্ধতা তাঁহার পিছনের বন্ধন; জন্ম, আনন্দ ও উন্মুক্ততা তাঁহার সম্মুখের লক্ষ্য। ইহাদের সবগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে জন্ম ও আনন্দের দিকে যাইবার কথা এই প্রবন্ধে বেশী করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই, কারণ স্বভাবের নিয়মেই উহা ঘটিবার কথা। তাই 'জীবনস্মৃতি'র শেষ অধ্যায়ে তাহার দোটানার এই ধারার আলোচনা নাই; তিনি আলোচনা করিয়াছেন শুধু অতীতের আবদ্ধতা হইতে ভবিষ্যতের উন্মুক্ততায় পৌঁছিবার আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে — যে আকাঙ্ক্ষা তাঁহার নিজের উদ্যম ভিন্ন প্রকৃতির নিয়মেই পূর্ণ হইবার নয়। কিন্তু তিনি ইহাও বিশ্বাস করিলেন যে, এই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার শক্তি তাঁহার নিজের নাই, আছে তাঁহার জীবনের নিয়ন্তার হাতে, সেজন্য লিখিলেন, 'সমস্ত বাধা, বিরোধ ও বক্রতার ভিতর দিয়া আনন্দময় নৈপুণ্যের সহিত আমার জীবনদেবতা যে একটি অন্তরতম অভিপ্রায়কে বিকাশের দিকে লইয়া চলিয়াছেন তাহাকে উদঘাটিত করিয়া দেখাইবার শক্তি আমার নাই। ... অতএব খাসমহালের দরজার কাছে পর্যন্ত আসিয়া এইখানেই আমার জীবনস্মৃতির পাঠকদের কাছ হইতে আমি বিদায়গ্রহণ করিলাম।' তবে বিদায় লইবার আগে এই অধ্যায়েই তিনি তাঁহার

সেই অন্তরতম অভিপ্রায়ের পরিচয়ও দিলেন। ইহার আলোচনা আবশ্যক।

তিনি বলিলেন, জীবনের মাঝখানে ঝাঁপাইয়া পড়িবার পথে বাধা দেখিয়া তিনি পীড়া বোধ করিতেছিলেন; যেখানে জীবনের উৎসব হইতেছে সেইখানকার প্রবল সুখদুঃখের নিমন্ত্রণ পাইবার জন্য তাঁহার একলা ঘরের প্রাণটা কাঁদিত।

এই মানসিক পীড়া আসিত তাঁহার দেশবাসীর জীবনে অবসাদ দেখিয়া, যাহার ফলে তিনি মনে করিতেন মানুষের জীবন আপনার পূর্ণ পরিচয় হইতে আপনি বঞ্চিত থাকে। তিনি লিখিলেন —

'সেই অবসাদের জড়িমা হইতে বাহির হইয়া যাইবার জন্য আমি চিরদিন বেদনা বোধ করিয়াছি। তখন যে সমস্ত আত্মশক্তিহীন রাজনৈতিক সভা ও খবরের কাগজের আন্দোলন প্রচলিত হইয়াছিল, দেশের পরিচয়হীন ও সেবাবিমুখ যে দেশানুরাগের মৃদু মাদকতা তখন শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল — আমার মন কোনোমতেই তাহাতে সায় দিত না। আপনার সম্বন্ধে, আপনার চারিদিকের সম্বন্ধে বড় একটা অধৈর্য্য ও অসন্তোষ আমাকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিত।'

তাঁহার মনে প্রশ্ন জাগিত —

'যে সব সমাজে ঐশ্বর্য্যশালী স্বাধীন জীবনের উৎসব, সেখানে সানাই বাজিয়া উঠিয়াছে, সেখানে কলরবের অন্ত নাই; আমরা বাহির প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া লুব্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি মাত্র, সাজ করিয়া আসিয়া যোগ দিতে পারিলাম কই?'

কিন্তু যে-জীবন হইতে তিনি মুক্ত হইতে চাহিতেছিলেন তাহার সম্বন্ধেও তিনি কড়িতে যেমন লিখিলেন, কোমলেও তেমনই লিখিলেন। কড়ির সুরটা এইরূপ —

'আমি আমার সেই ভৃত্যের আঁকা খড়ির গণ্ডীর মধ্যে বসিয়া মনে মনে উদার পৃথিবীর উন্মুক্ত খেলাঘরটিকে যেমন করিয়া কামনা করিয়াছি, যৌবনের দিনেও আমার নিভৃত হৃদয় তেমনই বেদনার সঙ্গেই মানুষের বিরাট হৃদয়-লোকের দিকে হাত বাড়াইয়াছে। সে যে দুর্লভ, সে যে দুর্গম, সে যে দূরবর্তী।'

কিন্তু গণ্ডীতে আবদ্ধ জীবন সম্বন্ধেও কোমলে লিখিলেন —

'চারিদিকে পাড়ি আছে এবং ঘাট আছে, কালো জলের উপর প্রাচীন বনস্পতির শীতল কালো ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে; স্নিগ্ধ পল্লব-রাশির মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কোকিল পুরাতন পঞ্চম স্বরে ডাকিতেছে।'

তবে ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কেন? রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, —

'কিন্তু এ তো বাঁধা পুকুর, এখানে স্রোত কোথায়, ঢেউ কই, সমুদ্র হইতে কোটালের বান ডাকিয়া আসে কবে?'

এই অস্থিরতার জন্য তাঁহার চিত্ত সমুৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে। কিসের জন্য হয় তাহা তিনি স্পষ্ট ভাষাতেই লিখিলেন, বলিলেন, যাহা দুর্লভ, দুর্গম ও দূরবর্তী —

'তাহার সঙ্গে প্রাণের যোগ না যদি বাঁধিতে পারি, সেখান হইতে হাওয়া যদি না আসে, স্রোত যদি না বহে, পথিকের অব্যাহত আনাগোনা না চলে, তবে যাহা জীর্ণ পুরাতন তাহাই

নূতনের পথ জুড়িয়া পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে মৃত্যুর ভগ্নাবশেষ কেহ সরাইয়া লয় না, তাহা কেবলই জীবনের উপর চাপিয়া পড়িয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।'

এই যে কথাগুলি রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবন সম্বন্ধে গভীরভাবে 'জীবনস্মৃতি'তে লিখিলেন সেগুলিই সমগ্র হিন্দুসমাজের জন্য লঘুভাবে কিন্তু তীক্ষ্ণস্বরে সেই বৎসরেই প্রকাশিত নাটক 'অচলায়তনে' পুনরাবৃত্তি করিলেন, কারণ তিনি দেখিয়াছিলেন হিন্দুসমাজে 'সমস্তই বিচ্ছিন্ন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃত্রিম সীমায় আবদ্ধ।' এই কথা অবশ্য তখনকার হিন্দুদের ভাল লাগে নাই। আমরা তখন 'সাহিত্য' পত্রিকার গ্রাহক ছিলাম। আমার স্পষ্ট মনে পড়ে উহার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ মেটারলিঙ্ক হইতে পারেন, কিন্তু হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজকে আক্রমণ করিবার অধিকার তাঁহার নাই।'এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, রবীন্দ্রনাথের প্রাণে যে আকাঙ্ক্ষা প্রবলতম ছিল — 'মানুষের বৃহৎ জীবনকে বিচিত্রভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি করিবার ব্যথিত আকাঙ্ক্ষা' — উহাই তাঁহার সহিত অধিকাংশ স্বদেশবাসীর জীবনব্যাপী বিরোধের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং উহার উদ্ভব হইয়াছিল 'কড়ি ও কোমল' লিখিবার যুগে। তাহা কবিতার ভাষায় সেই বইটিতেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তিনি 'পুরাতন' ও 'নূতন' দুইটি কবিতায় তাহা দেখাইলেন, লিখিলেন —

'হেথা হতে যাও পুরাতন
হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে।
আবার বাজিছে বাঁশি, আবার উঠিছে হাসি,
বসন্তের বাতাস বয়েছে।'

'নূতন' কবিতাটিতে লিখিলেন কি করিয়া পুরাতন হইতে নূতনের উদ্ভব হইল, কিন্তু নূতন হইতে পুরাতনে যাইবার স্বাভাবিক নিয়ম তাঁহার জীবনে খাটে নাই। তাঁহার উক্তি এই —

'হেথাও তো পশে সূর্য্যকর!
ঘোর ঝটিকার রাতে দারুণ অশনিপাতে
বিদীরিল যে গিরিশিখর,
বিশাল পর্ব্বত কেটে পাষাণহৃদয় ফেটে
প্রকাশিল যে ঘোর গহ্বর,
প্রভাত পুলকে ভাসি বহিয়া নবীন হাসি
হেথাও তো পশে সূর্য্যকর।'

ইহাতেও, অর্থাৎ যে পুরাতনকে তিনি ত্যাগ করিতে চলিলেন সেই পুরাতনের বিবরণেও কড়ি ও কোমলের মিশ্রণ দেখা গেল। তাই তিনি 'নূতন' কবিতাটিতে লিখিলেন, —

'এই যে রে মরুস্থল দাবদগ্ধ ধরাতল,
এখানেই ছিল পুরাতন —

একদিন ছিল তার শ্যামল যৌবনভার,
ছিল তার দক্ষিণ পবন।
যদি রে সে চলে গেল, সঙ্গে যদি নিয়ে গেল
গীত গান হাসি ফুল ফল,
শুষ্ক স্মৃতি কেন মিছে রেখে তবে গেল পিছে —
শুষ্ক শাখা, শুষ্ক ফুলদল!
সে কি চায় শুষ্কবনে গাহিবে বিহঙ্গগণে
আগে তারা গাহিত যেমন,
আগেকার মত করে স্নেহে তার নাম ধরে
উচ্ছ্বসিবে বসন্তপবন।

এই প্রশ্নের উত্তর তিনি বিনা দ্বিধায় দিলেন —

'নহে নহে, সে কি হয়! সংসার জীবনময়,
নাহি সেথা মরণের স্থান।
আয় রে নূতন, আয়, সঙ্গে করে নিয়ে আয়
তোর সুখ তোর হাসি গান।'

'কড়ি ও কোমল' বইটিতে এবং 'জীবনস্মৃতি'তেও তাঁহার সে সময়ের মনের অবস্থা যাহা লিখিলেন তাহা যে তাঁহার নিজের জীবনের ঘটনার সহিত যুক্ত তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। এই কাব্যগ্রন্থটি তাঁহার মানসিক জীবনের ইতিহাস লিখিবার উপকরণে পরিপূর্ণ। এইরূপ মনে করিবার কারণ 'জীবনস্মৃতি'র এই অধ্যায়ে প্রথম দিয়াছিলেন, যাহাতে তিনি স্বীকার করিলেন — 'জীবনের মাঝখানে ঝাঁপ দিয়া পড়িবার পক্ষে আমার সামাজিক অবস্থার বিশেষত্ববশত বাধা ছিল।' কিন্তু ইহাও তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, এই বাধা না থাকিলেও তিনি পুরাতন হইতে নূতনের দিকে ফিরিতেন। তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে — তাঁহার কাছে পুরাতনই বা কি ছিল, নূতনই বা কি ছিল, যে দ্বন্দ্বের মধ্যে তিনি ছিলেন তাহার রূপ মূলতঃ কি, কোথা হইতে তাহার উদ্ভব হইল?

ইহার উত্তর তাঁহার কাছ হইতে স্পষ্ট পাওয়া যায় না, কিন্তু 'কড়ি ও কোমলে'র কবিতা সম্বন্ধে তাঁহার আত্মীয় ও বন্ধু আশুতোষ চৌধুরীর অভিমত হইতে অনুমান করা যায়। আশুতোষ কবিতাগুলি প্রকাশের আগে দেখিয়াছিলেন ও যথোচিত পর্যায়ে সাজাইয়াছিলেন। তিনি ফরাসী কাব্যসাহিত্যের খুবই অনুরাগী ছিলেন, তাঁহার মনে হইয়াছিল রচনাগুলির সহিত ফরাসী কোনো কোনো কবির ভাবের মিল আছে। এইসব ফরাসী কবি বা একজন কবি কে? আমার মনে হয় না যে, এই সময়ে আশুতোষ চৌধুরী তখনকার দিনের অতি-আধুনিক ফরাসী কবিদের — যেমন Parnasse Contemporain (1865-76) দলের রচনার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, তিনি সম্ভবতঃ উহাদের আগের যুগের রোমান্টিক কবিদের

মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাবের সাদৃশ্য পাইয়াছিলেন। আমি খুঁজিয়া-পাতিয়া দেখিলাম তাঁহার 'পুরাতন' ও 'নূতন' কবিতা দুইটির ভাবের সহিত Alfred de Vigny-র একটি বিখ্যাত কবিতার সাদৃশ্য স্পষ্টই আছে। এই কবিতাটি Vigny ১৮৬২ সনে প্রকাশিত করেন, উহার নাম — Les Destinees, উহার কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি, —

'Triste Divinites du monde Oriental,
Femmes au voile blanc, immuables statues,
Elles nous eerasaient de leur poids colossal.

(তাৎপর্য দিতেছি — প্রাচ্য জগতের এই সব দুঃখের দেবতা, শ্বেতাবগুণ্ঠনধারিণী নারী, তাহাদের অচলমূর্তি ও পাষাণভার দিয়া আমাদিগকে চূর্ণবিচূর্ণ করিতেছে।)

কিন্তু, —

'Un soir il arriva que L'antique planete
secoua sa poussieres'
IL se fit un grand cri:
'Le Sauveur est venu, voici le jeune
athlete'

(তাৎপর্য — কিন্তু এক সন্ধ্যায় একটা ঘটনা ঘটিল, পুরাতন পৃথিবী তাহার ধূলা ঝাড়িয়া ফেলিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলঃ "ত্রাণকর্তা আসিয়াছেন, তিনি এক যুবা মল্ল।") তাঁহার জন্য সব অশ্রুময় নারী ও সব অবমানিত পুরুষ নূতন জীবন লাভ করিল। এই সংগ্রাম যে প্রাচ্য অদৃষ্টবাদ ও পাশ্চাত্ত্য স্বাধীনচিন্তার মধ্যে তাহা Vigny স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন — এই নরনারীরা ভিক্ষা চাহিল —

'Oue l' ombre des Destins, Seigneus, n'oppose plus,
A nos belles ardeurs une immuable entrave.
A nos efforts sans fin des coups inattendus!

(তাৎপর্য — প্রভু! অদৃষ্টের ছায়া যেন আমাদের মহান উৎসাহের বিরুদ্ধে তাহার কঠিন শৃঙ্খল না ধরে, আমাদের অশ্রান্ত প্রয়াসের উপর অপ্রত্যাশিত আঘাত না করে।)

ইহা যে 'কড়ি ও কোমলে'র যুগে রবীন্দ্রনাথেরও ব্যাকুল প্রার্থনা তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি অদৃষ্টবাদের সৃষ্ট প্রাচ্য গতানুগতিক জীবন হইতে বাহির হইয়া পাশ্চাত্ত্য স্বাধীন মনের রাজ্যে যাইতে চাহিলেন। ইহাতেই যে তিনি পুরাতন জীবন হইতে নূতন জীবনেও প্রবেশ করিলেন তাহা বলিতে পারি।

কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের জীবনে এইরূপ পরিবর্তন কেবলমাত্র চিন্তার শক্তিতে ঘটা সম্ভব নয়, ইহার পিছনে প্রবল আবেগের আঘাত থাকা আবশ্যক। এই আবেগও শুধু আপনা হইতেই সৃষ্ট হয় না, উহা উৎসারিত

হয় সেই ব্যক্তির জীবনে বিশেষ কোনো ঘটনা বা অভিজ্ঞতা হইতে। আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই সময়ে যে একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল উহা এই ধরনের। উহার তারিখ এবং 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইবার তারিখ একই — ১৮৮৬ সন। এই সনে তাঁহার প্রথম সন্তান, কন্যা বেলার জন্ম হইল। তখন তাঁহার নিজের বয়স পঁচিশ ও তাঁহার পত্নীর বয়স পনেরো। কেবলমাত্র সন্তান জন্মের জন্যই যে এত মূলগত একটা মানসিক আবর্তন ঘটিতে পারে তাহা আমি বলিব না, ইহার জন্য জন্মের সঙ্গে প্রেমেরও যোগ থাকা প্রয়োজন। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনে দুই-এরই সমন্বয় ঘটিয়াছিল।

আমার এই বিশ্বাস আমি আগে যা বলিয়াছি তাহার বিরোধী বলিয়া মনে হইতে পারে। আমি বলিয়াছি, বিবাহিত জীবনে সন্তানের জন্ম ভালবাসা ছাড়া ও আবেগের স্পর্শবিহীন জৈববৃত্তিতে হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের নিজের কনিষ্ঠা কন্যা মীরার বেলাতেই তাহা হইয়াছিল। ইহার কথা পরে বলিব। তবে সাধারণ লোকের বেলাতেই এই নিয়ম বলবৎ হইলেও রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটা সম্ভব ছিল না। তিনি সে-প্রকৃতির মানুষ ছিলেন না: তাঁহার বেলাতে ভালবাসাবিহীন দাম্পত্যজীবনে সন্তানের জন্ম হইতে পারিত না। রবীন্দ্রনাথের মনে ইহার আগেই বালিকা-পত্নীর প্রতি প্রেম জন্মিয়াছিল।

ইহার প্রমাণ হিসাবে আমি ১৮৮৫ সনে রচিত তাঁহার একটি গান উদ্ধৃত করিব। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলাও প্রয়োজন মনে করি — আমি মোটেই বিশ্বাস করি না যে, কোনো লেখকের সমস্ত রচনাই তাহার জীবনের ঘটনা বা অভিজ্ঞতার সহিত যুক্ত হইয়া থাকে। তবে যে-কোনো লেখকের রচনা হইতে অনুভব করা যায় কোন্ রচনা সাহিত্যিক কল্পনাপ্রসূত, কোনটি জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট। একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। শার্লট ব্রন্টির 'জেন এয়ার' সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত ইহা অনুভব করা যায়। কিন্তু তাঁহার উপন্যাস 'ভীলেট' পড়িলে মনে হইতে বাধ্য যে, লুসি স্নো ও পল-ইমানুয়েলের প্রেম কোনো সত্য অভিজ্ঞতার ফল। প্রথম হইতেই এ বিষয়ে জল্পনা-কল্পনা হইতেছিল, কিন্তু প্রমাণ আসিল ১৯১২ সনে। তখন কয়েকটি পত্র হইতে জানা গেল যে, শার্লট ব্রন্টি ব্রাসেলসে পড়িবার সময়ে তাঁহার শিক্ষক অধ্যাপক এজেরকে ভালবাসিয়াছিলেন। ইহাই 'ভীলেটের' প্রেমের কাহিনীর অবলম্বন। আমি ১৯১২ সনেই 'প্রবাসী'তে পত্রগুলির কথা পড়িয়াছিলাম, এমন কি অধ্যাপক এজেরের ছবিও দেখিয়াছিলাম।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও আমার অনুভূতি হইয়াছে যে, গানটি তাঁহার বালিকা-পত্নীর উদ্দেশেই রচিত হইয়াছিল। গানটি উদ্ধৃত করিতেছি —

"হৃদয়ের মণি আদরিনী মোর, আয় লো কাছে আয়।
মিশাবি জোছনা হাসি রাশি রাশি মৃদু মধু জোছনায়
মলয় কপোল চুমে ঢলিয়া পড়িছে ঘুমে,
কপোলে নয়নে জোছনা মরিয়া যায়।
যমুনা লহরীগুলি চরণে কাঁদিতে চায়।"

'তুই' বলিয়া সম্বোধন এবং গানটির সুর যে খাম্বাজ ও রীতি যে কাওয়ালী, তাহা হইতে অনুমান করা সঙ্গত যে গানটি কোনো বালিকার উদ্দেশে লিখিত, পূর্ণ যুবতীর উদ্দেশে নয়। ইহার প্রসঙ্গে যদি কেহ বলেন যে, ঘরে চৌদ্দ-বৎসর বয়স্কা কিশোরী পত্নী থাকিতে রবীন্দ্রনাথ এই গানটি একটি কল্পিতা বালিকার উদ্দেশে লিখিয়াছিলেন তাহা হইলে আমি তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না।

ইহা সত্ত্বেও দুইটি প্রশ্ন উঠিতে পারে। প্রথমটি এই, চৌদ্দ বৎসরের বালিকা কি বিশিষ্ট অর্থে যাহাকে নরনারীর প্রেম বলা যায় তাহা জাগাইতে পারে? আমাদের দেশে যে উহা সম্ভব, এমন কি স্বাভাবিক, তাহা যে কেহ আমাদের সমাজের খবর রাখেন তিনিই বলিবেন, এমন কি রাডিয়ার্ড কিপলিং-ও জানিতেন। একটি গল্পে তিনি দেখাইলেন যে, তেরো বৎসরের একটি মুসলমান বালিকা বাড়ী হইতে পলাইয়া গিয়া প্রণয়ীর কাছে বনে বসিয়া আছে, তাহার আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া। মেয়েটির পিতা ও পিতার প্রভু মিঃ গিস্বর্ন উহা পিছন হইতে দেখিলেন। দৃশ্যটা সম্বন্ধে কিপলিং লিখিলেন — 'the wonder of the sight' ও মেয়েটির সম্বন্ধে লিখিলেন,

'This was not at all the girl that Gisborne had seen with a half-eye slinking about the compound veiled and silent, but another — a woman full blown in a night as the orchid puts out in an hour's moist heat.'

ইহা রবীন্দ্রনাথের বালিকাপত্নী সম্বন্ধেও সত্য হইতে পারে। গানটি ছাড়া 'কড়ি ও কোমলে'র একটি কবিতাও আমার অনুমানের সমর্থক। শুধু ইহার প্রথম অংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি —

'কোমল দুখানি বাহু শরমে লতায়ে
বিকশিত স্তন দুটি আগুলিয়া রয়,
তারি মাঝখানে কি রে রয়েছে লুকায়ে
অতিশয়-সযতন-গোপন হৃদয়!
সেই নিরালায় সেই কোমল আসনে
দুইখানি স্নেহস্ফুট স্তনের ছায়ায়
কিশোর প্রেমের মৃদু প্রদোষকিরণে
আনত আঁখির তলে রাখিবে আমায়।'

বাকীটুকুও পড়িতে বলিব। এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ কিশোরী পত্নী ভিন্ন অন্য কাহাকেও স্মরণ করিয়া বা কোনও কল্পিতা কিশোরীকে উদ্দেশ করিয়া

লিখিতে পারিতেন না। ইহাতে প্রেম যে দেহাবলম্বী এই সত্যটা যেমন স্বীকার করা হইয়াছে, তেমনই এই দেহাবলম্বনকেও অসামান্যতা দেওয়া হইয়াছে।

ইহার পর আর একটা আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যাহা আপাতদৃষ্টিতে গুরুতর বলিয়া মনে হইবে। তাহা এই — রবীন্দ্রনাথ যদি ইতিপূর্বে কোনো যুবতীকে ভালবাসিয়া থাকেন (যাহা অনুমেয়), তাহা হইলে কি অল্পদিনের মধ্যেই একটি বালিকার প্রতি তাঁহার সেই ধরনেরই অনুরাগ হওয়া সম্ভব? এই আপত্তির উত্তর আমি রবীন্দ্রনাথের নিজের কথাতেই দিব — যদিও উহা বেনামী কৈফিয়ৎ।

'নৌকাডুবি' উপন্যাসে রমেশ সহপাঠিনীস্থানীয়া যুবতী হেমনলিনীর সহিত প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছিল। হেমনলিনীরা ব্রাহ্ম বলিয়া রমেশের পিতা শঙ্কিত হইয়া তাহাকে নিজের গ্রামে লইয়া গিয়া একটি গ্রাম্য বালিকার সঙ্গে বিবাহ দিলেন। রমেশ পত্নী লইয়া গৃহে ফিরিল, অবশ্য এই বধূ তাহার আসল স্ত্রী নয়। দুইটি নৌকাডুবির জন্য সে আর একজনের নববিবাহিতা বধূকে নিজের বধূ বলিয়া লইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সে তাহা না জানিয়া তাহার সহিত স্বামীর মতই ব্যবহার করিতেছিল। এই আচরণের কথা রবীন্দ্রনাথ এইভাবে লিখিলেন, —

> 'কাজকর্মের অবকাশে রমেশ প্রণয়চর্চ্চায় অমনোযোগী ছিল না। ইহার (বালিকাবধূর) সহিত কেমন করিয়া যে প্রণয় হইতে পারে, এই বি. এ. পাস করা ছেলেটি তাহার কোনো পুঁথির মধ্যে সে-উপদেশ প্রাপ্ত হয় নাই। সে চিরকাল ইহা অসম্ভব এবং অসঙ্গত বলিয়াই জানিত। তবু কোনো বই-পড়া অভিজ্ঞতার সঙ্গে কিছুমাত্র না মিলিলেও, আশ্চর্য এই যে, তাহার উচ্চশিক্ষিত মন ভিতরে-ভিতরে একটি অপরূপ রসে পরিপূর্ণ হইয়া এই ছোট মেয়েটির দিকে অবনত হইয়া পড়িয়াছিল। সে এই বালিকার মধ্যে কল্পনার দ্বারা তাহার ভবিষ্যৎ গৃহলক্ষ্মীকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। এই উপায়ে তাহার স্ত্রী একই কালে বালিকা বধূ, তরুণী প্রেয়সী এবং সন্তানদিগের অপ্রগল্‌ভা মাতারূপে তাহার ধ্যাননেত্রের সম্মুখে বিচিত্রভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।'

ইহাকে রবীন্দ্রনাথের আত্মকথা বলিয়া মনে করিতে কি বাধা হইতে পারে? আমি তো কিছুই খুঁজিয়া পাই না। রমেশের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন যে, সে বালিকা পত্নীকে 'উপলক্ষমাত্র করিযা ভাবী প্রেয়সীকে, কল্যাণীকে পূর্ণ মহীয়সী মূর্তিতে হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিল।' রবীন্দ্রনাথও নিশ্চয়ই তাহাই করিলেন — ফলে তাঁহার জীবনে প্রেমের ও সুখের পুনর্জন্ম হইল।

কিন্তু পুরাতন তখনও তাঁহাকে সব দিকে মুক্তি দেয় নাই। তাই তিনি পুরাতনকে উদ্দেশ করিয়া লিখিলেন —

> 'কি জানি কত কি আশে চলিয়াছে চারি পাশে
> কত লোক কত সুখে দুখে,

সবাই তো ভুলে আছে, কেহ হাসে কেহ নাচে —
তুমি কেন দাঁড়াও সমুখে।
বাতাস যেতেছে বহি, তুমি কেন রহি রহি
তারি মাঝে ফেল দীর্ঘশ্বাস।'

সেই দীর্ঘশ্বাসই ১৮৮৮ সনে প্রকাশিত 'মায়ার খেলা' গীতনাট্যে অপরূপ সঙ্গীতে রূপান্তরিত হইল। প্রেমের সম্বন্ধে এই গীতমালার শেষ কথা এই —

'এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না।
শুধু সুখ চলে যায়
এমনি মায়ার ছলনা।'

তবু এই ছলনার মধ্যেও সত্য লুপ্ত হয় নাই, কিন্তু উহা একেবারে শান্ত উচ্ছলতাবিহীন মূর্তিতে রহিল — যে সত্যকে স্বীকার করিয়া প্রণয়িনীও অনুতপ্ত প্রণয়ীকে বলিতে বাধ্য হইল, —

'দেখো, সখা, ভুল করে ভালবেসো না।
আমি ভালোবাসি বলে কাছে এসো না।'

রবীন্দ্রনাথের পত্নীর প্রতি প্রেম এই ভুল-ভাঙা ভালবাসা নয়, উহা সুখ হইতে বিদায় লইয়া স্বস্তির আশ্রয় লওয়া নহে, উহা উচ্ছলিত সুখেরই পুনরাবির্ভাব। তবে ইহার পূর্ণ বিকাশ ১৮৯০ সনে বিলাত হইতে দ্বিতীয়বার ফিরিবার পর দেখা দিল, এখনই নয়।

সপ্তম অধ্যায়

বাঙালী রবীন্দ্রনাথ

আঠারো শ’ নব্বুই সনে বিলাতে দ্বিতীয়বার প্রবাস রবীন্দ্রনাথের মোটেই ভাল লাগে নাই। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরিয়া আসিলেন। তখন তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাকে লিখিয়াছিলেন যে, বিলাতে আর এক দণ্ড থাকিতেও তাঁহার ভাল লাগিতেছে না; মেজদা (সত্যেন্দ্রনাথ) কেন যে এই পোড়া দেশে থাকিতে ভালবাসেন তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না। ইহার একটা কারণ অবশ্য এটা যে, এইবারে তিনি দেশে তিনটি সন্তান (একটি সদ্যোজাত) ও পত্নীকে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা ছাড়াও অধৈর্যের কারণ তাঁহার ছিল। তিনি বাংলাদেশ ও বাঙালী জীবনের আকর্ষণ প্রবলভাবে অনুভব করিতেছিলেন; ইহার বশে তিনি ১৮৯০ সনের ৩রা অক্টোবর ইন্দিরাকে লিখিলেন—

‘এদেশে এসে আমাদের সেই হতভাগ্য বেচারা ভারতভূমিকে মা বলে মনে হয়। এদেশের মত তার এত ক্ষমতা নেই, এত ঐশ্বর্য নেই, কিন্তু আমাদের ভালোবাসে। আমার আজন্মকালের যা কিছু ভালোবাসা, যা কিছু সুখ, সমস্তই তার কোলের উপর আছে। এখানকার আকর্ষণ চাকচিক্য আমাকে কখনোই ভোলাতে পারবে না—আমি তার কাছে যেতে পারলে বাঁচি। সমস্ত সভ্যসমাজের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থেকে আমি যদি তারই এক কোণে বসে মৌমাছির মতো আপনার মৌচাকটি ভরে ভালোবাসা সঞ্চয় করতে পারি তাহলেই আর কিছু চাইনে।’

ইহার পর—দেশে ফিরিতেছেন, ২রা নভেম্বর রাত্রিতে জাহাজ বোম্বাই পৌঁছিবার কথা, লিখিলেন,‘আর ডায়ারী বন্ধ করা যাক্। দুই মাস এগারো দিন কেটে গেল মনে হচ্ছে যেন কত যুগ।’ বোম্বাই-এ পৌঁছিবার পর লিখিলেন—

‘রাত দুপুরের সময় বম্বে পৌঁছন গেল। স্পেশল ধরতে পারলুম না। তাই ভারতবর্ষে পৌঁছেও মন ভারী বিগড়ে আছে—হঠাৎ গিয়ে পড়ব বলে কত কি কল্পনা করেছিলুম, একদিনের জন্যে সমস্ত ফস্কে গেল। বাড়ি যতই কাছে আসছে মন ততই যেন অস্থির হয়ে উঠছে। Gravitation-এর নিয়মানুসারে ভার পৃথিবীর যতই নিকটবর্তী হয় তার বেগ ততই বাড়ে, মনেরও সেই নিয়ম দেখছি। কাল সমস্ত রাত ঘুমোইনি।’

বয়স তখন ত্রিশ পূর্ণ হইতে ছয় মাস বাকী। বাড়ী ফিরিবার জন্য এই ব্যাকুলতা শুধু প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্যেই নয়, বাংলার বক্ষে আশ্রয় লইয়া জীবনের আকাঙ্ক্ষিত সুখ এবং শান্তি পাইবার জন্যও হইয়াছিল। ইহার পরই তিনি জমিদারী দেখিবার জন্য নদীয়া ও পাবনা অঞ্চলে চলিয়া যান, পরিবারসহ। সেই অঞ্চলে পরবর্তী দশ বৎসরে তিনি পূর্ণ বাঙালী-রূপ পাইলেন ও প্রকাশ করিলেন।

এই সময়ে বাংলার প্রাকৃতিক সত্তা তাঁহার দেহমনকে অধিকার করিয়া রহিল। সেই রূপের বর্ণনা দিব— প্রথমে জলের কথা বলিয়া। ইহাও তাঁহার লেখা হইতেই দিব। তিনি এই সময়ে বেশীর ভাগ বজরাতে পরিবারের সকলকে লইয়া থাকিতেন। তিনি ১৮৯৩ সনে গোরাই নদীর উপরে থাকিয়া কি লিখিয়াছিলেন উদ্ধৃত করি,—

'আমি প্রায় রোজই মনে করি, এই তারাময় আকাশের নিচে আবার কি কখনো জন্ম গ্রহণ করব। যদি করি আর কি কখনো এমন প্রশান্ত সন্ধ্যাবেলায় এই নিস্তব্ধ গোরাই নদীটির উপর বাংলাদেশের এই সুন্দর একটি কোণে এমন নিশ্চিন্ত মুগ্ধ মনে পড়ে থাকতে পারব? হয়তো আর কোনো জন্মে এমন একটি সন্ধ্যেবেলা আর কখনো ফিরে পাব না। তখন কোথায় দৃশ্য পরিবর্তন হবে, আর কি রকম মন নিয়েই বা জন্মাব? এমন সন্ধ্যা হয়তো অনেক পেতেও পারি, কিন্তু সে সন্ধ্যা এমন নিস্তব্ধভাবে তার সমস্ত কেশপাশ ছড়িয়ে দিয়ে আমার বুকের উপর এত সুগভীর ভালোবাসার সঙ্গে পড়ে থাকবে না। আশ্চর্য এই আমার সব চেয়ে ভয় হয় পাছে আমি য়ুরোপে গিয়ে জন্মগ্রহণ করি।'

তিনি বজরাতে বড় ছোট সব রকম নদীতেই চলাফেরা করিতেন। পদ্মার উপর দিয়া যাইবার সময়ে যে-দৃশ্য দেখা যাইত তাহার অভিঘাত আমি একদিন অনুভব করিলাম পদ্মার উপরেই একটি বজরাকে পাল তুলিয়া যাইতে দেখিয়া। ১৯১৫ সনের বর্ষাকালে 'গুর্খা' জাহাজে নারায়ণগঞ্জ হইতে গোয়ালন্দ যাইতেছিলাম। জাহাজ মাঝ নদী দিয়া চলিতেছিল, বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, সন্ধ্যা আসন্ন, ভাগ্যকুলের কাছে—হঠাৎ দেখিলাম একটি সাদা-সবুজ-লাল বজরা পাল তুলিয়া তীরবেগে স্রোত বাহিয়া ভাটির দিকে চলিয়াছে—কেন জানি না তখনই কানে 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' এই গানটি বাজিয়া উঠিল।

রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' গল্পেও পদ্মার উপর দিয়া নৌকাতে যাইবার বর্ণনা আছে — এইরূপ, 'বাহিরে বর্ষার নদী পরিপূর্ণতার শেষ রেখা পর্যন্ত ভরিয়া উঠিয়া আপন আত্মহারা উদ্দাম চাঞ্চল্যে প্রকৃতিমাতাকে যেন উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। মেঘনির্মুক্ত রৌদ্রে নদীতীরের অর্দ্ধনিমগ্ন কাশতৃণশ্রেণী, এবং তাহার ঊর্ধ্বে সরস সঘন ইক্ষুক্ষেত্র এবং তাহার পরপ্রান্তে দূরদিগন্ত চুম্বিত নীলাঞ্জনবর্ণ বনরেখা সমস্তই যেন কোনো এক রূপকথার সোনার কাঠির স্পর্শে সদ্যজাগ্রত নবীন সৌন্দর্যের মত নির্বাক নীলাকাশের মুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, সমস্তই যেন সজীব, স্পন্দিত, প্রগল্‌ভ, আলোক-উদ্ভাসিত, নবীনতায় সুচিক্কন, প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ।'

আমি বাংলার সবগুলি বড় নদীর উপর দিয়া নৌকায় অথবা জাহাজে যাইতে যাইতে এই দৃশ্য দেখিয়াছি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নদীর গানও শুনিয়াছি।

ইহাতে অনেকেই আশ্চর্য বোধ করিবেন, কিন্তু নৌকা ও নদী মিলিয়া সত্যই একটা অপরূপ সুরের সৃষ্টি করে। আমি নয় বৎসর বয়সে নৌকায় করিয়া মেঘনার উপর দিয়া যাইতেছিলাম। নৌকা শেষ রাত্রে ছাড়িয়াছিল, হঠাৎ জাগিয়া শুনিলাম নৌকার নীচে একটা সুর বাজিতেছে। উহা কি রকম তাহা বুঝাইবার জন্য 'হে ক্ষণিকের অতিথি' এই গানটার এই জায়গাটা স্মরণ করিতে বলিব, 'ওগো অকরুণ কি মায়া জানো, মিলনছলে বিরহ আনো।' বাহিরে আসিয়া দেখিলাম নৌকা ঘোড়াউত্রা ও মেঘনার বিস্তীর্ণ সঙ্গমের মাঝখানে। মাঝি দুইজন দাঁড় বাহিতে বাহিতে আমাকে হাসিমুখে দেখিতে লাগিল।

কিন্তু সব বড় নদীর রূপই শীতকালে একবারে বদলাইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ পদ্মার কথাই লিখিয়াছেন—

'ভয়ঙ্করী পদ্মা তখন হেমন্তের বিবরলীন ভুজঙ্গিনীর মত কৃশ নির্জ্জীবভাবে সুদীর্ঘ শীতনিদ্রায় নিবিষ্ট ছিল। উত্তর পারে জনশূন্য দিগন্তপ্রসারিত বালির চর ধূ ধূ করিতেছে— এবং দক্ষিণের উচ্চপাড়ের উপর গ্রামের আম্রবাগানগুলি এই রাক্ষসীনদীর নিতান্ত মুখের কাছে জোড়হস্তে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে— পদ্মা ঘুমের ঘোরে এক একবার পাশ ফিরিতেছে এবং বিদীর্ণ পটভূমি ঝুপঝাপ করিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে।'

এই সময়ে পদ্মার বিস্তীর্ণ চরে একদিন রবীন্দ্রনাথের পত্নী ও অন্যেরা হারাইয়া গিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ চাকর-মাঝি লইয়া খুঁজিতে বাহির হইলেন। তখন রাত্রি, দৃশ্যটা এইরূপ।—

'উপরে উঠে চারদিক চেয়ে কালো মাথার কোনো চিহ্ন দেখতে পেলুম না—সমস্ত ফ্যাকাশে ধূ ধূ করছে। গফুর আলো নিয়ে বেরোল, প্রসন্ন বেরোল, বোটের মাঝিগুলো বেরোলো, সবাই ভাগ করে ভিন্ন ভিন্ন দিকে চল্লুম— আমি একদিকে 'বলু' (বলেন্দ্রনাথ) করে চীৎকার করছি—প্রসন্ন এক ডাক দিচ্ছে 'ছোটমা'—মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে মাঝিরা 'বাবু' 'বাবু' করে ফুকরে উঠ্‌ছে।'

চারিদিকের দৃশ্য ও ধ্বনি যে কি।

'সেই মরুভূমির মধ্যে নিস্তব্ধ রাত্রে অনেকগুলো আর্তস্বর উঠতে লাগল। কল্পনা করতে গেলে নিঃশব্দ রাত্রি, ক্ষীণ চন্দ্রালোক, নির্জন নিস্তব্ধ শূন্য চর, দূরে গফুরের চলনশীল একটি লণ্ঠনের আলো, মাঝে মাঝে এক এক দিক থেকে কাতরকণ্ঠের আহ্বান এবং চতুর্দিকে তার উদাস প্রতিধ্বনি।'

ছোট নদীর রূপ কিন্তু একেবারে অন্য রকমের। উহা যেন দুই পারের গ্রামগুলির সখী। রবীন্দ্রনাথ পাবনা জেলায় এই ধরনের নদীর উপরে অনেক চলাফেরা করিয়াছিলেন এবং গ্রামের ঘাটে বজরা বাঁধিয়া গ্রাম্য জীবন দেখিয়াছিলেন। এই সব নদীর উপরেও আমি অনেক বার নৌকায় যাতায়াত করিয়াছি। দৃশ্য যাহা দেখিতাম তাহার আভাস দেই। এইগুলি সাধারণত বেশী প্রশস্ত হইত না, উহাদের জল বা স্রোত কখনই এত বেশী

হইত না যে মাঠ বা জঙ্গলের ভিতর দিয়া সোজা পথ কাটিতে পারে। তাই এইগুলি বনবাদাড়ের ভিতর দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাঁকের পর বাঁকে চলিত। আবার কখনও বা খোলা জায়গায় পড়িয়া বিলের মাঝখান দিয়া চলিত। চারিদিকে শালুক ফুল ফুটিয়া থাকিত। আমি নৌকা হইতে হাত বাড়াইয়া কত শালুক ফুল নাল সুদ্ধ তুলিয়াছি। গ্রামের ভিতর দিয়া গেলে ঘাটে মেয়েদের স্নান, জল তোলা, বাসন মাজা দেখা যাইত এবং শোনা যাইত অবিশ্রান্ত গল্প। রবীন্দ্রনাথ এইসব দৃশ্যের বহু বর্ণনা দিয়াছেন।

বাংলার রূপ—স্থলে

এই রূপের পরিচয় দিব রবীন্দ্রনাথের দুইটি বর্ণনা হইতে। প্রথমটি—

'অগ্রহায়ণের শেষাশেষি আমরা হাসিমপুরে গেলাম। নূতন দেশ, ...বাল্যকালের সেই গন্ধে এবং অনুভবে আমাকে সর্বাঙ্গে বেষ্টন করিয়া ধরিল। সেই শিশিরে ভেজা নূতন চষা ক্ষেত হইতে প্রভাতের হাওয়া, সেই সোনা-অড়'র এবং সরিষা ক্ষেতের আকাশ ভরা কোমল সুমিষ্ট গন্ধ, সেই রাখালের গান, এমন কি ভাঙা রাস্তা দিয়া গোরুর গাড়ি চলার শব্দ পর্যন্ত আমাকে পুলকিত করিয়া তুলিল। মনে মনে দেখিতে পাইলাম দিদিমা তাঁহার বিরল কেশগুচ্ছ মুক্ত করিয়া রৌদ্রে পিঠ দিয়া প্রাঙ্গণে বড়ি দিতেছেন, কিন্তু তাঁহার মৃদুকম্পিত প্রাচীন দুর্বলকণ্ঠে আমাদের গ্রামের সাধু ভজন দাসের দেহতত্ত্ব গান গুঞ্জন সুরে শুনিতে পাইলাম না। সেই নবান্নের উৎসব শীতের শিশিরস্নাত আকাশের মধ্যে সজীব হইয়া জাগিয়া উঠিল।'

সন্ধ্যাকালে সেই জগৎ তাহার সমস্ত করুণা লইয়া দেখা দিত—

'পৃথিবীতে এখন কি গোধূলি আসিয়াছে? আহা, সেই গোধূলির স্বর্ণ' যে-স্বর্ণ কেবল ক্ষণকালের জন্য চোখ জুড়াইয়া অন্ধকারের প্রান্তে কাঁদিয়া বিদায় লইয়া যায়। তাহার পর কুটিরের প্রাঙ্গণতলে সন্ধ্যাতারা একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। গোষ্ঠে প্রদীপ জ্বালাইয়া বধূ ঘরের কোণে সন্ধ্যাদীপ স্থাপন করে। মন্দিরে আবতির ঘন্টা বাজে।'

'যদি রবিবার হয়, তবে এতক্ষণে হাটের লোক যে যার আপন আপন বাড়ী ফিরিতেছে। সঙ্গচ্যুত সাথীকে উর্ধ্বস্বরে ডাক পাড়িতেছে। পল্লীর শুষ্ক বংশপত্র-খচিত অঙ্গনপার্শ্ব দিয়া চাষীলোক হাতে দুটো একটা মাছ ঝুলাইয়া মাথায় একটা চুপড়ি লইয়া অন্ধকাবে আকাশ ভরা তারার ক্ষীণালোকে গ্রামে-গ্রামান্তরে চলিয়াছে।'

যাহারা এই দৃশ্য চোখে দেখে নাই, এই সব ধ্বনি কানে শোনে নাই, এই সব সুগন্ধ ঘ্রাণ করে নাই, তাহারা হয়ত বলিবে এই সব বর্ণনা কাব্য করা। আমি সবই দেখিয়াছি, শুনিয়াছি, ঘ্রাণও করিয়াছি।—সেই জন্য এই সব দৃশ্য-ধ্বনি-গন্ধ আমার কাছে কলিকাতার দৃশ্য, ধ্বনি ও গন্ধের মতই বাস্তব। তাহার উপর ১৯১০ সনে আমি আমার পিতৃপুরুষের গ্রাম বনগ্রামে সন্ধ্যার পর পশ্চিম আকাশে বাঁশঝাড়ের ভিতর দিয়া কয়েক সপ্তাহের জন্য বিশাল হ্যালীর ধূমকেতুকে জ্বলজ্বল করিতে দেখিয়াছিলাম। তখন বাংলার গ্রামের সহিত যেন নক্ষত্র ও নীহারিকার যোগ হইয়া গিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ ও পত্নী মৃণালিনী

রবীন্দ্রনাথ

সঙ্গে জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা ও জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ

মনের বাঙালীত্ব

আমি যে-বাংলার পরিচয় সংক্ষেপে দিলাম রবীন্দ্রনাথ এই বাংলায় দশ বৎসর মত কাল কাটাইয়াছিলেন। এই আবেষ্টনীতেই তাঁহার মনের পূর্ণ পরিণতি হইয়াছিল, তাঁহার সাহিত্যিক বৃত্তির বিশিষ্টতা দেখা দিয়াছিল, তাঁহার জীবন সুখের হইয়াছিল ও কাব্যে এবং গল্পে যেগুলি তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা তাহার অনেকগুলিই লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। এগুলির মধ্যে বিশেষ করিয়া গল্পগুচ্ছের গল্প ও 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'চৈতালি' ও 'ক্ষণিকা' কবিতা সংগ্রহগুলির উল্লেখ করিতে পারি।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই পর্বের বিস্তারিত বিবরণ যাঁহারা পাইতে চান, তাঁহাদিগকে তাঁহার 'ছিন্নপত্রাবলী' পড়িতে বলিব। এটি অবশ্য তাঁহার চিঠিপত্রের সংগ্রহ, কিন্তু তাঁহার উচ্চতম সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য। এই চিঠিগুলিতে তিনি তাঁহার মানসিক ভাবের, তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের, সেই অঞ্চলে মানুষের জীবনযাত্রার এবং সেই অঞ্চলের প্রাকৃতিক রূপের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা 'জীবনস্মৃতি'র মত আত্মজীবনী বলিয়া মনে করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের নিভাঁজ বাঙালীত্বের প্রমাণ আমি প্রধানত এই পত্র সংগ্রহ হইতেই দিতেছি।

তিনি ১৮৯২ সনের জুন মাসে (৩২শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯) লিখিলেন,—

'এমনি আমি স্বভাবত অসভ্য—মানুষের ঘনিষ্ঠতা আমার পক্ষে নিতান্ত দুঃসহ। অনেকখানি ফাঁকা চতুর্দিকে না পেলে আমি আমার মনটিকে সম্পূর্ণ unpack করে বেশ হাত পা ছড়িয়ে গুছিয়ে নিতে পারিনে। আশীর্বাদ করি মনুষ্য জাতির কল্যাণ হোক, কিন্তু আমাকে তাঁরা ঠেসে না ধরুন...বোধ হয় আমাকে সম্পূণ বাদ দিলেও মনুষ্য-সাধারণ ভালো ভালো সদবন্ধু খুঁজে পেতে পারবেন। তাঁদের সান্ত্বনার অভাব হবে না।'

এইভাবে মনুষ্য সমাজ হইতে দূরে থাকিয়া তিনি কি করিতে চান তাহাও তিনি সরলভাবে ১৮৯৩ সনের ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখের একটি চিঠিতে লিখিলেন,—

'আমার মনটা ভিতরে ভিতরে এমনই অশ্রান্তভাবে কাজ করতে চায়, লোকজনের ভিড়ের মধ্যে তার কর্মোদ্যম এমনই পদে পদে প্রতিহত হতে থাকে যে, সে অস্থির হয়ে ওঠে—খাঁচার ভিতর থেকে আমাকে কেবলই যেন আঘাত করতে থাকে। একটু নিরালা পেলে সে বেশ সাধ মিটিয়ে ভাবতে পারে, চারদিকে চেয়ে দেখতে পারে, ভাবগুলিকে খুব মনের মতো ইনিয়ে-বিনিয়ে প্রকাশ করতে পারে।'

এই চিঠিখানাতেই তিনি নিজের লেখকবৃত্তি সম্বন্ধেও লিখিলেন,—

'সৃষ্টিকর্তা আপনার সৃষ্টির মধ্যে যেমন একাকী, সে (তাঁহার মন) আপনার ভাবরাজ্যের মধ্যখানে তেমনই একলা বিরাজ করতে চায়। নইলে তার সমস্ত ক্ষমতা, সমস্ত অস্তিত্ব ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।'

অসমঞ্জসতার জন্য সেই অঞ্চলে ইংরেজী কাব্য উপন্যাস পড়া তাঁহার পক্ষে পীড়াদায়ক হইয়া উঠিল। তিনি ১৮৯২ সনের প্রথম দিকে শিলাইদহ হইতে যাহা লিখিয়াছিলেন উদ্ধৃত করিতেছি,—

'ঠিক এখানকার উপযুক্ত কোনো কাব্য নভেল খুঁজে পাইনে। যেটা খুলে দেখি সেই ইংরেজী নাম, ইংরেজী সমাজ, লণ্ডনের রাস্তা এবং ড্রয়িংরুম এবং যত রকম হিজিবিজি হাঙ্গামা। বেশ সাদাসিধে সহজ সুন্দর উন্মুক্ত দরাজ এবং অশ্রুবিন্দুর মত উজ্জ্বল কোমল সুগোল করুণ কিছুই খুঁজে পাইনে।'

যাহা পান তাহার কথাও লিখিলেন।—

'কেবল প্যাঁচের উপর প্যাঁচ, অ্যানালিসিসের উপর অ্যানালিসিস—কেবল মানবচরিত্রকে মুচড়ে নিংড়ে কুঁচকে-মুচকে তাকে সজোরে পাক দিয়ে দিয়ে তার থেকে নতুন নতুন থিওরী এবং নীতিজ্ঞান বের করবার চেষ্টা। সেগুলো পড়তে গেলে আমার এখনকার এই গ্রীষ্মশীর্ণ ছোট নদীর শান্ত স্রোত, উদার বাতাসের প্রবাহ, আকাশের অখণ্ড প্রসারতা, দুই কূলের অবিরল শান্তি, এবং চারিদিকের নিস্তব্ধতাকে একেবারে ঘুলিয়ে দেবে।'

এই জন্য তিনি টলষ্টয়ের আনা কারেনিনার মত উপন্যাসও পড়িতে পারেন নাই। বলিয়াছিলেন, 'এরকম কূটকচালে অদ্ভুত গোলমেলে কাণ্ড আমার বেশীক্ষণ পোষায় না।'

এই অঞ্চলে কি পড়িতে ও কি লিখিতে তিনি চান তাহাও সরলভাবে লিখিলেন,

'এখানে পড়বার উপযোগী রচনা আমি প্রায় খুঁজে পাইনে, এক বৈষ্ণবকবিদের ছোট ছোট পদ ছাড়া। বাংলার যদি কতকগুলি ভাল ভাল মেয়েলী রূপকথা জানতুম এবং সরল ছন্দে সুন্দর করে ছেলেবেলাকার খর স্মৃতি দিয়ে সরস করে লিখতে পারতুম তা হলে ঠিক এখানকার উপযুক্ত হ'ত। বেশ ছোট নদীর কলরবের মত, ঘাটের মেয়েদের উচ্চহাসি, মিষ্ট কণ্ঠস্বর এবং ছোটখাটো কথাবার্তার মত, বেশ নারকেলপাতার ঝুরঝুর কাঁপুনি, আমবাগানের ঘন ছায়া, এবং প্রস্ফুটিত সর্ষেক্ষেতের গন্ধের মত— বেশ সাদাসিধে অথচ সুন্দর এবং শান্তিময়—অনেকখানি আকাশ আলো নিস্তব্ধতা এবং সকরুণতায় পরিপূর্ণ। মারামারি হানাহানি জোঝাজুঝি কান্নাকাটি সে সমস্ত এই ছায়াময় নদীস্নেহবেষ্টিত প্রচ্ছন্ন বাংলাদেশের নয়।'

রবীন্দ্রনাথের এই আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকে নাই। তিনি এই অঞ্চলে থাকিবার সময়ে বাঙালী জীবনের যে কাহিনী গল্পের ভিতর দিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাকে সেই জীবনের আত্মকথা বলা যাইতে পারে। এই সময়ে লেখা শুধু পাঁচটি গল্পের নাম করিব—'পোষ্টমাষ্টার', 'সমাপ্তি', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'অতিথি' ও 'দৃষ্টিদান'। একান্তভাবে বাঙালী না হইলে কেহ এইগুলি লিখিতে পারিত না।

জীবনযাত্রা

তাঁহার এই সময়কার জীবনযাত্রার বিশেষ লক্ষণ যেটা প্রকাশ পাইল তাহা অনাড়ম্বরতা। রবীন্দ্রনাথ জমিদার, জমিদারপুত্র ও জমিদারপৌত্র।

নিজেদের জমিদারীর পরিচালনাও তাঁহার কাজ ছিল। তবু তিনি সকলের সঙ্গে, নিজের কর্মচারী, গ্রাম্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাধারণ ভদ্রলোক— কাহারও সহিত সমান-সমানের মত আচরণ করিতে কখনও কুণ্ঠা অনুভব করিতেন না। ইহারা সকলেই তাঁহার সহিত আসিয়া যেভাবে সাক্ষাৎ করিত ও আলাপ করিত তাহা সে সময়ে বাঙালী জমিদার সম্প্রদায়ের সহিত সাধারণ বাঙালী সম্পর্কের মধ্যে দেখা যাইত না। সাধারণত জমিদারেরা আদালতে সাক্ষী দিতেও যাইত না, কমিশ্যনে দিত। একটা হাস্যকর দৃষ্টান্ত দিতেছি। ময়মনসিংহ জেলার একটি জমিদারের জবানবন্দী লইবার জন্য একজন শিক্ষিত আধুনিক পুলিশ-ইন্সপেক্টর আসিলেন, জমিদার দেরী করিয়া আসিলেন এবং ইন্সপেক্টরের প্রশ্নের উত্তর দিবার সময়ে জমিদারোচিত বাংলা ব্যবহার করিলেন, কোনো একটা বিষয়ে তাঁহার অজ্ঞতা জানাইবার জন্য বলিলেন, 'অস্মদের তাহা জানা নাই।'

আরও একটি দৃষ্টান্ত দিব। ময়মনসিংহের জমিদারেরা পুত্রদের স্কুলে পাঠাইতেন না, মর্যাদার হানি হইবে বলিয়া। কিন্তু একজন উদারনৈতিক জমিদার তাঁহার পুত্রকে পাঠাইয়াছিলেন, তবে মুহুরী সঙ্গে করিয়া, কারণ শিক্ষককে জমিদারপুত্র 'আপনি' বলিতে অভ্যস্ত নয়, অথচ 'তুমি'ও বলিতে পারে না, তাই মুহুরীর মারফতে প্রশ্ন করিত বা উত্তর দিত। এই সব আচরণ ১৮৮০ হইতে ১৯০০ সন পর্যন্ত বজায় ছিল। কিন্তু জমিদার হইলেও রবীন্দ্রনাথ এই ধারা অনুসরণ করেন নাই।

তাঁহার গৃহস্থালীর ব্যবস্থাতেও আড়ম্বর ছিল না, হয়ত বা জমিদারোচিত সৌষ্ঠব পর্যন্ত ছিল না। একদিন ইংরেজ জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার সহিত বজরায় দেখা করিতে আসিবেন তাহা জানাইবার পর বজরা গুছাইবার যে ব্যস্ততা পড়িয়া গিয়াছিল তাহার বর্ণনা তিনি একটি চিঠিতে দিয়াছিলেন।

আমি সবচেয়ে আশ্চর্য বোধ করিয়াছি এটার পরিচয় পাইয়া যে, তাঁহার পত্নী বা কন্যারা কেহই মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রঘরের মেয়েদের মত পোশাক পরিচ্ছদ পরা ভিন্ন কোনো বিলাসিতা দেখাইতেন না। বরঞ্চ ছবিতে তাঁহার অল্পবয়স্ক পুত্রকন্যার কাপড়চোপড় দেখিয়া তাহারা এইরূপ পোশাক কেন পরিত বুঝিতে পারি নাই। কৌতূহলী পাঠকদের আমি শুধু মীরা দেবীর 'আত্মকথা'র মলাটে তাঁহার শৈশব অবস্থার যে ছবিটি ছাপা হইয়াছে তাহা দেখিতে বলি। আজকালকার কথা দূরে থাকুক তখন বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের পুত্রকন্যারাও ফোটোগ্রাফ তোলাইবার সময়ে পোশাক সম্বন্ধে এইরূপ শৈথিল্য দেখাইত না।

তাঁহার পত্নী মৃণালিনী দেবী অতিথি আসিলে নিজে হাতে রাঁধিয়া খাওয়াইতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পত্নীকে দিয়া অতিথির জন্যে নূতন নূতন

রান্না করাইতেন। এই অতিথিদের মধ্যে যাঁহারা প্রায়ই আসিতেন তাঁহারা নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র বসু। তাঁহারা মৃণালিনী দেবীর রান্না খাইয়া খুবই খুশী হইতেন ও সকলের কাছে প্রশংসা করিতেন। মীরা দেবী তাঁহার মাতার একটি বর্ণনা দিয়াছেন। একবার তাঁহারা সকলেই শিলাইদহ হইতে শান্তিনিকেতনে গিয়াছিলেন, তখন মীরা দেবী দেখিলেন, 'সরু এক ফালি বারান্দায় একটা তোলা উনুন নিয়ে মা বসে রান্না করছেন, আর তাঁর পিসি রাজলক্ষ্মী দিদিমা তরকারী কুটতে কুটতে গল্প করছেন।'

তবে এই সাদাসিধা গৃহস্থালির মধ্যে মানসিক ব্যাপারের 'জমিদারি' মীরা দেবীই দেখিলেন, শান্তিনিকেতনের বাড়ির দোতালার গাড়ীবারান্দার ছাদে বসিয়া টেবিল-আলোতে মাতা পিসি রাজলক্ষ্মীকে মিসেস হেনরী উডের 'ঈস্টলীন' উপন্যাস বাংলা করিয়া শুনাইতেছেন।

আর একটি ব্যাপারেও রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমবঙ্গীয় জমিদার সম্প্রদায়ের ধারা অনুসরণ করিলেন না, তাঁহার পত্নী যে 'বাঙ্গাল' ছিলেন তাহা আমি জানিতাম না, কন্যা মীরার কাছে একটি ইংরেজী ভাষায় লেখা চিঠি হইতে তাহা জানিলাম। মীরা তাঁহার ইংরেজী জ্ঞান উন্নতিলাভ করিতেছে দেখাইবার জন্যে পিতার কাছে চৌদ্দ বছর বয়সে ইংরেজীতে চিঠি লিখিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত হইলেও কিছুদিন নিজেও ইংরেজীতে উত্তর দিতে লাগিলেন। তবু লিখিলেন,—

'All the same, I am not going to be altogether deprived of the sight of your Bengali handwriting and the quaint spellings which betray your East Bengal origin through mother's side.'

রবীন্দ্রনাথ কন্যার বাংলায় কি বাঙ্গালত্ব দেখিয়া আমোদ পাইতেন তাহার দৃষ্টান্ত দিই। আমরা বাঙ্গালেরা (আমি ময়মনসিংহের বাঙ্গাল) ও-কারকে উকার করিতাম, ও উকারকে ওকার— যেমন 'তুমার' ও 'তোমি'। ইহা ছাড়া ড় ও র-এর মধ্যে উচ্চারণের কোনো প্রভেদ করিতাম না। তবে লিখিবার সময়ে কোথায় ড় হইবে এবং কোথায় 'র' হইবে জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতাম 'ড'-এ শূন্য 'র', না ব-য়ে শূন্য 'র'। মীরা দেবীও এই ভুল করিতেন। তিনি পিতার কাছে অল্পবয়সে একটি চিঠিতে লিখিলেন, 'আমি আজ প্রথম বাড়ীর থেকে বেড়ুলুম', আবার এও লিখিলেন, ' আজকে খেতে খেতে আমি একবার গাল কামরিয়েছিলুম।' আবার পশ্চিমবঙ্গের ভাষায় 'রাত্তিরে' বলিতে হয় মনে পড়াতে 'রাত্রিতে' না লিখিয়া 'রাত্রীরে' লিখিলেন।

এ-সব অপ্রাসঙ্গিক কথা লিখিলাম রবীন্দ্রনাথের উদারতার পরিচয় দিবার জন্য। তাঁহার যৌবনকালে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীর পক্ষে পূর্ববঙ্গের

কন্যা বিবাহ করা প্রায় ইংরেজের দেশী মেয়ে বিবাহ করার মত ছিল। রবীন্দ্রনাথের সব বিষয়ে অনাড়ম্বরতা তাঁহার এই যুগের জীবনযাত্রার সহিত সঙ্গত ছিল।

রবীন্দ্রনাথ নিজে একটি গল্পে এই জীবনের ধর্মের অতি মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়াছেন। উহা উদ্ধৃত করিব। তিনি লিখিয়াছেন—

'সেদিনকার সেই সুখের জীবন কিছুই অসামান্য বা অত্যধিক নহে; দিনের পর দিন ক্ষুদ্র কাজে ক্ষুদ্র সুখে অজ্ঞাতসারে কাটিয়া যাইত এবং তাহার নিজের অধ্যয়ন কার্যের মধ্যে একটি বালিকা ছাত্রীর অধ্যাপন কার্য তুচ্ছ ঘটনার মধ্যেই গণ্য ছিল; কিন্তু গ্রাম-প্রান্তরের সেই নির্জন দিনযাপন, সেই ক্ষুদ্র শান্তি, সেই ক্ষুদ্র সুখ, সেই ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্র মুখখানি সমস্তই যেন স্বর্গের মত দেশকালের বহির্ভূত এক আয়ত্তের অতীতরূপে কেবল আকাঙ্ক্ষা রাজ্যের কল্পনা-ছায়ার মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল।'

প্রেমের পুনরাবির্ভাব

রবীন্দ্রনাথ নিজের বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। উহার বাহিরের তথ্যগুলি এইরূপ—উহা আরম্ভ হয় ১৮৮৩ সনের ডিসেম্বর মাসে, শেষ হয় ১৯০২ সনের ডিসেম্বর মাসে, উনিশ বৎসরের কথা। মৃত্যুর সময়ে তাঁহার পত্নীর বয়স মাত্র একত্রিশ হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের হইয়াছিল একচল্লিশ। এ-বয়সে বিপত্নীক হইলে সাধারণত সকলেই আবার বিবাহ করিয়া থাকে, তিনি করেন নাই। তাঁহাদের সন্তান হইয়াছিল পাঁচটি, বিবাহিত জীবনের আট বৎসরে। এই ধরনের দাম্পত্যজীবন অস্বাভাবিক নয়, আবার সাধারণত যাহা দেখা যায় তাহার মতও নয়। তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সন্তান, আগেই বলিয়াছি, হইয়াছিল পনেরটি; বিলাতে ভিক্টোরিয়ান যুগে যাহা দেখা যাইত তাহার অনুযায়ী। রবীন্দ্রনাথের বিবাহিত জীবনও পুরা ভিক্টোরিয়ান যুগে পড়ে, কিন্তু ঠিক ভিক্টোরিয়ান হয় নাই।

ভিক্টোরিয়ান যুগে সাধারণত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রগাঢ় ভালবাসার যথেষ্ট প্রমাণ আছে, রবীন্দ্রনাথও যে একটি উদাহরণ দেখিয়াছিলেন তাহার কথা আগে বলিয়াছি, ম্যাক্সমূলারের জীবনীতে আমি আরও একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের কথা লিখিয়াছি। বিবাহিত জীবনে প্রেমের কবি ছিলেন কভেন্ট্রী প্যাটমোর।

জিজ্ঞাস্য—রবীন্দ্রনাথের জীবনে কি সেই ধরনের প্রেম দেখা দিয়াছিল? রোমান্টিক যুগের ব্যর্থ প্রেম যে আসিয়াছিল তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ না থাকিলেও সহজেই অনুমান করা যায়— উহার কথা অনেক লিখিয়াছি। বিবাহিত জীবনের প্রেম সম্বন্ধে কি কিছু অনুমান করা যায়? এ ক্ষেত্রে অনুমানের অবলম্বন একমাত্র কবিতা বা গান।

রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনে দুই হাজারের উপরে গান লিখিয়াছিলেন, এগুলি শুধু তাঁহার জীবনের সহিত অসংশ্লিষ্ট সাহিত্য বা সঙ্গীত সৃষ্টি নয়। বিশেষ করিয়া বলিব যে, তাঁহার গানগুলিকে তারিখ অনুযায়ী সাজাইলে এগুলি হইতেই তাঁহার মানসিক জীবনী লেখা যায়। আমি দেখিয়াছি, মোটামুটি গানগুলিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়, সময়ানুক্রমিক। এই ভাগগুলি তাঁহার মনের অবস্থারও অনুযায়ী। যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে যেগুলি রচিত হইয়াছিল সেইগুলির অধিকাংশই তাহার বিবাহিত জীবনে প্রেমের সহিত জড়িত বলিয়া মনে হয়। শুধু একটি দৃষ্টান্ত দিয়াই আরম্ভ করিব। সেটি এই—

'তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম
নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমানিশীথিনী-সম ॥
মম জীবন যৌবন মম অখিল ভুবন
তুমি ভরিবে গৌরবে নিশীথিনী-সম ॥
জাগিবে একাকী তব করুণ আঁখি
তব অঞ্চলছায়া মোরে রহিবে ঢাকি ॥
মম দুঃখবেদন মম সকল স্বপন
তুমি ভরিবে সৌরভে নিশীথিনী-সম ॥

এই গানটি ১৩০২ সনের কার্তিক মাসে জোড়াসাঁকোতে রচিত হইয়াছিল। অর্থাৎ তাঁহার ৩৪ বৎসর বয়সে, ইংরেজী ১৮৯৫ সনে।

এই যুগেই তাঁহার কয়েকটি বিখ্যাত প্রেমের গানও রচিত হইয়াছিল, যেগুলিকে তাঁহার বিবাহিত জীবনের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। একটি 'মম যৌবননিকুঞ্জে গাহে পাখি, সখি জাগো জাগো'। 'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না'-কেও আমি তাঁহার বিবাহিত জীবনের সহিত যুক্ত করিব; উহা অভিসারের গান নিশ্চয়ই, তবু যে স্বামীর স্ত্রীর প্রতি সত্যকার ভালবাসা আছে, সে বিবাহিত জীবনের রাত্রিগুলিকে অভিসাররাত্রি বলিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করে না, বরঞ্চ বলিয়া আনন্দই পায়।

তবু এই সময়েও যে রবীন্দ্রনাথের জীবনে পুরাতন প্রেম তাহার দুঃখের মূর্তি লইয়া না আসিত তাহা নয়। 'কে দিল আবার আঘাত আমার দুয়ারে' গানটি (১৩০২ সনের ১২ই আশ্বিন বিজয়া দশমীর রাত্রিতে শিলাইদহে রচিত---ইংরেজী ১৮৯৫ সন, বগস ৩৪) উহার প্রমাণ। এই গানটি সম্বন্ধে শুধু ইহাই বলিব যে, গানটির ভাব দান্তের Nessun maggior dolore-র বিপরীত দিক। দুঃখের দিনে সুখের কথা স্মরণ করা হৃদয়বিদারক হইলেও, সুখের দিনে দুঃখের দিনকে স্মরণ সুখকে করুণতার মাধুর্য দেয়। এই গানটির কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করিব—

'কে দিল আবার আঘাত আমার দুয়ারে।
এ নিশীথকালে কে আসি দাঁড়ালে, খুঁজিতে আসিলে কাহারে ॥
বহুকাল হল বসন্তদিন এসেছিল এক অতিথি নবীন
আকুল জীবন করিল মগন অকুল পুলক পাথারে ॥'

এই সময়ে রচিত কয়েকটা কবিতাকেও রবীন্দ্রনাথের বিবাহিত জীবনের সহিত যুক্ত করা যায়, সর্বোপরি একটিকে—'চিত্রা'-তে প্রকাশিত ও ১৩০২ সনের ৩২শে ফাল্গুন তারিখে (ইং ১৮৯৬, ফেব্রুয়ারী-মার্চ) রচিত 'রাত্রে ও প্রভাতে'। ইহা তাঁহার বিবাহিত জীবনের চরম সুখ ও চরম গৌরবের সাক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিতেই হইবে। উহার শেষ কয়টি মাত্র কথা উদ্ধৃত করি—

'রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরী,
প্রাতে কখন দেবীর বেশে
তুমি সমুখে উদিলে হেসে
আমি সম্ভ্রমভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে দূরে অবনত শিরে
আজি নির্মলবায় শান্ত উষায় নির্জন নদীতীরে।'

ইহা কল্পিত প্রেমমাত্র, যে প্রেম জীবনে প্রতিষ্ঠিত সত্য তাহার কাব্যময় রূপ নয়, তাহা মনে করা অসম্ভব।

॥ প্রথম ভাগ সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয় ভাগ

মধ্যাহ্ন

ভূমিকা

বইটার এই ভাগে আমি রবীন্দ্রনাথের চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হওয়া হইতে (ইং ১৯০১ সন) ১৯১৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়া আসা পর্যন্ত জীবনের পরিচয় দিব। সাহিত্যিক হিসাবে এবং মানুষ হিসাবেও তিনি এই বয়সের মধ্যেই জীবনের মধ্যাহ্নে পৌছিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার লেখার কথা বিবেচনা করিলে, তা সে গদ্যেই হউক কিংবা পদ্যেই হউক, তিনি এই বয়সের মধ্যে মধ্যাহ্নগগনে উঠিলেও অস্তাচলের দিকে ঢলিয়া পড়েন নাই। এই ব্যাপারটার আলোচনা যথাস্থানে করিব। ভূমিকা প্রসঙ্গে শুধু এই কথাটা বলা প্রয়োজন যে, মানুষ হিসাবে, অর্থাৎ তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে, ১৯১৩ সন হইতেই অস্তের পূর্বাভাস দেখা দিয়াছিল। সাহিত্যিক নোবেল-পুরস্কার পাওয়া লৌকিক দিক হইতে যেমন তাঁহার লেখকবৃত্তির চরম প্রতিষ্ঠালাভ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, তেমনই তাঁহার নিজের জীবনের সুখ ও শান্তির কথা বিবেচনা করিলে তখনই তাঁহার আত্মঘাতী রূপ দেখা দিল ইহা স্বীকার করিতে হইবে ইহার আগে। বহু নিন্দা ও দেশের লোকের কাছে বহু অপযশ অর্জন করিলেও, ১৯১৩ সন পর্যন্ত তিনি নিজের আত্মসমাহিত রূপ অব্যাহত রাখিয়াছিলেন, কিন্তু এর পর আর পারিলেন না।

মানুষ হিসাবে এই সময়ের পরে তিনি যে সুখ পাইয়াছিলেন, তাহা সূর্যাস্তের শোভার মত। এক সময়ে তিনি নিজের জীবনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, —

> 'বেলা বহে যায়, পালে লাগে বায়,
> সোনার তরণী কোথা চলে যায়,
> পশ্চিমে হেরি নামিছে তপন অস্তাচলে॥
> এখন বারেক শুধাই তোমায় —
> স্নিগ্ধ মরণ আছে কি হোথায়,
> আছে কি শান্তি, আছে কি সুপ্তি তিমিরতলে?
> হাসিতেছ তুমি তুলিয়া নয়ন কথা না বলে।'

এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন ১৮৯৩ সনে; দশ বৎসর পরে — ১৯০৩ সনে, জীবন নয়ন তুলিয়াছিল, কথাও বলিয়াছিল, কিন্তু হাসিয়া নয়। অশ্রুধারার ভিতর দিয়া। তাঁহার মধ্যাহ্ন মেঘ ও রৌদ্রের খেলায় বিচিত্র ও করুণ হইয়াছিল। ভার্জিল লিখিয়াছিলেন,

'Sunt lacrirue rerum ..'

(ঐহিক অস্তিত্বের মধ্যে অশ্রুধারা আছে ...)

রবীন্দ্রনাথের জীবনে উহা পূর্ণরূপে দেখা গেল।

প্রথম অধ্যায়

সাহিত্যিক কৃতিত্ব ও প্রতিষ্ঠা

কবিরা জন্মায়, চেষ্টা করিয়া কবি হওয়া যায় না— ন মেধয়া, ন চ বহুনা শ্রুতেণ। তবে সত্যকার কবিকে চিনিবার পথে বাধা এই যে, মানুষমাত্রেরই অল্পবিস্তর কবিত্বপরায়ণতা থাকে; উহারাও পদ্য লেখে; তবে ইহারা কখনই কবি হইতে পারে না; পদ্য (Versification) ও কাব্যের (Poetry) মধ্যে যে মূলগত প্রভেদ আছে তাহা সহজে বোঝা যায় না; বাঙালীরা সাধারণত কাব্যের অপেক্ষা পদ্যই বেশী বোঝে ও উহাকেই বেশী সমাদর করে; ইহার জন্য কবি রবীন্দ্রনাথের সহিত বাঙালী জাতির মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। প্রচীন সংস্কৃত অর্থে কবি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। সত্যকার কবিত্ব ও কাব্যের মধ্যে একটা অপৌরুষেয়তা আছে। রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় কবি ছিলেন।

তবে রবীন্দ্রনাথ মানুষের স্বাভাবিক ধর্মের বশে অতি বাল্যকাল হইতেই পদ্য লিখিতে আরম্ভ করিলেও উহার প্ররোচনা আসিয়াছিল বেশ বয়োজ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় জ্যোতিপ্রকাশ হইতে। একদিন তিনি সাত-আট বৎসর বয়স্ক মামাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তোমাকে কবিতা লিখিতে হইবে।' ইহার পর চৌদ্দ অক্ষরে পয়ার কি করিয়া লিখিতে হয় তাহাও শিখাইয়া দিলেন। তখন তাঁহাকে আর কে ঠেকাইয়া রাখে?

তিনি তাঁহাদের জমিদারী সেরেস্তার এক গোমস্তার কাছ হইতে একটি নীল-রং-এর কাগজের খাতা যোগাড় করিয়া সেটি ভরতি করিতে আরম্ভ করিলেন। কবি হইবার এই প্রথম উদ্যম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে লিখিয়াছেন,—

> 'হরিণশিশু নূতন শিং বাহির হইবার সময় যেখানে সেখানে গুঁতা মারিয়া বেড়ায়, নূতন কাব্যোদ্‌গম লইয়া আমি সেই রকম উৎসাহে আরম্ভ করিলাম।

উহা দেখিয়া তাঁহার এক দাদা—হেমেন্দ্রনাথ কিংবা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—শ্রোতাসংগ্রহের উৎসাহে সকলকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। একদিন সে-যুগের বিখ্যাত ইংরেজী সংবাদপত্র 'ন্যাশন্যাল পেপারে'র সম্পাদক নবগোপাল মিত্র তাঁহাদের বাড়ীতে আসা মাত্র দাদা তাঁহাকে গ্রেফ্‌তার করিয়া বলিলেন, 'নবগোপালবাবু, রবি একটা কবিতা লিখিয়াছে, শুনুন না।'

কবিতাটিতে 'ভ্রমর' শব্দ ব্যবহার না করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'দ্বিরেফ' লিখিয়াছিলেন। তিনি মহোৎসাহে উহা আবৃত্তি করিবার পর নবগোপালবাবু

একটু হাসিয়া বলিলেন, বেশ হইয়াছে। কিন্তু এই 'দ্বিরেফ' শব্দটার মানে কী?

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে 'ভ্রমর' ও 'দ্বিরেফ' দুইটাই তিন অক্ষরের শব্দ, সুতরাং 'ভ্রমর' লিখিলে ছন্দের কোনো অনিষ্টই হইত না। তবু তিনি কিছুতেই শব্দটা বর্জন করেন নাই।

কিছুকাল পরে তিনি আরও উৎসাহ পাইলেন। তিনি তখন নর্ম্যাল স্কুলে পড়েন। স্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট গোবিন্দবাবু ঘনকৃষ্ণবর্ণ বেঁটেখাটো মোটাসোটা মানুষ ছিলেন, চাপকান পরিয়া নিজের আপিসঘরে বসিয়া কাজকর্ম করিতেন। তাঁহাকে সকলেই ভয় করিত। একদিন তাঁহার ঘরে রবীন্দ্রনাথের ডাক পড়িল। ভীতচিত্তে রবীন্দ্রনাথ গিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। কিন্তু তিনি শুধু বলিলেন, 'তুমি নাকি কবিতা লেখো?' ও রবীন্দ্রনাথ তাহা স্বীকার করাতে 'সুনীতি' সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিতে আদেশ করিলেন। পরদিন তাহা লিখিয়া স্কুলে যাইবার পর গোবিন্দবাবু ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের ছাত্রদের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া বলিলেন, 'পড়িয়া শোনাও'। তিনি উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিয়া গেলেন। কিন্তু ছাত্রেরা ইহাতে বিচলিত হইল না, পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিল যে, উহা কোন ছাপার বই হইতে চুরি করিয়া আনা। একজন বলিল, যে-বই হইতে চুরি তাহা সে আনিয়া দেখাইয়া দিবে।

এই সব কাহিনী হইতেই বোঝা যাইবে যে রবীন্দ্রনাথ বালককবি হিসাবে যে কোনো বালককবি অপেক্ষা অন্য শ্রেণীর ছিলেন না। এই ধরণের বালক কবিদের মধ্যে শতকরা একজনও বয়স্ক কবি সহজে দেখা যায় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে অন্য রকম হইল। তিনি সত্যই কবি হইলেন।

লেখক হিসাবে স্থান

চল্লিশ বৎসর বয়সেই কবি-হিসাবে তিনি যে-স্থানে পৌঁছিলেন, তাহা চল্লিশ বৎসর বয়সে ইংলন্ডের ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বায়রন, শেলী, কীট্‌স্, টেনিসন ও ব্রাউনিং, এবং ফ্রান্সের ভিক্টর হুগো সেই বয়সের মধ্যে যে-প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন তাহার তুলনায় নিম্নে নয়। আরও কথা আছে, বয়স বিবেচনা করিলে তিনি বায়রন, শেলী ও কীটসের সহিত তুলনীয় নন, কারণ ইঁহাদের সকলেরই মৃত্যু চল্লিশ বৎসরের আগেই হইয়াছিল; শুধু কাব্যের তুলনা করিলে, চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা উৎকর্ষে এই তিন কবির সমগ্র রচনার সমকক্ষ। তবে বয়সের দিকে তিনি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, টেনিসন, ব্রাউনিং ও হুগোর সহিত তুলনীয়—তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল আশী বৎসর পার হইয়া,

ওয়ার্ডস্ওয়ার্থেরও তাহাই, টেনিসনের হইয়াছিল ৮৩ বৎসর বয়সে, ব্রাউনিং-এর ৭৭ বৎসর বয়সে ও হুগোর ৮৩ বৎসর বয়সে।

ইঁহাদের মধ্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, টেনিসন ও ব্রাউনিং কেহই পরবর্তী জীবনে আগের রচনার তুলনায় উৎকৃষ্টতর কবিতা লেখেন নাই—ইঁহাদের কবিকীর্তি চল্লিশ বৎসরের আগে রচিত কাব্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ও হুগো শেষ জীবনে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা আগের জীবনে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার সমান তো বটেই, কোনো কোনো রচনায় উচ্চতর। এই প্রসঙ্গে শুধু রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র (১৯১৬ সনে ৫৫ বৎসর বয়সে প্রকাশিত) ও হুগোর La Legende des Sieoles-এর (১৮৫৯ সনে ৫৩ বৎসর বয়সে প্রথম প্রকাশিত) উল্লেখ করিব।

বিনয়ের ভান না-করিয়াই বলিব, ইহা আমার ব্যক্তিগত মত। আমি সাহিত্যের গবেষকও নই, অধ্যাপকও নই কিন্তু সাত বৎসর বয়স হইতে আজ পর্যন্ত প্রত্যহই কবিতা পড়িয়াছি—এবং সত্তর বৎসর ধরিয়া চারিটি ভাষাতে—বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজি ও ফরাসী ভাষায়। সুতরাং কাব্য সম্বন্ধে আমি যাহা বলিতে পারি, উহা ক্লাসে লেকচারের কথা নয়, প্রাণের কথা। ইহার বেশী অধিকারী আমি নই।

গদ্যের কথা ধরিলে চল্লিশ বৎসর বয়স হইবার আগে রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার পরিমাণ খুব বেশী না হইলেও উহাও উৎকর্ষে কবিতার সমকক্ষ। অবশ্য এই স্তরের গদ্য রচনার সবই ছোট গল্প—প্রধানত গল্পগুচ্ছের কাহিনীগুলি। তাঁহার সমস্ত গদ্য রচনার মধ্যে এগুলিকেই আমি মানবচরিত্র ও মানবীয় অনুভূতির বিবরণ হিসাবে সকলের উপরে স্থান দেই। শুধু যদি সাহিত্যিক 'টেকনিকে'র কথাই ধরা যায় তাহা হইলেও 'গল্পগুচ্ছে'র গল্পসমষ্টি মোপাসাঁ, চেখভ বা যে-কোন শ্রেষ্ঠ গল্পলেখকের সৃষ্টির সমকক্ষ। চল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যে দুইটি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, অর্থাৎ 'রাজর্ষি' ও 'বৌঠাকুরাণীর হাট', কোনটাই সর্বোচ্চস্তরের উপন্যাস নয়। তাঁহার প্রথম উপন্যাস, যাহাকে সত্যই উচ্চাঙ্গের কাহিনী বলা যায় সেটি 'চোখের বালি'— উহা প্রকাশিত হইয়াছিল ১৯০২ সনে; তাহার পর প্রকাশিত হয় 'নৌকাডুবি' ১৯০৫ সনে, 'গোরা' লেখা আরম্ভ হয় ১৯০৭ সনে, শেষ হইয়া প্রকাশিত হয়—১৯১০ সনে। পঞ্চাশ বৎসর হওয়া পর্যন্ত এই তিনটিই তাঁহার উপযুক্ত উপন্যাস : উৎকৃষ্ট গল্পও কয়েকটা লিখিয়াছিলেন।

কাব্যের দিক হইতে এই দশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার প্রধান রচনা 'শিশু', 'উৎসর্গ', 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি'—এগুলি অতি উচ্চাঙ্গের কাব্য, তবে এক 'নৈবেদ্য' (১৯০১সনে প্রকাশিত) ছাড়িয়া দিলে এগুলির ধর্ম রবীন্দ্রনাথের

আগেকার সমস্ত কাব্যের ধর্ম হইতে বিভিন্ন। এই পার্থক্য কেন ঘটিল তাহার কারণ পরে দিব। এখানে শুধু এইটুকু বলা প্রয়োজন যে, এগুলির দ্বারা তাঁহার কাব্যকীর্তি সবদিকেই অক্ষুণ্ণ রহিল।

কবিবৃত্তি

রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁহার কবিবৃত্তি সম্বন্ধে কি মনে করিতেন তাহার সন্ধান লইতে হইবে। ঘটনাক্রমে ১৯০৪ সনে তিনি তাঁহার কবিবৃত্তির একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন। তখন তিনি নিজের জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু সে-অনুরোধ পালন করিলেন নিজের বিবেচনা মত। বিবেচনাটা এইরূপ—

> 'আমার জীবনের বিস্তারিত বর্ণনায় কাহারও কোনো লাভ দেখি না। সেইজন্য এ স্থলে আমার জীবনবৃত্তান্ত হইতে বৃত্তান্তটা বাদ দিলাম। কেবল, কাব্যের মধ্য দিয়া আমার কাছে আমার জীবন যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট সংক্ষেপে লিখিবার চেষ্টা করিব।'

ইহার অর্থ এই যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্য ও তাঁহার জীবন 'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ' বলিয়া মনে করিতেন। আর একটা বিখ্যাত সংস্কৃত বুক্‌নী একটু বদলাইয়া বলিব, তিনি ঘোষণা করিতেন, 'তদহম্'। ইহা কাব্য ও জীবন সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদ।

কিন্তু তিনি এ বিষয়ে যাহা লিখিলেন তাহা সহজবোধ্য নয়। নিজেই ইহা উপলব্ধি করিয়া রচনাটির শেষের দিকে এইরূপ লিখিলেন—

> 'আমার কাব্য ও জীবন সম্বন্ধে মূল কথাটা কতক কবিতা উদ্ধৃত করিয়া কতক ব্যাখ্যা দ্বারা বোঝাইবার চেষ্ট করা গেল। বোঝানো-কাজটা সম্পূর্ণ আমার নিজের হাতে নাই—যিনি বুঝিবেন তাঁহার উপরেও অনেকটা নির্ভর করিবে। আশঙ্কা আছে, অনেক পাঠক বলিবেন, কাব্যও হেঁয়ালি রহিয়া গেল, জীবনটাও তথৈবচ।'

কিন্তু ইহা কবি বা পাঠক, কাহারো অক্ষমতার জন্য নয়, কাব্যের ধর্মের জন্য। কাব্য মূলত লোকোত্তর, বুদ্ধি বা যুক্তির আয়ত্ত নয়। ইহাও রবীন্দ্রনাথ ভাল করিয়াই জানিতেন, তাই পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর বলিয়াছিলেন,—

> 'কবি তো বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ঐতিহাসিক বা রাষ্ট্রনীতিবিৎ নহে। কবিত্ব মানুষের প্রথম বিকাশের লাবণ্যপ্রভাত। সম্মুখে জীবনের বিস্তার যখন আপনার সীমাকে এখনও খুঁজিয়া পায় নাই, আশা যখন পরমরহস্যময়ী — তখনই কবিত্বের গান নব নব সুরে জাগিয়া উঠে। অবশ্য, এই রহস্যের সৌন্দর্যটি যে কেবল প্রভাতেরই সামগ্রী তাহা নহে, আয়ু-অবসানের দিনান্তকালেও অনন্তজীবনের পরমরহস্যের জ্যোতির্ময় আভাস আপনার গভীরতর সৌন্দর্য প্রকাশ করে।'

কাব্যের সংজ্ঞা যে দেওয়া যায় না, কবিবৃত্তির যুক্তিসঙ্গত কৈফিয়ৎ যে দেওয়া যায় না, তাহা কবিমাত্রেই জানিত ও জানে। তাই ইংরেজ কবি পোপ নিজেকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

'Why did I write? What sin to me unknown? Dipt me in ink, my parents , or my own?

তবে উত্তরও দিয়াছিলেন কেন কবিতা লেখেন,

'To help me thro' this long disease, my life.'

অধ্যাপক ভিন্ন অন্য সমালোচকেরাও কাব্যের সংজ্ঞা দিবার চেষ্টা করেন নাই। একজন ডঃ জনসনকে প্রশ্ন করিল—'Sir, what is poetry?' জনসন উত্তর দিলেন,

'Why, Sir, it is much easier to say what it is not. We all *know* what light is; but it is not easy to tell what it is.'

এখন কাব্য ও জীবন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কি ধারণা তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। পুরাপুরি বুঝিয়াছি তাহা বলিব না, তবে অনুভূতির দ্বারা যতটুকু ধরিতে পারিয়াছি তাহারই আভাস দিব।

তিনি তাঁহার কবিতা লেখার যে-বিবরণ দিলেন, তাহা কোনো স্থপতি বা 'আর্কিটেক্ট'-এর অধীনে ও নির্দেশে একজন পাথর-খোদাই-মিস্ত্রীর কাজ করিবার মত। একটা পাথরের খণ্ড তাহাকে দেওয়া হয় ও উহাকে একটা ধরনে কাটিয়া উহার উপর কারুকার্য করিতে বলা হয়। সে এইভাবে একটার পর একটা পাথরের খণ্ডের উপর কাজ করিয়া যায়, কিন্তু বলিতে পারে না অন্য কিসের সঙ্গে যুক্ত হইয়া উহা একটা সম্পূর্ণ মন্দির বা 'ক্যাথিড্রালে' পরিণত হইবে। কারিগরের খণ্ড খণ্ড কাজ জুড়িয়া একটা সমাপ্ত ও অখণ্ড জিনিস গঠন করিবার দায় স্থপতি বা 'আর্কিটেক্টে'র। এই উপমার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের যে-উক্তি আমি উদ্ধৃত করিতেছি উহা বুঝিতে আমি পাঠককে বলিব। উক্তিটি এইরূপ—

'আমার সুদীর্ঘকালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি তখন স্পষ্ট দেখিতে পাই—এ একটা ব্যাপার যাহার উপর আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। যখন লিখিতেছিলাম তখন মনে করিয়াছি, আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি কথাটা সত্য নহে। কারণ, সেই খণ্ড কবিতাগুলিতে আমার সমস্ত কাব্যগ্রন্থের তাৎপর্য সম্পূর্ণ হয় নাই—সেই তাৎপর্যটি কী তাহাও আমি পূর্বে জানিতাম না। এইরূপে পরিণাম না জানিয়া আমি একটির সহিত একটি কবিতা যোজনা করিয়া আসিয়াছি—তাহাদের প্রত্যেকের যে ক্ষুদ্র অর্থ কল্পনা করিয়াছিলাম, তাহা সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, সে অর্থ অতিক্রম করিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল।'

এই ধারণার বশে তিনি একদিন লিখিয়াছিলেন,—

'এ কী কৌতুক নিত্যনূতন
ওগো কৌতুকময়ী।
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই।

অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হ'তে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কী বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সঙ্গীতস্রোতে কূল নাহি পাই—
কোথা ভেসে যাই দূরে।'

লেখকশ্রেণী অহংজ্ঞানে এমনই পরিপূর্ণ যে, তাহাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের এই সব কথা অবিশ্বাস্য মনে হইবে। কিন্তু কথাটা তিনি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলেন এইভাবে—

'যখন যেটা লিখিতেছিলাম তখন সেইটেকেই পরিণাম বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। এই জন্য সেইটুকু সমাধা করার কাজই অনেক যত্ন ও অনেক আনন্দ আকর্ষণ করিয়াছে। আমিই যে তাহা লিখিতেছি এবং একটা বিশেষ ভাব অবলম্বন করিয়া লিখিতেছি, এ সম্বন্ধেও সন্দেহ ঘটে নাই। কিন্তু আজ জানিয়াছি, সে-সকল লেখা উপলক্ষ মাত্র— তাহারা যে অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না। তাহাদের রচয়িতার মধ্যে আর একজন কে রচনাকারী আছেন, যাঁহার সম্মুখে সেই ভাবী তাৎপর্য প্রত্যক্ষ বর্তমান।'

ইহার পর, বিশ্বাস হউক আর না-ই হউক, রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য যে কি তাহার সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। কিন্তু জিজ্ঞাস্য—কবিকে যে-ই চালনা করুন না কেন, তিনি কি কেবল কবিকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার নিজের লেখনী চালাইতে চান, না তাঁহার অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে? রবীন্দ্রনাথ এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন—

'তাহা নহে। সেই সঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে, জীবনটা যে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সমস্ত সুখ-দুঃখ, তাহার সমস্ত যোগবিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে একজন একটি অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছেন। সকল সময়ে আমি তাঁহার আনুকূল্য করিতেছি কিনা জানি না, কিন্তু আমার সমস্ত বাধা-বিপত্তিকেও, আমার সমস্ত ভাঙাচোরাকেও তিনি নিয়তই গাঁথিয়া জুড়িয়া দাঁড় করাইতেছেন।'

তাহার পর লিখিলেন,

'এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি "জীবনদেবতা" নাম দিয়াছি। তিনি যে-কেবল আমার এই ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্যদান করিয়া বিশ্বের সহিত তাহার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতেছেন, তাহা আমি মনে করি না। আমি জানি, অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্তৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন।'

যাঁহার হাতে তিনি এইভাবে গড়িয়া উঠিতেছেন, তাঁহার উদ্দেশেই তিনি 'জীবনদেবতা' কবিতাটি লিখিয়াছিলেন। তাহাতে প্রশ্ন তুলিলেন—

'ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াস
আসি অন্তরে মম?'

আরও কথা বলিবার পর শেষে নিজে কি করিয়াছেন তাহা স্বীকার করিলেন—

'গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া—
মূরতি নিত্যনব।'

ইহার উপর ভাষ্য করিলেন, 'আশ্চর্য্য এই যে, আমি হইয়া উঠিতেছি, আমি প্রকাশ পাইতেছি।' ইহার সহজ অর্থ এই যে, তাঁহার কাব্যরচনা কাব্যরচনার জন্যই নয়, তাঁহার জীবন গঠন করিবার জন্য, অর্থাৎ যিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতার কারিগর তাঁহার প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের ফল মানুষ — রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলিলেন বটে যে, এই গঠনকার্যের কর্তা তাঁহার জীবনদেবতা, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই জীবনদেবতাও তিনিই। নিজেরই আর একটা রূপে তাঁহার সমস্ত কাব্যরচনা ও অন্য সমস্ত কর্মের দ্বারা নিজেকে নিজে গঠন করা। নিজের কবিবৃত্তি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্যই সাধারণ বুদ্ধিতে হেঁয়ালির মত। তবে ইহা লইয়া তাঁহার সঙ্গে ঝগড়া করা অর্থশূন্য। যাঁহারা ইহা করিতে চাহেন তাঁহাদের আমি বিখ্যাত রুশ লেখক বেলিনস্কির একটি উক্তি মনে রাখিতে বলিব —

'Do not worry about the incarnation of ideas. If you are a poet, your works will contain them without your knowledge—they will be moral and national if you follow your inspiration freely.'

রবীন্দ্রনাথও কবি ছিলেন, সুতরাং তিনি সাক্ষাৎভাবে তত্ত্ব দেন নাই, কিন্তু সেজন্য তিনি উপেক্ষণীয় নহেন 'থিওরিস্ট' হিসাবেও।

তবুও তাঁহার কাব্যসৃষ্টির পিছনে যে-শক্তি ছিল, যাহাকে তিনি 'জীবনদেবতা' বলিয়া বিশিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারই অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি। আমি 'প্রবৃত্তি' শব্দটা যে প্রয়োগ করিতেছি তাহা প্রচলিত অর্থে নিন্দাত্মক ইঙ্গিত করিবার জন্য নহে। আমার বক্তব্য তিনি অজ্ঞানে নিজেরই একটা অজেয় বাসনার দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিলেন। এই বাসনাটা কি তাহার পরিচয় বাংলা ভাষায় দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ বাসনাটাই বিদেশী, উহাকে বাংলা করিয়া যদি বলি তাহা হইলে বুঝিবার জন্য সেই বাংলার ইংরেজী অনুবাদও দিতে হইবে। সুতরাং নিজের ইংরেজীতেই বলি, উহা রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অল্পদিন পূর্বে আমার লিখিত একটি প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। আমি লিখিয়াছিলাম,—

'The great driving force of his life, which united all his diverse activities, was a quest for personal enrichment, for self-realization through manifold contact with life and the world.'

ইহা আসিয়াছিল ইউরোপীয় 'রোমান্টিক মুভমেন্ট' হইতে, উহার একটা প্রকাশ হইয়াছিল Quest of selfhood-এ, যাহাকে 'Cult of the Ego' বলা হইয়াছে। শাতোব্রিয়ঁ, হুগো. বায়রন, শেলী সকলের জীবনেই উহা দেখা দিয়াছিল। তবে আমি ইহাদের দৃষ্টান্ত না দিয়া, একজন বিখ্যাত রুশীয় লেখকের দৃষ্টান্ত দিব।

ইনি আলেকজান্ডার হের্তসেন। বিখ্যাত ফরাসী সোস্যালিস্ট লুই ব্লঁর সহিত একদিন তর্ক হইতেছিল।

লুই ব্লঁ—'মানবজীবন একটা মহান সামাজিক কর্তব্য। সমাজের জন্য মানুষকে নিয়ত আত্মবলিদান করিতে হইবে।'

হের্তসেন—'কেন?'

ব্লঁ—'কেন? এর অর্থ কি? মানুষের চরম লক্ষ্য এবং কৃত্য নিশ্চয় সামাজিক কল্যাণ।'

হের্তসেন—'কিন্তু মানুষ যদি কেবল আত্মবলিদান করে,—জীবনকে উপভোগ না করে তাহা হইলে সেই সামাজিক কল্যাণ কখনও সিদ্ধ করা যাইবে না।'

লুই ব্লঁ রাগিয়া বলিলেন, 'এসব ছেঁদো কথা মাত্র।'

কিন্তু হের্তসেনের কাছে উহা ছেঁদো কথা বলিয়া মনে হয় নাই — তিনি ইহাকে অকাট্য সত্য বলিয়াই মনে করিতেন। সেজন্যই তিনি ১৮৫০ সনের ১০ সেপ্টেম্বর তারিখে মাৎসিনিকে একটি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, —

'Since the age of thirteen I have served one idea, marched under one banner—was against imposed authority-- against every kind of deprivation of freedom, in the name of the absolute independence of the individual.'

এই কথাগুলি রবীন্দ্রনাথও লিখিতে পারিতেন।

সুতরাং তাঁহার কবিবৃত্তির উদ্দেশ্য কিছু 'করা' নয়, উদ্দেশ্য একটা কিছু 'হওয়া'। কিন্তু কবি না হইয়া অন্যভাবে অন্যকিছু হইলেও তিনি মনে করিতেন যে বাঁচিবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। তাই তিনি লিখিয়াছিলেন—

'হিংস্র ব্যাঘ্র অটবীর—
আপন প্রচণ্ড বলে প্রকাণ্ড শরীর
বহিতেছে অবহেলে, দেহ দীপ্তোজ্জ্বল
অরণ্যমেঘের তলে প্রচ্ছন্ন-অনল
বজ্রের মতন, রুদ্র মেঘমন্দ্রস্বরে
পড়ে আসি অতর্কিত শিকারের 'পরে
বিদ্যুতের বেগে; অনায়াস সে মহিমা,
হিংসাতীব্র সে আনন্দ, সে দৃপ্ত গরিমা,
ইচ্ছা করে, একবার লভি তার স্বাদ।

ইচ্ছা করে বারবার মিটাইতে সাধ
পান করি বিশ্বের সকল পাত্র হতে
আনন্দমদিরাধারা নব নব স্রোতে।’

আমারও ইহাই মনে হয় যে, বাঙালীর কাছে কাব্যের অর্ঘ্য না দিয়া, তিনি যদি ‘ম্যান-ঈটার’ হইয়া বাঙালীর রুধির পান করিতে পারিতেন, তাহা হইলেও সেটা তাঁহার কাছে আনন্দমদিরাধারা পানের মত হইত।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ভাষা, রচনারীতি ও ভাবের ঐতিহাসিক দিক

রবীন্দ্রনাথের কথা বলিতে গিয়া তাঁহার ভাষা সম্বন্ধ আলোচনা করিতে হইবে, কারণ তাঁহার ভাষা উনবিংশ শতাব্দীতে যে-বাংলা গদ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার পূর্ণবিকশিত রূপ। তবে উহা আর লেখা হয় না, বোধ্য রহিয়াছে কিনা সে-বিষয়েও আমার সন্দেহ আছে। মনে হইবে, ইহা আমার বিদঘুটে সৃষ্টিছাড়া অভিযোগ। তবু কেন বলিলাম, তাহার কারণ দেখাইতেছি। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'র এক জায়গায় লিখিয়াছেন —

'বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশীপ্রথার প্রচলন ছিল, কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল।'

তিনি আজিকার বাঙালী লেখক হইলে কিন্তু লিখিতেন —

'বার থেকে দেখ্‌লে আমাদের ধামীয় অস্তিত্বে পররাষ্ট্রিক বহতিকতার স্রোততা ছিল। কিন্তু আমাদের হার্দ্দিকতার মধ্যতায় তাতে একটা পিত্রিয়তাহমিকা নিজের দণ্ডায়মান বিকীর্ণতাতে বাজিত থাকতো।'

এই বাংলা বুঝিতে আজকালকার বাঙালীর কিছুমাত্র অসুবিধা হইবে না, সে পড়িতে পড়িতে বাংলা ভাষার এই চাক্ষুষ রূপকে বুদ্ধিগোচর ইংরেজী রূপে অনুবাদ করিয়া যাইবে, যাহা হইবে এইরূপ —

'seen from outside there was in our family life a currency of many foreign ways. but inside our hearts there remained awake a steady and radiant patriotism.'

আজকালকার বাংলার ইংরেজীতে এইরূপ অনুবাদ স্বাভাবিক। আমাদের ময়মনসিংহের একটি ক্ষুদ্র বালককে পড়িতে বলা হইয়াছিল 'বিড়াল' — সে এই চাক্ষুষ শব্দটিকে তখনই তাহার বোধ্য 'মেকুর' বলিয়া উচ্চারণ করিল। ইহাও বলা প্রয়োজন যে, আমি যে নব্য বাংলার দৃষ্টান্ত দিলাম, উহা ইংরেজীর ব্যুৎপত্তিগত বিশুদ্ধ অনুবাদ। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব — ইংরেজী Wake শব্দটি পুরাতন ইন্দো-ইউরোপীয় ধাতু Weg হইতে আসিয়াছে — উহা ল্যাটিনে vegere ধাতুতে ও সংস্কৃতে 'বাজ' (অন্তঃস্থ-ব) এই বিশেষ্যে পরিণত হইয়াছে। আমি তামাশা করিয়া বলিয়া থাকি, এখন বাঙালীর ইংরেজী জ্ঞান প্রকাশ পায় বাংলা লিখিবার সময়ে ও বাংলা জ্ঞান প্রকাশ পায় ইংরেজী লিখিবার সময়ে এবং সংস্কৃত জ্ঞান প্রকাশ পায় সংস্কৃতকে অসংস্কৃত করিবার জন্য। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বাংলা কিন্তু ইংরেজীতে

অনুবাদ না করিয়াই বোঝা যাইত। ইহাই তাঁহার ভাষা-ব্যবহার সম্বন্ধে প্রথম ও প্রধান কথা। তিনি ভাষার প্রাঞ্জলতা বজায় রাখিবার জন্য শুধু সেই সব বাক্যবিন্যাস বর্জন করিয়া চলিতেন যাহা সে-সময়ের বাংলা অলঙ্কারশাস্ত্রে দুর্বোধ্য (অবোধ্যর প্রশ্নই উঠিত না) বলিয়া নিষিদ্ধ ছিল, যেমন—

'ঈশাক্ষিতে ঈশার্ব্বুদে মারা গেলে মার
নাকেতে নির্জ্জরগণ করে হাহাকার।'

(অথচ সংস্কৃতজ্ঞান থাকিলে ইহার অর্থ বোঝা যাইত — সহজেই।)

দৃষ্টান্তটিসহ নিষেধটা আমিও আমার স্কুলপাঠ্য পুস্তকে পড়িয়াছিলাম।

ভাষার ধর্ম

রবীন্দ্রনাথের বাংলা সম্বন্ধে আমার চূড়ান্ত বক্তব্য বলিয়া ফেলি, আমার মতে আর কোনো বাঙালী লেখক পুরাতন বা নূতন, গদ্যে বা পদ্যে, বাংলা ভাষার ব্যবহারে তাঁহার সমকক্ষ হ'ন নাই। ইহাও বলিতে হইবে, তাঁহার এই শ্রেষ্ঠত্ব কেবল বাংলা ভাষার জ্ঞানেই নয়, প্রয়োগেও বটে। আর কোনো বাঙালী লেখকের মধ্যে তাঁহার সমতুল্য প্রয়োগনৈপুণ্য পাওয়া যায় না।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বাংলার একটা বিশিষ্টতা আছে — উহা সংস্কৃত ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত। বাংলা ভাষা সংস্কৃতের সন্তান তাহা তিনি কখনও ভুলেন নাই, লেখার সময়েও এই মাতা-কন্যার সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করেন নাই। এমনকি তাঁহার বাংলাকে সংস্কৃতের ঘরজামাই বলা চলে। এই কারণে অন্ততপক্ষে সংস্কৃতভাষার জ্ঞান কাজ চালাইবার মত না থাকিলে, তাঁহার গদ্য বা পদ্য সম্পূর্ণভাবে বোঝা অসম্ভব, রসোপলব্ধির তো কথাই নাই। তাঁহার বাংলা সংস্কৃতাবলম্বী কিন্তু উহা যে শুধু তৎসম বাংলা শব্দের প্রয়োগেই দেখা যায় তাহা নয়, তিনি অনেক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যাহা সে-যুগের লিখিত বাংলাতেও গৃহীত হয় নাই, তাহাও সংস্কৃতে যে-অর্থ তাহাতে। আরও একটা সংস্কৃতানুযায়ী লিখিবার ধরন তাঁহার ছিল — সেটা সংক্ষেপে অথচ স্পষ্টভাবে কোনোও উক্তি করিবার জন্যে কৃৎ এবং তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত শব্দের বহুল প্রয়োগ।

অথচ তাঁহাব বাংলা গদ্য সংস্কৃত গদ্য নয়, সংস্কৃতধর্মীও নয়। যদিও তিনি 'কাদম্বরী'-গদ্যকাব্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন, তবু 'কাদম্বরী'র গদ্য লিখিবার প্রয়াস করেন নাই, করিলে তাঁহার গদ্য বাংলা হইত না। অবশ্য বাংলা গদ্য লিখিতে গিয়া সংস্কৃতগদ্যের রীতিবর্জন তিনিই আরম্ভ করেন নাই, করিয়াছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সেজন্যই পণ্ডিতেরা তাঁহার বাংলাকে 'বিদ্যাসাগরী বাংলা' বলিয়া তুচ্ছ করিত। পরে রবীন্দ্রনাথ সেই সংস্কৃতরীতিবর্জিত, অথচ সংস্কৃতশব্দ-যুক্ত নূতন বাংলা গদ্যকে পূর্ণ বিকশিত করিয়াছিলেন।

তবে তিনি তাঁহার বাংলা গদ্যের ছন্দ কোথা হইতে পাইয়াছিলেন, শুধু তিনিই নহেন, তাঁহার পূর্ববর্তীরাও, বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত, কোথা হইতে আনিলেন? সকলেই আনিয়াছিলেন অজ্ঞাতসারে অন্য এক গদ্য হইতে। ইহার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতেই দিতেছি।

একটি সংস্কৃত গদ্যকাব্যে — নাম বলিব না — একটি তরুণীর বর্ণনা ৬৪ ছত্রে আছে, সমস্তটা একটি মাত্র বাক্য (Sentence), উহাতে কর্তৃপদ উহ্য আছে, কিন্তু ক্রিয়াপদ ও কর্ম দুইটি শব্দে — 'কন্যকাং দদর্শ', বাকী সবই বিশেষণ-শব্দ বা বিশেষণ-বাক্য সমষ্টি (adjectival phrase)। শুধু উহার শেষ ছয়টি ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি, —

১। 'বৈদেহীমিব প্রাপ্তজ্যোতিঃপ্রবেশাম্, দ্যুতকলাকুশলামিব বশী —

২। কৃতাক্ষহৃদয়াম, মহীমিব জলভূতদেহাম, হিমসময়দিবস — মুখ-লক্ষ্মীমিব পরিগৃহীত-ভাস্করা —

৩। তপাম্, আর্য্যামিব সমুপাত্ত-যতিগণোচিতমাত্রাম্, আলিখিতামিবা-চলাবস্থানাম্,

৪। অংশুমরীমিব তচ্ছায়ানুলিপ্তভূতলাম্, নিম্নর্মাম্, নিরহঙ্কারাম্, নির্মৎসরাম্,

৫। অমানুষাকৃতিম্, দিব্যত্বাদপরিজায়মান-বয়ঃ-পরিমাণাম্, অপ্যষ্টাদশ-বর্ষ —

৬। দেশীয়মিবোপলক্ষ্যমাণাম্, প্রতিপন্নপাশুপতব্রতাং কন্যকাং দদর্শ।'

ইহাতে তরুণীর মূর্তিটি একটি কারুকার্যযুক্ত মন্দিরের মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তবু তো আমি মন্দিরের 'বদরামলকলসী' মাত্র উদ্ধৃত করিলাম। মনে রাখিতে হইবে, সংস্কৃত গদ্য শুধু বক্তব্য বুঝিবারই ভাষা নয়, ধ্বনি ও ছন্দের গৌরবে কবিতা বা গানের মত শুনিবার বস্তুও বটে। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায় বলিব —

এই বর্ণনা 'সহসা সদ্যসম্পূর্ণ কবোষ্ণ কাব্যকথার মত শুনিতে হয়,' উহাতে — পাঠকের হৃদয়ের মধ্যে দূরাগত নির্জন গিরিকন্দরের নির্ঝরপ্রপাত-ধ্বনি এবং কালিদাস-রচিত "মেঘদূত", "কুমারসম্ভবে"র বিচিত্র সঙ্গীতমর্মর জাগ্রত হইয়া উঠিতে থাকে।'

কিন্তু এই গদ্য আধুনিক বাংলায় আধুনিক বাঙালীর কাছে গল্প বলিবার জন্যে লিখিত হইতে পারিত না। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার তরুণীর বর্ণনা অন্য গদ্যে দিলেন, উহারও ছয়টি ছত্র দিতেছি, —

১। 'এবার সেই সুরটিকে দেখিলাম। তখনো তাহাকে সুর বলিয়াই মনে হইল। |

২। মেয়েটির বয়স ষোলো কি সতেরো হইবে, | কিন্তু নবযৌবন ইহার দেহেমনে

৩। কোথাও | যেন একটুও ভার চাপাইয়া দেয় নাই। | ইহার গতি সহজ, দীপ্তি

৪। নির্ম্মল, | সৌন্দর্যের শুচিতা অপূর্ব্ব, | ইহার কোনো জায়গায় কিছু জড়িমা নাই। |

৫। সে | নিজের চারিদিকের | সকলের চেয়ে অধিক | রজনীগন্ধার শুভ্রমঞ্জরীর মতো |

৬। সরল বৃন্তটির উপরে দাঁড়াইয়া | যে গাছে ফুটিয়াছে সে গাছকে | সে একেবারে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। |'

এই বর্ণনাও অনবদ্য — উহার ধ্বনিগত ধর্ম বুঝাইবার জন্য যতি ও মাত্রা নির্দেশ করিয়া দিলাম।

ইহার পর ইংরেজী ভাষায় একটি তরুণীর বর্ণনা উদ্ধৃত করিব — উহা হেনরী জেম্‌স্‌ হইতে; গল্পের গদ্য বিবেচনা করিলে রবীন্দ্রনাথ ইহার সহিত তুলনীয়। বর্ণনাটি এইরূপ —

১। 'She was tall and pale. | thin and a little awkward; |'

২। her háir was fáir | and perfectly straight; |

৩। her éyes were dark | and they hád the singulárity | of béing,

৪। at ónce dúll and restless | — differing therein, | as you sée, |

৫। fatálly | from the idéa of "fine eýes" | which are álways

৬। imágined to be | bright and tranquil.' |

ইহারও যতি ও মাত্রা দিলাম।

পাঠক যদি তিনটি দৃষ্টান্ত জোরে জোরে পড়েন তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন কোনটি কাহার নিকটতর আত্মীয়। আমি রবীন্দ্রনাথের বাংলা গদ্য সম্বন্ধে আমার বক্তব্য অতি সংক্ষেপে দিলাম। এ-বিষয়ে সত্যকার গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। যে-গবেষক সম্বন্ধে বলা যায় ইনি অভূততদ্ভাবে 'গবেষণায়তে', ইহা তাঁহার কাজ নয়, অবশ্য আমারও নয়। আমি গবেষকই নই, শুধু আমি দুইটি ভাষায় গদ্য লিখিয়া থাকি। তাহা হইতে গদ্য লেখা সম্বন্ধে যে-'অনুভূতি' হইয়াছে, উহা হইতেই কথা কয়টা বলিলাম। বলা প্রয়োজন, দুইটি ভাষাতে লিখিলে প্রত্যেকটি ভাষারই ধর্ম সম্বন্ধে যে ধারণা হয়, তাহা শুধু একটি ভাষাতে লিখিলে হইবার নয়।

ইহার পর রবীন্দ্রনাথের রচনার বিষয়বস্তু এবং ভাবেরও আলোচনা করিতে হইবে। এগুলির পশ্চাতেও প্রাচীন ভারতবর্ষ রহিয়াছে তবে উহার ভাষাবদ্ধ ইতিহাসে। সেই ইতিহাস তাঁহার উপর এমনই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, তাঁহার কাব্যের পূর্ণ উপভোগ সংস্কৃত না জানিলে এবং সংস্কৃত কাব্য পড়া না থাকিলে সম্ভব নয়। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বহু দৃষ্টান্ত দিতে পারিতাম, কিন্তু একটি মাত্র দিব। বাংলার বর্ষা সম্বন্ধে কবিতা লিখিতে গিয়া সংস্কৃত কাব্য পড়া না থাকিলে কে লিখিত? —

'ওগো, প্রাসাদের শিখরে আজিকে কে দিয়েছে
কেশ এলায়ে, কবরী এলায়ে?
ওগো, নবঘন-নীলবাসখানি
বুকের উপরে কে লয়েছে টানি?'

আর, কেই বা সংস্কৃত কাব্য না পড়িয়া থাকিলে এই কয়টি ছত্রেরও রসগ্রহণ করিতে পারিত, কিংবা সংস্কৃত না জানিলে এই কবিতাতে 'ঘন' শব্দটার অর্থ বুঝিত?

প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নব্য বাঙালীর এইরূপ ভাবে-বিভোর অবস্থা দেখা দিয়াছিল ১৮৬০ সনের পরে, কিন্তু উহা সেকালের টোলের পণ্ডিতদের শিক্ষা হইতে আসে নাই, আসিয়াছিল ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্‌দের গবেষণা হইতে। নব্য বাঙালীর ইউরোপীয়দের ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে জাতীয়তাবোধ যোগ করিয়া তাহাদের নিজেদের ইচ্ছার অনুযায়ী একটা প্রাচীন ভারতীয় জীবন সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহারই প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৬ সনে লিখিয়াছিলেন, —

'প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে, প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে জ্ঞানধর্ম কত কাব্যকাহিনী।'

তেমনি ১৯১০ সনেও লিখিলেন, —

'হেথা একদিন বিরামবিহীন
মহা ওংকারধ্বনি
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে
উঠেছিল রণরণি।
তপস্যাবলে একের অনলে
বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল
একটি বিরাট হিয়া।'

ইহাতে নব্যবাঙালীর উচ্চতম প্রাচীন-ভারতভক্তি দেখা গেল। কিন্তু ইহার নীচে এই ভারতভক্তিরই আরও দুইটা রূপ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাঙালীর মধ্যে বর্তমান ছিল। ইহার একটা নব্যহিন্দু বাঙালী লেখকদের মধ্যে ছিল ও তাঁহারাই উহার প্রচার করিতেন — ইহাদেরই রবীন্দ্রনাথ 'যবন

পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলা' বলিয়া বিশিষ্ট করিয়াছিলেন। নিম্নতম স্তরে ছিল বাঙালীরা — যাহারা মনে করিত প্রাচীন ভারতবর্ষে জটাজূটধারী, ফলমূলভোজী, তপোবনবাসী, তপস্যারত মুনিঋষি ভিন্ন আর কোনো মানুষ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এইরূপ কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত ছিলেন না, তাই তিনি প্রাচীন ভারতীয়দের জীবনের দুইটা দিকেরই বর্ণনা দিয়াছিলেন — প্রথমটার এইরূপে —

'অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতীতীরে
অস্ত গেছে সন্ধ্যাসূর্য, আসিয়াছে ফিরে
নিস্তব্ধ আশ্রম-মাঝে ঋষিপুত্রগণ
মস্তকে সমিধভার করি আহরণ
বনান্তর হতে; ফিরায়ে এনেছে ডাকি
তপোবনগোষ্ঠগৃহে স্নিগ্ধশান্ত-আঁখি
শ্রান্ত হোমধেনুগণে, করি সমাপন
সন্ধ্যাস্নান, সবে মিলি লয়েছে আসন
গুরু গৌতমেরে ঘিরি কুটিরপ্রাঙ্গণে
হোমাগ্নি আলোকে।'

আর এক দিকের বর্ণনা এইরূপ, —

'কোথায় অবন্তীপুরী, নির্বিন্ধ্যা তটিনী,
কোথা শিপ্রানদীনীরে হেরে উজ্জয়িনী
স্বমহিমচ্ছায়া; শুধু বিরহ বিকারে
রমণী বাহির হয় প্রেম-অভিসারে
সূচিভেদ্য অন্ধকারে রাজপথমাঝে
ক্বচিৎবিদ্যুতালোকে।'

দুইটিই প্রাচীন ভারতের কাব্যসৃষ্টি রূপ, এই সমাজে যুবতীরা শুধু অভিসারে বাহিব হয়, নীপবনে গিয়া ঘন কালো কেশ আকুলিয়া দেয়, 'ঘরোয়া' বা 'গেরস্তপোষা' হইলেও শুধু অলক নাড়িয়া, বেণী দুলাইয়া, সখীর গলা ধরিয়া বলে 'হলা পিয় সহি।' নব্যবঙ্গীয়দের প্রাচীন ভারতবর্ষে যে-সব স্ত্রীলোক কুট্টনাদি গৃহকর্ম করিত তাহাদের স্থান ছিল না।

প্রাচীন হিন্দুদের জীবনকে এইভাবে কাব্যময় করিয়া, ১৮৬০ হইতে ইংরেজীতে শিক্ষিত বাঙালীরা কল্পনা করিল যে, হিন্দু রাজাদের কালে কবি ও বিদ্বান ব্যক্তির সম্মান যেমন ছিল ইংরেজ-শাসনের যুগে তাহার তুল্য কিছুই হয় নাই। সুতরাং বাঙালী যুবকেরা ইহাও মনে করিতে আরম্ভ করিল যে ভারতবর্ষ হইতে ইংরেজশাসন দূর করিয়া বিক্রমাদিত্যকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে, তাহা হইলে কালিদাসও আবার দেখা দিবেন। এই ধারণার বশেই রবীন্দ্রনাথও লিখিয়াছিলেন, —

'আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে
দৈবে হতেম দশম রত্ন নবরত্নের মালে...'

তাহা হইলে তিনি নব-উজ্জয়িনীর বিজনপ্রান্তে একটি কাননঘেরা বাড়ী পাইবেন, ইংরেজের কলিকাতায় ছাতুবাবুর বাগানে যাইতে হইবে না — তখন অবশ্য তিনি মংপোর কথা ভাবেন নাই।

স্যর হেনরী মেন সেই যুগে লর্ড লরেন্সের কাউন্সিলে আইন-বিভাগের সচিব, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরও ছিলেন। তিনি নূতন বাঙালী গ্রাজুয়েটদের এই আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া একটু শঙ্কা বোধ করিয়াছিলেন, তাই ১৮৬৫ কি ১৮৬৬ সনের কন্‌ভোকেশনের বক্তৃতায় বলিলেন যে, বাঙালীর ভবিষ্যৎ ইউরোপের সঙ্গে যুক্ত, প্রাচীন ভারতের সঙ্গে নয়; ইহাও বলিলেন, সে-যুগের বাঙালীর প্রাচীন ভারত সংস্কৃত কাব্যের সৃষ্টি, কোনোদিন এই কল্পিত জগতের অস্তিত্ব যদিও বা ঐতিহাসিক সত্য হইয়া থাকে, তবুও বর্তমান অবস্থায় বাঙালী তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না, যাহা কার্যত ফিরিবে তাহা হইবে, 'Mahratta robbery and Moslem misrule'। অবশ্য পরিণামে দেখা গিয়াছে Hindu misrule। কিন্তু ইউরোপের সহিত সম্পর্ক সম্বন্ধে কথা সত্য হইয়াছে।

তাঁহার কথা নিশ্চয়ই সদুপদেশ হইয়াছিল তখনকার অবস্থায়। কিন্তু স্যর হেনরী মেনের একটা বিষয় জানিবার উপায় ছিল না সেটা এই যে নব্য বাঙালী যে-প্রাচীন ভারতীয় জীবন-কল্পনা বা বর্ণনা করিতেছিল, তাহাও বিশুদ্ধ প্রাচীন-ভারতীয় নয়, উহার মধ্যে বহুল পরিমাণে ইউরোপীয় ভাব ছিল। সুতরাং তাহাদের দ্বারা প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণাও কিয়দংশে ইউরোপীয় রোমান্টিক মুভমেন্ট হইতে আসিয়াছিল।

ইহার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা হইতে দিতে পারি, যাহা তিনি হয় হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী নয় বৌদ্ধ উপাখ্যান হইতে লইয়াছিলেন। তিনি উপগুপ্ত ও বাসবদত্তার কাহিনীর যে-পরিণাম দিলেন তাহা পুরাতন বৌদ্ধ কাহিনীর নহে। তবে আমার বক্তব্য স্পষ্ট করিবার জন্য অন্য একটি দৃষ্টান্ত দিব — তাঁহার 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' কোনোদিকেই মহাভারতের কর্ণকুন্তী সংবাদ নয়; কর্ণ ও কুন্তীর এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ উদ্যোগপর্বের ৪৭২৯-৪৯৫৫ শ্লোকসমষ্টিতে আছে। সেই কাহিনীরও একটা মাহাত্ম্য আছে। ইহার সম্বন্ধে বিখ্যাত ফরাসী সংস্কৃতবিদ্‌ জর্জ দুমেজিল লিখিয়াছেন, —

'Les auteurs du Mamabharata on su menagér une scene d'une grande beaute, qui ne le cède guère en puissance dramatique, en humanité meme, au dernier chant de l'Iliade.'

(অনুবাদ — 'মহাভারতকারেরা একটা চরম সৌন্দর্যের দৃশ্য সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন; তাহা কি নাটকীয় গুণে, এমন কি মনুষ্যত্বের দিক হইতেও ইলিয়াডের শেষ সর্গের তুলনায় হীন নয়।')

কর্ণের উত্তর মহাভারতে কি-ভাবে দেওয়া হইয়াছে তাহার পরিচয় দিতেছি। কর্ণ কুন্তীকে বলিলেন, —

১। আপনার আজ্ঞা পালন আমার সর্বোচ্চ কর্তব্য পালন বলিয়া মনে করি না। মাতঃ, আপনি আমার জন্ম হওয়া মাত্র আমাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, আমার কি বিপদ হইতে পারে তাহার চিন্তা করেন নাই। আমার প্রতি আপনার যে-স্নেহ দেখানো উচিত ছিল তাহার পরিচয় আপনি কখনও দেন নাই। আজ যদি আপনি আমার কাছে আসিয়া থাকেন তাহা আসিয়াছেন আপনার স্বার্থে। (অর্থাৎ অর্জুন ও অন্য পুত্রদের বাঁচাইবার জন্য।)

২। আজ যদি আমি পাণ্ডবদের দলে যোগ দেই, ক্ষত্রিয়েরা কি বলিবে, যখন তাহারা বিবেচনা করিবে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা আমার জন্যে কি না করিয়াছে?

৩। কার্যত কর্ণ দেখাইলেন, তিনি নিজেকে রাধার পুত্র বলিয়া মনে করেন, যে-রাধা তাঁহাকে স্তন্যপান করাইয়াছিল, স্নেহ দিয়াছিল। (দুমেজিল দেখাইয়াছেন, মহাভারতকারও কর্ণকে রাধাপুত্র বলিয়াই মানিয়া লইয়াছেন। মহাভারতে কর্ণের উল্লেখ ২৫৬ বার 'রাধেয়' বলিয়া আছে, 'কৌন্তেয়' বলিয়া মাত্র ৭ বার।)

৪। কর্ণের শেষ কথা এই — আমি আপনার আর চার পুত্রকে বধ করিব না, কেবল অর্জুনই আমার বধ্য। কিন্তু ইহার জন্যে আপনার ভাবনা কেন? অর্জুন যদি আমার হাতে নিহত হয়, আপনার পাঁচটি পুত্রই থাকিবে, আর আমি যদি নিহত হই, তখনও পঞ্চপুত্রই আপনার থাকিবে।

এই উক্তি শুনিয়া বিদায় লইবার পূর্বে কুন্তী কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'তোমার কথামতই যেন সব ঘটে। তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়াছ, আমার অন্য চারি পুত্রকে বধ করিবে না। যুদ্ধের সময়ে এই প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইও না। আশীর্বাদ করিতেছি — দেবতারা তোমাকে রক্ষা করুন।'

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু কর্ণের শেষ উক্তি এইরূপ দিলেন, —

'মাতঃ, করিয়ো না ভয়।
কহিলাম পাণ্ডবের হইবে বিজয়।
আজি এই রজনীর তিমিরফলকে
প্রত্যক্ষ করিনু পাঠ নক্ষত্র-আলোকে
ঘোর যুদ্ধফল।

এই শান্ত স্তব্ধ ক্ষণে
অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে
চরম-বিশ্বাস-ক্ষীণ ব্যর্থতায় লীন।
জয়হীন চেষ্টার সঙ্গীত, আশাহীন
কর্মের উদ্যম — হেরিতেছি শান্তিময়
শূন্য পরিণাম। যে পক্ষের পরাজয়
সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোনো না আহ্বান।
জয়ী হোক, রাজা হোক পাণ্ডবসন্তান —
আমি রব নিষ্ফলের হতাশের দলে।'

মহাভারত বা ইলিয়াডের কোনো যোদ্ধা এই ধরনের কথা বলিতে পারিত না, রবীন্দ্রনাথ কর্ণের মুখে যে কথা দিলেন তাহা ইউরোপীয় যোদ্ধার উক্তি, শার্লেমানের সেনাপতি রোলাঁ হইতে নেপোলিয়নের সেনাপতি মার্শাল নে পর্যন্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

শোক ও নির্বেদ

রবীন্দ্রনাথের বাঙালীজীবনের সুখ স্থায়ী হইল না। ১৯০২ সনের শেষে একটা ঘটনা ঘটিল যাহার জন্য তাঁহার জীবনের মোড় ফিরিয়া গেল। তখন তাঁহার বয়স ৪১ পার হইয়াছে, অর্থাৎ তিনি তাঁহার জীবনের অর্ধপথ অতিক্রম করিয়াছেন। এই বয়সে দান্তে লিখিয়াছিলেন,—

'Nel mezzo del cammin di nostra vita
Mi retrovai per selva oscura
Ché la diritta via era smarrita'

(যখন আমি জীবনের মধ্যপথে, তখন দেখিলাম আমি একটি গহন অন্ধকার বনের মধ্যে আছি, উহা সেই জীবনকে তাহার ঋজু পথ হইতে ভ্রষ্ট করিল।)

পত্নীর মৃত্যু

রবীন্দ্রনাথও নিজের জীবনের মধ্যপথে ঠিক এই কথাই বলিতে পারিতেন। যাঁহার মৃত্যুর জন্য তাঁহার জীবনের গতি ভিন্ন পথে চলিল, তাঁহারই মুখে তিনি এই উক্তি দিলেন,—

'....(মালা).....গাঁথা সেরে নিয়ো একদিন
জীবনেব কাঁটা বাছি—
নবগৃহমাঝে বহি এনো তুমি গৃহহীন,
পূর্ণ মালিকাগাছি।'

কিন্তু সেই 'নবগৃহ' পরলোকে, ইহলোকে তিনি চিরতরে গৃহহীন হইয়াই রহিলেন। তিনি বলিলেন বটে, 'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া'; কিন্তু সেই ঘর কখনই খুঁজিয়া পান নাই, তাঁহার জীবন ইহজগতে ঘর হইতে বাহিরে চলিয়া গেল।

এই ঘটনাটা ১৩০৯ সনের (ইং ১৯০২) ৭ অগ্রহায়ণ তারিখে তাঁহার পত্নী মৃণালিনীর মৃত্যু। ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দুঃখের জীবনও আরম্ভ হইল, ও বৎসরের পর বৎসরে দুঃখ বাড়িয়াই চলিল। তাঁহার দুঃখের আমি কোনো কারণ খুঁজিয়া পাই না, অদৃষ্টবাদের শরণ লইতে বাধ্য হই, অন্ততপক্ষে দুঃখ সম্বন্ধে হিন্দু দার্শনিকের উক্তিতে বিশ্বাসী হই। তাঁহারা বলিতেন, দুঃখ ত্রিবিধ— আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, অথবা আধ্যাত্মিক, অর্থাৎ অলৌকিক কারণ হইতে আসে, কিংবা ঐহিক কোনো জীব বা বস্তু হইতে আসে, অথবা নিজের কুপ্রবৃত্তি হইতে আসে। রবীন্দ্রনাথের নিজের

কোনো দোষের জন্য তাঁহাকে দুঃখভোগ করিতে হইয়াছিল তাহা বলা চলে না।

প্রথমত তাঁহার পত্নীর মৃত্যুর কথাই ধরা যাক। যে-বয়সে মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হইল সেই বয়সে প্রাকৃতিক নিয়মে কেহ মরে না; যে-বয়সে রবীন্দ্রনাথ বিপত্নীক হইলেন, সে-বয়সেও কেউ সাধারণত বিপত্নীক হয় না। ইহাতে আবার তাঁহাকে মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে হইল। এই নূতন মৃত্যুশোক তিনি যেভাবে তখনই প্রকাশ করিলেন, তাহা 'জীবনস্মৃতি'তে প্রকাশিত মৃত্যুশোকের কাহিনী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেই কাহিনী লিখিত হইয়াছিল ঘটনার অন্ততপক্ষে ছাব্বিশ বৎসর পরে এবং ১৯০২ হইতে ১৯০৭ পর্যন্ত যে-মৃত্যুশোক নূতন করিয়া পাইয়াছিলেন তাহার অনুভূতি হইতেও, তবে সেই অনুভূতিও কয়েক বৎসর আগেকার। সুতরাং জীবনস্মৃতির মৃত্যুশোকের কাহিনীকে 'Emotion recollected in tranquility' বলা চলে। কিন্তু তিনি পত্নীর মৃত্যু সম্বন্ধে সেই মৃত্যুব অব্যবহিত পরেই যে কয়েকটি কাবিতা লিখিলেন সেগুলি শোকের সদ্য সদ্য আঘাতের ফল। ভালবাসার পাত্রীর মৃত্যু সম্বন্ধে এইরূপ মর্মস্পর্শী কবিতা আমি আর পড়ি নাই। এই বইটি যাঁহারা পড়িবেন, তাঁহাদের সকলকেই আমি 'স্মরণ'-এর কবিতাগুলি পড়িতে বলিব। আমি কেবলমাত্র দুই-চারিটি ছত্র উদ্ধৃত করিব। যাহাকে তিনি পাইয়াছিলেন সে ইহলোকে অতিথি মাত্র ছিল, যাইবার সময়ে আর এক অতিথি আসিবে বলিয়া বিদায় লইল, তাই রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন,—

> 'প্রেম এসেছিল, চলে গেল সে-যে খুলি দ্বার,
> আর কভু আসিবে না।
> বাকি আছে শুধু আরেক অতিথি আসিবার,
> তার সাথে শেষ চেনা।'

সেই অতিথির জন্য তিনি দ্বার খোলা রাখিয়া বসিয়া থাকিবেন, সে আসিলে নীরবে বাহু দুটি বাড়াইয়া তিনি তাহাকে বরণ করিবেন। এই শেষ অতিথি কে বলা নিষ্প্রয়োজন। এই কবিতাটি মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই লেখা। ইহার পর ১লা পৌষ তারিখে তিনি লিখিলেন,

> 'ভালো তুমি বেসেছিলে এই শ্যাম ধরা,
> তোমার হাসিটি ছিল বড় সুখে ভরা';

আজও উদাস মাঠে আকাশ বাহিয়া মৃণালিনীর নয়ন যেন ধরাকে ফিরিয়া দেখিতে চাহিতেছে, তাই—

> 'তোমার সে ভালো-লাগা মোর চোখে আঁকি
> আমার নয়নে তব দৃষ্টি গেছ রাখি।
> আজি আমি একা দেখি দু'জনেরই দেখা

তুমি করিতেছ ভোগ মোর মনে থাকি—
আমার তারায় তব মুগ্ধ দৃষ্টি আঁকি।'

নিজের জন্য তাঁহার শুধু এই কামনা—

'যেন আমি বুঝি মনে, অতিশয় সঙ্গোপনে
তুমি আজি মোর মাঝে আমি হয়ে আছ।
আমার জীবনে তুমি বাঁচো, ওগো বাঁচো ॥'

এই কবিতাগুলি, আমি ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার পত্নীর মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহার সমর্থক। ইহার পর শুধু একটি কথা বলিবার আছে — তাঁহার পত্নী সম্ভবত রূপসী ছিলেন না, তবে শুভদৃষ্টির সময় রবীন্দ্রনাথ কি দেখিয়াছিলেন? তাঁহার কথাতেই বলিব, — 'একটি স্নিগ্ধ শ্রী, একটি শান্ত লাবণ্যে কোমল সুকুমার মুখখানি মণ্ডিত।'

কন্যার মৃত্যু

পত্নীর অকালমৃত্যুর তুলনায়ও আরো শোচনীয় ঘটনা ঘটিল বৎসর ঘুরিয়া না আসিতেই—রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা রাণীর তেরো বৎসর বয়সে মৃত্যুতে। এই মেয়েটির চরিত্র ও তাহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আচরণ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানিতাম না, যাহা জানিয়াছি সবই মীরা দেবীর 'স্মৃতিকথা' হইতে, এবং তাহাতে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি।

প্রথমে মেয়েটির কথাই বলি। তাহার ভাল-লাগা মন্দ-লাগা যে-কোনো কারণেই হোক্ অত্যন্ত প্রবল ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র নীতীন্দ্র রাণীকে খুবই ভালবাসিতেন। তিনি এক মাঘোৎসবের সময়ে রাণী পরিবে বলিয়া একটা খুব সুন্দর শাড়ি তাহাকে দিয়াছিলেন। ইহার ফল কি হইল মীরা দেবীর বিবরণ হইতে দিতেছি,—

'কিন্তু রাণীদি'র কী যে হল, কিছুতে সে শাড়ি পরলেন না। কুটিকুটি করে-সে শাড়ি ছিঁড়ে ফেললেন। রাণীদি কোথাও সেজেগুজে যেতে ভালবাসতেন না। ওঁর জন্যে এত বাহারে শাড়ি এনেছেন বলে বোধ হয় নীতুদা'র উপর রাগ করে শাড়ি ছিঁড়ে ফেললেন। কোথাও যেতে হলে কাপড় পরা নিয়ে মা'র সঙ্গে লেগে যেত অনর্থ।'

এই কথাগুলি পড়িয়া আমার এমিলি ব্রন্টি সম্বন্ধে একটা গল্প মনে পড়িয়া গেল। এমিলি পোষাকপরিচ্ছদ সম্বন্ধে অত্যন্ত উদাসীন ছিল, তাই একদিন যখন তাহাকে ফ্যাশন-দোরস্ত কাপড়চোপড় পরিতে বলা হইল সে উত্তর দিল, 'I shall be as God made me.' এমিলি অত্যন্ত একরোখা মেয়ে ছিল, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে কিছুই করানো যাইত না। মীরা দেবীর বিবরণ হইতে মনে হয়, রাণীও সেই ধরনের ছিল। তিনি লিখিয়াছেন,—

গ্রন্থরচনায় নিবিষ্ট লেখক—অক্সফোর্ডে, স্বগৃহে

'সব মেয়ে ঘরসংসার করবার মন নিয়ে জন্মায় না। রাণীদি ছিলেন সেই ধরনের মেয়ে। বাবা যদি রাণীদিকে অল্পবয়সে বিয়ে না দিয়ে লেখাপড়া করাতেন তা হলে বোধ হয় ভালো করতেন। রাণীদিকে বেশির ভাগ সময় বই পড়তে দেখতুম। গল্পগুজব খুব কম করতেন। তবে ওঁকে পড়াবার জন্য কোনো শিক্ষককে আসতে দেখিনি, যেমন দিদি ও দাদাদের জন্য ছিল।'

রবীন্দ্রনাথ তাহার সম্বন্ধে এরূপ করিলেন কেন? যেটা আরও বিস্ময়ের ব্যাপার রাণীকে এগার বৎসর বয়সেই অতিসাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের এক যুবকের সঙ্গে বিবাহ দিলেন। এই বিবাহের যে বিবরণ মীরা দেবী দিয়াছেন, তাহা পড়িবার পর ব্যাপারটা আমার কোনোমতেই বোধগম্য হইল না। রাণীর বিবাহ যাহার সঙ্গে হইল তাঁহার নাম সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। বিবাহের ব্যাপারটা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। কিভাবে তাহা হইল তাহার বিবরণ মীরা দেবীর 'স্মৃতিকথা' হইতেই দিতেছি,—

'সত্যবাবুর কাছে বাবা যখন শুনলেন যে, তিনি আমেরিকায় গিয়ে হোমিওপ্যাথি শিখতে চান, তখন বাবা খুব খুশী হলেন ও রাণীদির সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সত্যবাবুও তাতে রাজী হয়ে গেলেন। বাবা তিন দিনের মধ্যে রাণীদির বিয়ের দিন স্থির করে ফেললেন। এত তাড়াহুড়ো করে বিয়ে হল যে, পাঁচজন বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজন সবাইকে নেমন্তন্ন করবার পর্যন্ত সময় হয়ে ওঠেনি। এরকম করে বিয়ে দেওয়াতে মা মোটেই খুশী হননি।'

মীরা দেবী ইহার কারণ এই দেখাইয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথের হোমিওপ্যাথির উপর খুব আস্থা ছিল, সেজন্য তিনি ভাবিলেন, জামাতা বড় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হইবে। ইহাতে তিনি সাংসারিক বুদ্ধির যে অভাব দেখাইলেন, তাহার জন্যই তিনি বড় কবি হইয়াছিলেন, কিন্তু পিতা হিসাবে ভুল করিলেন। মীরা দেবী লিখিয়াছেন,-

'আমাদের ভগিনীপতি সত্যবাবু অত্যন্ত সাদাসিধে মানুষ ছিলেন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারে মানুষ হয়েছিলেন, তাই বিদেশে গিয়ে তাদের আদবকায়দা ভালো লাগল না।'

তাই তিনি অল্পদিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে চাহিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাহাতে বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুন, তখনই দেশে ফিরিবার টাকা পাঠাইয়া দিলেন। সত্যবাবুর এইভাবে ফিরিয়া আসার জন্য তাঁহাদের মেয়েমহলে খুবই সমালোচনা শুরু হইল, একথাও মীরা দেবী লিখিয়াছেন।

সমস্ত ব্যাপারটা বিবাহ সম্বন্ধে আমাদের ধারা যাহা তাহার বিরুদ্ধে হইয়াছিল। তিনি তাঁহার তিনটি মেয়ের কোনটিরই বিবাহ, যাহাকে 'সমান ঘর' বলে তাহাতে দেন নাই। তাঁহার প্রথম জামাতা শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পুত্র এবং পরজীবনে ব্যারিস্টার হইলেও বিবাহের সময়ে মজঃফরপুর জেলা শহরের উকিল মাত্র ছিলেন। ঠাকুরবাড়ির অন্য মেয়েদের এইরূপ বিবাহ কখনই হয় নাই। ইহার পরও কনিষ্ঠা কন্যা মীরার বিবাহে ঠিক এই ভুলই করিলেন, উহা রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে একটা নিদারুণ দুঃখের কারণ হইয়াছিল। তাহার কথা পরে বলিব। এখন রাণীর কি

হইল দেখা যাক। উহার বিবরণও মীরা দেবীর 'স্মৃতিকথা' হইতেই দিব। তিনি লিখিয়াছেন,—

'সত্যবাবু অকৃতকার্য হয়ে ফিরে এলেন বলে রাণীদির মনটা খুব ভেঙে গিয়েছিল। কিছুদিন আগে থাকতে রাণীদির অল্প অল্প জ্বর হচ্ছিল, কিন্তু কাউকে বলেননি। বোধ হয় বাঁচার ইচ্ছা ছিল না। সত্যবাবু বাবার এতগুলো টাকা নষ্ট করে এলেন, কিছু শিখে এলেন না বলে ওঁর মনটা খুব ভেঙে গিয়েছিল। এই সময় মা মারা গেলেন।'

তখন দেখা গেল রাণীর যক্ষ্মা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাহাকে প্রথমে হাজারিবাগে, পরে আলমোড়া লইয়া গেলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হইল না। মীরা তখন তাঁহার জ্যাঠাইমা জ্ঞানদানন্দিনীর কাছে থাকিতেন। দিদি ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন, এ বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন, —

'সে কী জীর্ণশীর্ণ চেহারা ও ম্লান হাসি, আজও তা ভুলতে পারিনি। তাঁর ঠাণ্ডা হাতখানি বাড়িয়ে আমাকে ডেকে একবাক্স খেলনা দিলেন — কলকাতায় আসবার সময়ে লক্ষ্ণৌ স্টেশনে কিনেছিলেন, আমাব কথা মনে করে।'

ইহার কয়েকদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল। মীরা লিখিয়াছেন, —

'শুনেছি রাণীদি যাবার সময়ে বাবার হাত চেপে ধরে বলেছিলেন, "বাবা, ওঁ পিতা নোঽসি বলো।"

অসুস্থ হওয়ার পর হইতেই রবীন্দ্রনাথ কন্যাকে উপনিষদ পড়িয়া তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিতেন। মীরা লিখিয়াছেন, —

'এমনিকরে ধীরে ধীরে তার মনকে সংসারের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করবার পথে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছিলেন যাতে ছেড়ে যেতে বেশী কষ্ট না পান। এই সময় বাবা যেন রাণীদিকে বেশি কাছে টেনে নিয়েছিলেন।'

ইহা তেরো বৎসরের বালিকার মৃত্যুকাহিনী।

পুত্রের মৃত্যু

রবীন্দ্রনাথ তিন কন্যার কোনটির জীবন হইতেই দুঃখ ভিন্ন সুখ পান নাই। উহার কথা পরে বলিতে হইবে। কিন্তু শীঘ্রই কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রকেও হারাইলেন। ১৯০৭ সনে মুঙ্গেরে তেরো বৎসর বয়সে তাহার কলেরায় মৃত্যু হইল। পুত্রশোকের আঘাতে তিনি যে কবিতাটি লিখিলেন, তাহার প্রথম কয়েকটি ছত্র এই —

'প্রচণ্ড গর্জনে আসিল একি দুর্দিন —
দারুণ ঘনঘটা, অবিরল অশনিতর্জনে।
ঘন ঘন দামিনী ভুজঙ্গ-ক্ষত যামিনী,
অম্বর করিছে অন্ধনয়নে অশ্রুবরিষণ।'

কিন্তু নিজেকে এই বলিয়া ভরসা দিলেন,—

'ছাড়ো রে শঙ্কা, জাগো ভীরু অলস,
আনন্দে জাগাও অন্তরে শকতি।'

ইত্যাদি। এইরূপ কেন লিখিলেন? ১৮৮৪ সন হইতেই মৃত্যু জীবনেরই চিরসাথী এই ধারণা রবীন্দ্রনাথের মনে জন্মিল, সুতরাং মৃত্যুর সহিত বোঝাপড়া করিবারও প্রচেষ্টা আরম্ভ করিলেন। এই প্রচেষ্টার ফলে চূড়ান্ত একটা বোঝাপড়া করিলেন ১৯১৪ হইতে ১৯১৮ সনের মধ্যে। উহার পরিচয় যথাস্থানে দিব।

আর একটি মৃত্যু

ইহার পর মৃত্যুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকারের আর একটা ঘটনার কথা বলিব। উহা দারুণ শোকাবহ ব্যাপার। কিন্তু উহার উল্লেখ আমি রবীন্দ্রনাথের কোনো লেখায় পাই নাই, পাইয়াছি কেবলমাত্র মীরা দেবীর স্মৃতিকথায়। ঠিক তারিখ তিনি দেন নাই, তবে তাঁহার শৈশবে ঘটিয়াছিল। তখন রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শিলাইদহতে ছিলেন, পুত্রকন্যার শিক্ষার জন্য একজন গৃহশিক্ষক রাখিয়াছিলেন। এই শিক্ষকের নাম সুবোধ মজুমদার। ইনি রবীন্দ্রনাথের প্রিয়শিষ্য সন্তোষ মজুমদারের সম্পর্কে কাকা ছিলেন। তিনি স্ত্রী ও ছোট একটি মেয়ে লইয়া কুঠিবাড়িতে থাকিতেন, তাঁহারা থাকিতেন বজরায়। ঘটনাটা মীরা দেবীর বিবরণে এইরূপঃ

'সুবোধবাবুর মেয়ে লতু বন্দুক দেখলে বড়ো ভয় পেত। একদিন লতু যে ঘরে বসেছিল একজন কর্মচারী বসে বন্দুক পরিষ্কার করছিলেন, কিন্তু তার মধ্যে যে গুলি ভরা ছিল তাঁর সে খেয়াল ছিল না। লতুকে ভয় দেখাবার জন্য যেই ট্রিগার টেনে দিয়েছেন অমনি বেচারির রক্তাক্ত দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। লতুর রক্তমাখা জামাকাপড় কাকিমার হাতে দেখে শিউরে উঠেছি। লতু যাবার পর কাকিমাকে আমাদের বোটে নিয়ে আসা হল।'

বন্দুকে টোটা ভরা থাকিলে উহা ঘরে রাখা অমার্জনীয় শৈথিল্য কিছু না ঘটিলেও। এই দুর্ঘটনার জন্য রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাৎভাবে দায়ী না হইলেও তিনি নিজেকে গৌণভাবে অপরাধী মনে করিলেন না তাহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। তাই আমি বলিব, এই কন্যাহীনা মাতার নীরব শোকানল তাঁহার জীবনে একটি সুদীর্ঘ দগ্ধচিহ্ন রাখিয়া গেল।

নির্বেদ

মৃত্যুর এই সব অভিজ্ঞতার পর রবীন্দ্রনাথকে আবার মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে হইল ১৯১৮ সনে জ্যেষ্ঠা কন্যা বেলার বিয়োগে। কিন্তু ১৯০২ সনে

তাঁহার পত্নীর মৃত্যুর পর হইতেই তাঁহার মনের মধ্যে একটা নির্বেদ আসিয়া তাহার জীবনকে যেন 'পৌষের পাতাঝরা তপোবনে' পরিণত করিল। তিনি নিজেই জীবনের এই যুগটাকে এই আখ্যা দিয়াছিলেন। উহার পাতাঝরা রূপটাকে কীট্‌সের ভাষায় বর্ণনা করা চলে —

'In a drear-nighted December,
Too happy, happy tree,
Thy branches ne'er remember
Their green felicity.'

কিন্তু তাঁহার পক্ষে জীবনের এই কালটা 'তপোবন'ও হইয়া গিয়াছিল, সেজন্য তাঁহার সম্বন্ধে কীট্‌স্-এর শেষ উক্তি প্রযোজ্য নয়, যাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন ঃ

'To know the change and feel it,
When there is none to heal it,
Nor numbed sense to steel it,
Was never said in rhyme.'

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাহা 'ছন্দে' বলিতে পারিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর ছিলেন, তিনিই পাতাঝরা বৃক্ষের অরণ্যকে তপোবনে পরিণত করিয়াছিলেন। সেজন্যে রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনে যে-পরিবর্তন অনিবার্য ঘটনাক্রমে আসিয়াছিল ও যাহার কোনো লৌকিক প্রতিকার ছিল না, তাহারও কাব্যময় রূপ দিতে পারিলেন কবিতায়, সর্বোপরি 'খেয়া' ও 'গীতাঞ্জলি'র কবিতায়, এবং 'গীতালি'র গানে। এই সব কবিতায় ও গানে যাহা দেখা গেল উহা নির্বেদের একটা মধুর রূপ — ইহাতে বাংলার করুণ প্রাকৃতিক দৃশ্য ও তাঁহার ঈশ্বর দুইই বিরাজমান — একটি চাক্ষুষ রূপে, অপরটি মানসিক অনুভূতিতে। এই যুগে লিখিত তাঁহার গানগুলি সত্যকার গান নয়, সুরে ঈশ্বরের উপাসনা।

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাদেশিকতা ও হিন্দুত্ব

রবীন্দ্রনাথের মনে স্বাদেশিকতা ও হিন্দুত্ব নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। ইহার ফলে তিনি যেমন ভুলিতে পারিতেন না যে, তিনি ভারত বা বাংলার সন্তান, তেমনই ইহাও ভুলিতে পারিতেন না যে, তিনি বাঙালী হিন্দু। কিন্তু তাঁহার স্বদেশ-প্রেম ও হিন্দুত্বের মধ্যে কোনো সঙ্কীর্ণতা ছিল না। এই দিক হইতেই তাঁহার সহিত তাঁহার যুগের বাঙালীর মিল ছিল না, আরও বলিব, আজিকার বাঙালীর সঙ্গেও নাই; কারণ এই — সাধারণ বাঙালীর, তা সেকালেরই হউক বা একালের হউক, দেশপ্রেম যত না দেশের প্রতি ভালবাসা তার চেয়ে অনেক বেশী ইংরেজ বিদ্বেষ; আর হিন্দুত্ব যত না উহার প্রতি শ্রদ্ধা তার চেয়ে অনেক বেশী মুসলমান বিদ্বেষ; কোনো দিকে যাহাকে ভালবাসা বলা যায় তাহার ভাগ যতটুকু স্বদেশ বা হিন্দুত্ব পাইত বা পায়, তাহা অজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, সুতরাং উহা হইত মিথ্যা বড়াই। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দুইটি আসক্তিই 'আমার জিনিস' বলার মত ছিল, শুধু 'আমার নয়' বলার মত ছিল না। আর দুইটি আসক্তিই অবিচ্ছেদ্য ছিল।

এই অবিচ্ছেদ্যতা প্রমাণ করিবার জন্য এমন একটা দৃষ্টান্ত দিব যাহা যেমনই বিস্ময়কর, তেমনই অপ্রত্যাশিত। ১৯১৬ সনে তিনি জাপান যাইতেছিলেন, ২৪শে বৈশাখ (মে মাসের প্রথম দিকে) রেঙ্গুনে পৌঁছিলেন। তিনি রেঙ্গুন শহরটার যে-রূপ দেখিলেন, তাহাতে পাইলেন পুরাপুরি আধুনিকতা — অর্থাৎ ইংরেজ শাসিত প্রাচ্যদেশের নকল সাহেবিয়ানা। কিন্তু পরের দিন সকালে রেঙ্গুনের উপকণ্ঠে সম্পূর্ণ অন্য দৃশ্য দেখিলেন — সেটা বিখ্যাত 'শোয়ে-ডেগন প্যাগোডা'র। তখন যেন ব্রহ্মদেশের আপন রূপ দেখিলেন। ইংরেজের রেঙ্গুন ও বৌদ্ধধর্মের রেঙ্গুনের মধ্যে কি প্রভেদ তাহা বুঝাইবার জন্য তিনি যে উপমা দিলেন তাহার বিশেষ তাৎপর্য আছে, রবীন্দ্রনাথের মন বুঝিবার জন্য।

উপমাটা এইরূপ, —

'আধুনিক বাঙালীর ঘরে মাঝে মাঝে খুব ফ্যাশানওয়ালা মেয়ে দেখতে পাই, তারা খুব গট্ গট্ চলে, খুব চট্‌পট্ করে ইংরেজী কয়; দেখে মস্ত একটা অভাব মনে বাজে; মনে হয় ফ্যাশানটাকেই বড়ো করে দেখছি, বাঙালীর মেয়েটিকে নয়; এমন সময় হঠাৎ ফ্যাশানজালমুক্ত সরল সুন্দর স্নিগ্ধ বাঙালী ঘরের কল্যাণীকে দেখলে তখনই বুঝতে পারি, এ তো মরীচিকা নয়, স্বচ্ছ গভীর সরোবরের মতো এর মধ্যে একটি তৃষাহরণ পূর্ণতা আপন পদ্মবনের পাড়টি নিয়ে টলমল করছে।'

শোয়ে-ডেগন প্যাগোডা দেখিলে যাঁহার এইভাবে অ-ফিরিঙ্গি বাঙালী মেয়ের কথা মনে হয়, তিনি যে দেশপ্রেমিক ও হিন্দু দুইই তাহাতে সন্দেহ করা চলে না। বলিতে হইবে, 'মেমমারা' বাঙালী মেয়ে সম্বন্ধে তাঁহার যে বিরূপতা সে-রূপ বিরাগ যে-বাঙালী কবিকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন, সেই বিহারীলাল চক্রবর্তীর মধ্যেও ছিল। বিহারীলাল রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালের আধুনিকা বাঙালী মেয়ে দেখিয়া লিখিয়াছিলেন,—

'হা ধিক ফেরঙ্গবেশে এই বাল্মীকির দেশে,
কে তোরা বেড়াস্ সব উল্কিমুখী আয়া।'

আশা করি রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেমের সহিত হিন্দুত্বের যোগ সম্বন্ধে যাহা বলিতে চাহিয়াছিলাম, তাহা স্পষ্ট হইয়াছে। এখন একে একে দুই-এরই পরিচয় দিব।

রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা তাঁহার সারাজীবন ধরিয়াই দেখা গিয়াছিল প্রধানত 'স্বদেশী' হওয়াতে বা হইবার চেষ্টাতে, শুধু পবাধীনতা হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছাতেই নয়। এই স্বাদেশিকতা তিনি পাইয়াছিলেন তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছ হইতে। তিনি লিখিয়াছেন, 'স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারের সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল।' এই ধরনের স্বদেশপ্রেম রবীন্দ্রনাথের অল্পবয়সে বাঙালী সমাজে দেখা যাইত না, তখন ইংরেজী ভাষা ও বিলাতী চালচলনের প্রভাবই বাঙালীর উপর অব্যাহত ছিল। দেবেন্দ্রনাথ জীবনযাত্রায় এরূপ বিদেশভক্তির বিরোধী ছিলেন। তাই তিনি কোনো বাঙালী তাঁহার কাছে ইংরেজীতে চিঠি লিখিলে ফেরত দিতেন।

তবে অধিকাংশ বাঙালী ভদ্রলোকের জীবন-যাত্রায় এক ধরনের স্বাদেশিকতা অবশ্য অটুট ছিল, তাহা আচার-বিচার মানিয়া প্রথাগত 'হিন্দুধারা' বজায় রাখা। এটাকে বিচারহীন, অভ্যাসগত জাতীয়তা বলা যাইতে পারে।

কিন্তু এই দুই ধরনের 'স্বাদেশিকতা'র সঙ্গে ইংরেজের অধীনতা হইতে উদ্ভূত আর একটা 'স্বাদেশিকতা'ও সকল শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যেই ছিল। সেটার রূপ রাজনৈতিক। উহাকে 'স্বাদেশিকতা' না বলিয়া জাতীয়তাবোধ বলাই উচিত। ইহার বশে ইংরেজ শাসন হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছাকে প্রকাশ্যে ইংরেজের রাজনৈতিক চিন্তার ছদ্মবেশ পরাইয়া ইংরেজের সম্মুখে ধরা হইত। কিন্তু ইহাতে স্থানীয় ইংরেজ শাসকেরা কিছুমাত্র ঠকিত না, উল্টা

খাঁটি জন-বুল হইয়া ইহাকে 'লাল-ন্যাকড়া' বলিয়া জ্ঞান করিত। এই স্বাদেশিকতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনে বিশেষ সংশয় ছিল।

কিন্তু সাধারণ বাঙালীর মধ্যে গোপনে একটা 'স্বাদেশিকতা' টগবগ করিত যাহার প্রকৃত রূপ ছিল নিভাঁজ ইংরেজ-বিদ্বেষ। ইহার কারণও রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

'একটা বৃহৎ রাজ্য ব্যবস্থার মধ্যে কেবল কেরানিগিরির রাস্তা খোলা রাখিলে মানবচরিত্রের বিচিত্র শক্তিকে তাহার স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর চালনার ক্ষেত্র দেওয়া হয় না। রাজ্যের মধ্যে এই বীরধর্মেরও পথ রাখা চাই, নহিলে মানবধর্মকে পীড়া দেওয়া হয়। তাহার অভাবে কেবলই গুপ্ত উত্তেজনা অন্তঃশীলা হইয়া বহিতে থাকে সেখানে তাহার গতি অত্যন্ত অদ্ভুত এবং পরিণাম অভাবনীয়।'

এই 'স্বাদেশিকতা'র উত্তেজনা তরুণ রবীন্দ্রনাথকেও বিচলিত করিয়াছিল। ঠাকুরবাড়ির উদ্যোগে 'হিন্দুমেলা' বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহার এক অধিবেশনে পনর বৎসর বয়স্ক রবীন্দ্রনাথ লর্ড লিটনের দিল্লী রবারের বিরুদ্ধে (দরবার হইয়াছিল ১লা জানুয়ারী, ১৮৭৭ সনে) গাছের তলায় দাঁড়াইয়া একটি কবিতা পড়িয়াছিলেন। কবি নবীনচন্দ্র সেন সেখানে উপস্থিত থাকিয়া এই আবৃত্তি শুনিয়াছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন, 'সেই কাব্যে বয়সোচিত উত্তেজনা প্রভূত পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও তখনকার প্রধান সেনাপতি — পুলিশের কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত কেহ কিছুমাত্র বিচলিত হইবার লক্ষণ প্রকাশ করিলেন না।'

এইরূপ ক্ষীণ আত্মপ্রকাশে সে-যুগেও বাঙালীর ইংরেজ-বিদ্বেষের তৃষ্ণা মিটিত না। তাই পরবর্তী যুগের গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির মাতৃত্বের দাবী করিতে পারে। এই ধরনের গুপ্ত সভা রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালেও দেখা দিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ যেটাতে যোগ দিয়াছিলেন সেটা স্থাপিত হইয়াছিল তাঁহার অপেক্ষা বারো বৎসরের বড় দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা, আরও আশ্চর্যের কথা বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু ইহার সভাপতি হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে, কলিকাতার এক গলির মধ্যে এক পোড়ো বাড়িতে সেই সভা বসিত, এবং সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠান রহস্যে আবৃত ছিল; ইহার সভ্যেরা মধ্যাহ্নে কোথায় কি করিতে যাইত তাহা ইহাদের আত্মীয়েরাও জানিত না। দ্বার রুদ্ধ করিয়া, ঘরকে অন্ধকার করিয়া, মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার রাখিয়া, ঋগ্‌বেদের মন্ত্রে দীক্ষা লইয়া ও চুপি চুপি কথা কহিয়া ইহার কার্য সমাধা হইত; ইহাতেই সকলের রোমহর্ষণ হইত। 'জীবনস্মৃতি'-তে রবীন্দ্রনাথ এই বাঙালী 'প্রোটো -রিভলিউশ্যনারী'দের কার্যকলাপের এই বিবরণ দিয়াছেন—

'তাহার মধ্যে ওই গোপনীয়তাটাই একমাত্র ভয়ঙ্কর ছিল। . . .সেই সভায় আমরা এমন একটি খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম যে, অহরহ উৎসাহে যেন আমরা উড়িয়া যাইতাম।

লজ্জা, ভয়, সঙ্কোচ আমাদের কিছুই ছিল না। এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহানো।'

সকলেরই জানা আছে উত্তেজনার আগুনে হাস্যরস ও রসবোধ উবিয়া যায়।

তবে কথা বলা ছাড়া, সঙ্গে সঙ্গে স্বাদেশিকতার কর্মযোগেরও অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল। ১৯০৫ সনে যখন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হইল তাহার নাম দেওয়া হইল 'স্বদেশী আন্দোলন', কারণ ইহার সঙ্গে সঙ্গে নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র দেশে তৈরি করার জন্য একটা উদ্যোগ দেখা দিল। ইহার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল, প্রথম দিকে সাফল্য যতই ক্ষীণ হউক না কেন। আমি ১৩১২ সনের ৩০শে আশ্বিন সকালে স্নান করিয়া যে 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' প্রথমে মাথায় তুলিয়া পরে কোমরে বাঁধিয়াছিলাম, উহা পাঁচ হাত ধুতি হইলেও উহার ওজন কত হইয়াছিল তাহা মনে আছে।

এই 'ব্যবহারিক' স্বাদেশিকতা রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালেও দেখা দিয়াছিল। উহার প্রথম প্রকাশ দেখা গেল ধুতি শাড়ি দেশী করিবার চেষ্টায়। ইহার ফল কি হইল তাহা রবীন্দ্রনাথ এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,—

'খবর পাওয়া গেল একটি কোনো অল্পবয়স্ক ছাত্র কাপড়ের কল তৈরী করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত, গেলাম তাহার কল দেখিতে। সেটা কোনো কাজের জিনিষ হইতেছে কিনা তাহা কিছুমাত্র বুঝিবার শক্তি আমাদের কাহারও ছিল না, কিন্তু বিশ্বাস করিবার ও আশা করিবার শক্তিতে আমরা কাহারও চেয়ে খাটো ছিলাম না। যন্ত্র তৈরী করিতে কিছু দেনা হইয়াছিল, আমরা তাহা শোধ করিয়া দিলাম। অবশেষে একদিন দেখি ব্রজবাবু মাথায় একখানা গামছা বাঁধিয়া জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন, "আমাদের কলে এই গামছার টুকরা তৈরী হইয়াছে", বলিয়া দুই হাত তুলিয়া তাণ্ডব নৃত্য।—তখন ব্রজবাবুর মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে।'

কিন্তু পরিধেয় বস্ত্র ছাড়া আর একটা জিনিস তৈরী করা বাঙালীর স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠার একটা অবর্জনীয় অঙ্গ বলিয়া তখনই গৃহীত হইয়াছিল—তাহা দেশলাই তৈরী করা। ইহাও তাঁহাদের গুপ্তসমিতির একটা কাজ হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন যে, ইহার জন্য সেই সমিতির প্রত্যেকটি সভ্য তাঁহার আয়ের এক দশমাংশ দিতে প্রতিশ্রুত হইতেন, ফলে দেশলাই তৈরী হইল বটে, কিন্তু দেখা গেল একবাক্সে যে খরচ পড়িল তাহাতে একটা পল্লীর সম্বৎসরের চুলা ধরানো চলিত। দ্বিতীয়ত আর একটা অগ্নিশিখা না থাকিলে এই দেশলাই-এর কাটি জ্বালানো যাইত না। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন,—

'দেশের প্রতি জ্বলন্ত অনুরাগ যদি তাহাদের জ্বলনশীলতা বাড়াইতে পারিত, তবে আজ পর্যন্ত তাহারা বাজারে চলিত।'

দেশলাই তৈরী করিবার এই চেষ্টা কিন্তু বজায় রহিল, যদিও ইংরেজকে জব্দ করিবার জন্য ইহার প্রয়োজন ছিল না, কারণ আমাদের সমস্ত দেশলাই

আসিত সুইডেন হইতে। তবু দেশলাই তৈরীর চেষ্টা চলিল। আমি ১৯০৭ সনে ত্রিপুরা জেলায় আমার মামার বাড়ি কালিকচ্ছ গ্রামে গিয়া দেখিলাম, বিখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্র নন্দীর পুত্রেরা (মহেন্দ্রবাবু বড় জমিদারও ছিলেন), খচ্‌খচ্‌ করিয়া একটা কলে কাঠ চিরিতেছে, দেশলাই-এর শলাকাতে পরিণত করিবার জন্য। মহেন্দ্রবাবুর তৃতীয় পুত্র মালুবাবুর ঘর্মাক্ত কপাল আমার চক্ষে এখনও ভাসে, আর সেই খচ্‌খচ্‌ শব্দও কানে বাজে। শৈশবে এই সব অভিজ্ঞতার ফলে বড় হইয়া যখন পড়িলাম,—

'Bliss was it in that dawn to be alive,
But to be young was very heaven-'

তখন উহার অর্থ বুঝিতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হইল না, রবীন্দ্রনাথেরও হয় নাই।

ইহার পর অবশ্য কংগ্রেসের জাতীয়তা প্রচার আরম্ভ হইল। কিন্তু ইহার সহিত যে রবীন্দ্রনাথের প্রাণের যোগ ছিল না তাহার ইঙ্গিত ইতিপূর্বে দিয়াছি। এই বিরাগ তাঁহার মনে আসিয়াছিল এই আন্দোলনের মধ্যে দেশের পরিচয়হীনতা ও সেবাবিমুখতা দেখিয়া। এই কথাটাই তিনি ১৯১২ সনে বিলাত প্রবাসের সময়ে এই ভাবে লিখিয়াছিলেন,—

'আমাদের দেশেও অনেকদিন হইতে পোলিটিক্যাল অধিকার লাভের একটা চেষ্টা শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। দেখা গিয়াছে, এই চেষ্টার যাহারা নেতা ছিলেন তাঁহাদের অনেকেরই দেশের ভাষা-সাহিত্য-আচারব্যবহারের সহিত সংস্রব ছিল না। দেশের জনসাধারণের সঙ্গে যোগ ছিল না বলিলেই হয়। দেশের উন্নতি সাধনের জন্য তাঁহাদের যাহা কিছু কারবার সমস্তই ইংরেজী ভাষায় ও ইংরেজ গভর্নমেন্টের সঙ্গে। দেশের লোককে লইয়া যে দেশের কোনো কাজ করিতে হইবে সেদিকে তাঁহাদের দৃষ্টিমাত্রই ছিল না।'

রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন, মাতৃভাষার ভিতর দিয়া দেশের ধর্মকে রাজাসন দিবার গৌরব বঙ্কিমচন্দ্রের।

তবে রবীন্দ্রনাথ জাতীয় আন্দোলনে দ্বিধাবিহীন হইয়া যোগ দিলেন ১৯০৫ সনে, বাংলা দেশ বিভক্ত হইবার পর। ইহা ঘটিল যতটা প্রাকৃতিক বাংলাদেশের প্রতি ভালবাসার জন্য, ততটা স্বজাতির সহিত একাত্মতার জন্য নয়, যদিও সেই একাত্মতারও অভাব ছিল না। ইহার পরিচয় দিতেছি।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক রূপ রবীন্দ্রনাথের যে গানটিতে ভাষাবদ্ধ হইয়া, সমস্ত বাঙালীর কাছে মায়ের মূর্তিতে দেখা দিয়া, ভালবাসা ও ভক্তিতে পূর্ণ বাঙালীপ্রাণের জাতীয় সঙ্গীতের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, সেটি ১৯০৫ সনের ৭ই আগস্ট কলিকাতার টাউন হলে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ সভায় গাওয়া হইয়াছিল। উহা অবশ্য, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।' উহার শেষ চরণটি ছাড়া আগেকার চব্বিশটি চরণে রাজনৈতিক ভাবের ছোঁয়াচও নাই। শুধু সেই চরণটিতে বঙ্গমাতার ভূষণের জন্য বিলাতি

জিনিস না কিনিবার প্রতিশ্রুতি অত্যন্ত সন্তর্পণে দেওয়া হইয়াছিল। উহার জন্যেই ১৯০৬ সন হইতে আমাদের বাড়িতে দুর্গাপূজায় দেবীর মুকুটে, বক্ষে, বা বাহুতে রাংতা ইত্যাদির আভরণ আর দেখিলাম না, সবই রং-করা মাটির হইল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাখীবন্ধনের জন্য রবীন্দ্রনাথ 'বাংলার মাটি, বাংলার জল'গানটি রচনা করিলেন, এবং তখনই 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা' লিখিলেন। খাঁটি রাজনৈতিক গান যাহাকে বলা যায় সে-রকম দুইটি তিনি এই সময়ে লিখিয়াছিলেন। উহাদের একটি 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান,' অপরটি 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে' প্রায় একদিনেই লেখা হইয়াছিল।

প্রকৃতপ্রস্তাবে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ হিসাবে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহার বাহিরে, কেবলমাত্র ইংরেজের বিরোধিতা করিবার জন্য যে জাতীয় আন্দোলন চলিতেছিল তাহার সহিত রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের নিবিড় যোগ ছিল না। তাই বঙ্গভঙ্গ বাতিল হইবার পর যখন আবার অখণ্ড বাংলার প্রতিষ্ঠা হইল তখন হইতে, রবীন্দ্রনাথ যখনই পরাধীনতা হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা জানাইয়াছিলেন সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সমাজের নিগড় ভাঙিয়া বাহির হইবার কথাও বলিয়াছিলেন—যেমন ১৯১৭ সনে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' বক্তৃতায় এবং উহার পর বৎসরেই প্রকাশিত 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী' গানটিতে। গানটিতে 'বিঘ্ন বিপদ দুঃখদহন তুচ্ছ করিল যারা' তাহারা কে, এবং যাহারা 'নিশ্চল, নির্বীর্যবাহু, কর্মকীর্তিহীন, ব্যর্থ শক্তি ও নিরানন্দ' হইয়া রহিল তাহারা কে—সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশমাত্র নাই। রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা স্বজাতির দীনতাকে কখনই মানিয়া লয় নাই। কিন্তু ইহার জন্যই তিনি নিন্দিত হইলেন।

ইহার পর রবীন্দ্রনাথের হিন্দুত্বের কথা বলিতে হইবে। বলা বাহুল্য, অথবা আজিকার দিনের বাঙালীকে বলা আবশ্যক যে তাঁহার হিন্দুত্ব প্রাচীন ভারতের হিন্দুত্ব নয়, ব্রিটিশ শাসনের অব্যবহিত পূর্বে বাঙালীর মধ্যে প্রচলিত স্মার্ত রঘুনন্দনের হিন্দুত্বও নয়, উহা বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার মত বাঙালীর দ্বারা সৃষ্ট ও প্রচারিত নব্য বাঙালী হিন্দুত্ব। ইহার স্বপক্ষে প্রথমে একটি ইঙ্গিতসূচক দৃষ্টান্ত দিতেছি। ইহাও একটি গান, ১৯০৫ সনে বঙ্গবিচ্ছেদ কার্যকরী হইবার সময়ে রচিত। ইহার প্রথম চারিটি ছত্র এইরূপ—

'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী।
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।'

এই গানটির নাম দেওয়া হইয়াছিল 'মাতৃমূর্তি'। তবে মাতার মূর্তি কিরূপ? রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন,—

'ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ।
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুনবরণ।
ওগো মা, তোমার কি মূরতি আজি দেখি রে।
তোমার মুক্ত কেশের পুঞ্জ মেঘে লুকায় অশনি....'

এই দেশমাতৃকার সহিত আর এক দেশমাতৃকার কোনও প্রভেদ নাই,—

'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাম্.....'

মাতার এই মূর্তি দেখাইয়া সত্যানন্দ বলিলেন,—'এই, মা যা হইবেন।' মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মার এই মূর্তি কবে দেখিতে পাইব?' সত্যানন্দ উত্তর দিলেন, 'যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে সেই দিন উনি প্রসন্ন হইবেন।' রবীন্দ্রনাথও লিখিলেন,—

'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক, জগৎজনের শ্রবণ জুড়াক,

* * * *

বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে
দশদিক সুখে হাসিবে।'

কিন্তু ইহার পরও কথা আছে। বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথই এই মাতৃমূর্তির সৃষ্টি করেন নাই, উহা বহু প্রাচীন, সহস্র বৎসর ধরিয়া যে মাতার রূপ হিন্দুরা ধ্যান করিয়াছে সেই মাতা। তাঁহার বহু ধ্যান উদ্ধৃত করিতে পারিতাম, একটি মাত্র 'চণ্ডী' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি,—

বিদ্যুদ্দামসমপ্রভাং মৃগপতিস্কন্দস্থিতাং ভীষণাম
কন্যাভিঃ করবালখেটবিলসদ্ধস্তাভিরাসেবিতাম।
হস্তৈশ্চক্রধরালি-খেটবিশিখাংশ্চাপং গুণং তর্জনীম্
বিভ্রাণামনলাত্মিকাং শশিধরাং দুর্গাং ত্রিনেত্রাং ভজে।'

(অনুবাদ—যিনি বিদ্যুদ্দামতুল্য প্রভাময়ী, সিংহবাহিনী, ভীষণা, খড়্গ-খেটকধারিণী কন্যাগণের দ্বারা সেবিতা, নিজের হস্তে চক্র, ধরালি, খেট, বিশিখাসমূহ চাপ, গুণ ও তর্জনীমুদ্রা ধারিণী, যিনি শশিধারিণী, অনলস্বরূপা, ত্রিনয়নী, সেই দুর্গাকে আমি ভজনা করি।)

রবীন্দ্রনাথ যে এই মাতৃমূর্তির সহিত পরিচিত ছিলেন তাহার প্রমাণ পাই তাঁহার গল্পের একটি নায়িকার উক্তি হইতে। সেই বধূটি বলিল, 'আমার

আট বৎসর উত্তীর্ণ না হইতেই বিবাহ হইয়াছিল (অষ্টম বর্ষে গৌরীদান)। কিন্তু পূর্বজন্মের পাপবশত আমি আমার এমন স্বামী পাইয়াও সম্পূর্ণ পাইলাম না। মা ত্রিনয়নী আমার দুই চক্ষু লইলেন।'

এই গল্পটি লিখিত হইয়াছিল ১৮৯৯ সনের প্রথম দিকে। এই গল্প হইতেই রবীন্দ্রনাথের নব্য হিন্দুত্বের প্রতি অনুরাগের আভাস পাই। তিনি এই নায়িকার মুখে এই উক্তি দিলেন,—'যদি আমি সতী হই, তবে ভগবান সাক্ষী রহিলেন, তুমি কোনো মতেই তোমার ধর্ম শপথ লঙ্ঘন করিতে পারিবে না।' বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রমরের মুখেও এইরূপ উক্তি দিয়াছিলেন। হিন্দু সাধ্বীর আদর্শ তাঁহার মন হইতে কখনই বিদায় লয় নাই। ১৯০৯ সনের ২৭শে জুলাই তারিখে তিনি কনিষ্ঠা কন্যাকে এই আশীর্বাদ করিয়াছিলেন,—

'কায়মনোবাক্যে সতী সাধ্বী হয়ে ঈশ্বরপরায়ণ হয়ে, নিষ্কলঙ্ক উজ্জ্বল পুণ্যজ্যোতির দ্বারা জীবনকে উদ্দীপ্ত করে, হৃদয়কে মধুর করে, মনকে সতেজ করে, মঙ্গল সঙ্কল্পকে সবল করে তোর স্বামীর জীবনে যেন তুই শক্তি, প্রীতি, পুণ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীর মত অক্ষুণ্ণ সৌন্দর্যে বিরাজ করতে পারিস এই আমি তোকে অন্তরের সঙ্গে আশীর্বাদ করি।'

ইহা হিন্দু পিতার আশীর্বাদ। অদৃষ্টের পরিহাসে তাঁহার এই আশীর্বাদ সফল হয় নাই। তাহাই রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটা চিরস্থায়ী যন্ত্রণা হইয়া রহিল।

ইহার পর রবীন্দ্রনাথের হিন্দুত্বের পরিচয় পাই শান্তিনিকেতনে 'বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠায়। ইহার উদ্বোধন হয় ১৯০১ সালের ২২শে ডিসেম্বর পাঁচটি ছাত্র ও পাঁচজন অধ্যাপক লইয়া। ছাত্রের মধ্যে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ছিলেন, অধ্যাপকদের মধ্যে তিনজন খৃষ্টান, ইহাদের একজন ছিলেন ইংরেজ। রবীন্দ্রনাথ এইরূপ গুরুগৃহ ঠিক কি উদ্দেশ্যে স্থাপন করেন তাহা লৌকিক যুক্তিতে বোঝা কঠিন। মনে করাইয়া দেওয়া দরকার, ঠিক এই বৎসরেই স্বামী শ্রদ্ধানন্দও (লালা মুনসীরাম) 'গুরুকুল' স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধানন্দের মত হিন্দু ছিলেন না, তবু ধর্মশাস্ত্রসম্মত গুরুগৃহ প্রতিষ্ঠা করিলেন, উঁহার ছাত্রদের ব্রহ্মচর্যাবলম্বী, নিরামিষাশী, গৈরিক ভেকধারী ও দণ্ডধারী হইতে হইল। গুরুকুলে যাইবার মত হিন্দু উত্তরাপথে যথেষ্ট ছিল, কিন্তু বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে মনেপ্রাণে ব্রহ্মচারী হইবার মত ছাত্র বাঙালীর মধ্যে ছিল না। শান্তিনিকেতনের ছাত্র, বাঙালীর মধ্যে যাহারা টোলের পণ্ডিতের কাছে পড়িতে যাইত সেই শ্রেণীর বাঙালী হইতে আসিত না, আসিত ভূস্বামী, পেশাদার ও চাকুরীজীবী শ্রেণীর বাঙালী হইতে এবং এই সব শ্রেণীর পুত্রদের মধ্যেও কোন্ পুত্রেরা বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যাইত তাহার সংবাদ আমার ভাল করিয়াই জানা ছিল।

তবে রবীন্দ্রনাথের দিক হইতে এই শিক্ষায়তন স্থাপন সম্পূর্ণ আন্তরিক ও অকপট ছিল। তিনি কি করিতে চাহিয়াছিলেন তাহার আভাস তাঁহার পরবর্তী একটি লেখা হইতে পাই। উহার তারিখ ১৯ আগস্ট, ১৯১২ সন, স্থান ইংলন্ড। তখন তিনি এইরূপ লিখিলেন,—

'আমাদের ভারতভূমি তপোভূমি হইবে, সাধকের সাধনক্ষেত্র হইবে, সাধুর কর্মস্থান হইবে, এইখানেই ত্যাগীর সর্বোচ্চ আত্মোৎসর্গের হোমাগ্নি জ্বলিবে, এই গৌরবের আশাকে যদি মনে রাখি তবে পথ আপনি প্রস্তুত হইবে এবং অকৃত্রিম শিক্ষাবিধি আপনি আপনাকে অঙ্কুরিত পল্লবিত ও ফলবান করিয়া তুলিবে।'

ইহা তাঁহার হিন্দুত্বের পরিচায়ক। এই সময় রবীন্দ্রনাথের মনে হিন্দুত্বের প্রাবল্য না থাকিলে তিনি স্বদেশী আন্দোলনেও যোগ দিতে পারিতেন না, কারণ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্যেও বাঙালীর নব্যহিন্দুত্ব সবলে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ যুগোপযোগী হিন্দুত্ব বলিতে কি বুঝিতেন তাহার বিস্তারিত বিবরণ 'গোরা' উপন্যাসে দিয়াছেন। গোরার হিন্দুত্ব যে তাঁহারই হিন্দুত্ব তাহাতে সন্দেহ নাই। তবু উপন্যাসে গোরা হার মানিয়া ব্রাহ্ম পরেশের শিষ্য হইতে চলিল কেন? অবশ্য পরেশ সে যুগের গোঁড়া ব্রাহ্ম ছিলেন না, তবু পরেশের ধর্ম ও তাহার ধর্মের মধ্যে যে মূলগত প্রভেদ আছে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে গোরা কখনই কুণ্ঠা বোধ করে নাই। পরেশ যে বিনয়ের সঙ্গে ললিতার বিবাহ হিন্দুমতে দিতে প্রস্তুত হইলেন, তাহার সম্বন্ধে গোরা বলিল,—

'পরেশবাবু সম্মতি দিতে পারেন, কেন না নদীর যে ধারা কূল ভাঙছে, সেই ধারাই তাঁদের। আমি সম্মতি দিতে পারিনে, কেন না আমাদের ধারা কূলকে রক্ষা করে। আমাদের এই কূলে কত শতসহস্র বৎসরের অভ্রভেদী কীর্তি রয়েছে, আমরা কোনোমতেই বলতে পারব না, এখানে প্রকৃতির নিয়মই কাজ করতে থাক। আমাদের কূলকে আমরা পাথর দিয়েই বাঁধিয়ে রাখব—তাতে আমাদের নিন্দাই কর আর যাই কর।'

দ্বিতীয়ত, সমস্ত হিন্দু সামাজিক বিধান নির্বিচারে মানিতে হইবে, এই কথা গোরা পরেশবাবুকে বিনা দ্বিধায় বলিল,—

'আমার কথাটা এই যে, আগে সমাজকে সব দিক থেকে সম্পূর্ণ মেনে চললে তবেই সমাজের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের চেতনা নির্মল হতে পারে। তার সঙ্গে বিরোধ করলে তাকে যে কেবল বাধা দিই তা নয়; তাকে ভুল বুঝি।'

গোরার এই দুইটি যুক্তি মানা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অসম্ভব ছিল, কারণ দুইটি যুক্তিই 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের পুরাতনকে ও 'অচলায়তন' নাটকের অচলায়তনকে অটুট রাখার পক্ষে। তবু রবীন্দ্রনাথ নব্যহিন্দুত্বের দিকে কেন ঝুঁকিলেন? ইহার সহজ উত্তর, রবীন্দ্রনাথের নব্যহিন্দুত্ব রাজনৈতিক জাতীয়তাবোধ হইতে আসিয়াছিল। গোরার হিন্দুত্ব যে হিন্দুর ধর্মের

(religion)-এর প্রতি আসক্তি নয়, জাতীয়তাবোধের প্রকাশ তাহাতে সন্দেহ করা চলে না। বঙ্কিমচন্দ্র কতটা জাতীয়তাবাদী ছিলেন, এবং কতটা অন্তরে-অন্তরে ধর্মনিষ্ঠ (religious) ছিলেন, তাহা বিচারের বিষয়। শেষ জীবনে তিনি নিজের প্রবৃত্তি অনুযায়ী ঈশ্বরভক্ত হইয়াছিলেন তাহা মনে হয়। বিবেকানন্দ কোনোদিকেই religious ছিলেন না, তাঁহার হিন্দুত্ব সম্পূর্ণ মানসিক জাতীয়তা ইহাতে সন্দেহ নাই। সেজন্যই নিজের বাণী সাধারণ বাঙালীকে গ্রহণ করাইবার জন্য তিনি রামকৃষ্ণের শরণ লইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের হিন্দুত্বও জাতীয়তাধর্মী, মূলত ধর্মবিশ্বাস নয়। ভারতীয় ভারতীয় হইয়াই থাকিবে, ইহা তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু কখনও তিনি এমন গোঁড়া হিন্দু জাতীয়তাবাদী হন নাই যে এটা চাহিবেন—ভারতবাসী পৃথিবীব্যাপী মানব সমাজের সহিত বিরোধ বাধাইবে, এমন কি বিচ্ছিন্ন হইয়াও থাকিবে। পক্ষান্তরে পৃথিবীর সহিত ভারতবর্ষের যোগ প্রতিষ্ঠিত করাই পরজীবনে তাঁহার প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকলাপের লক্ষ্য হইয়াছিল। সমগ্র মানবসমাজের সহিত মিত্রতা ও আদান-প্রদান রাখিয়া ভারতবাসীকে ভারতীয় হইয়াই থাকিতে হইবে ইহাই তাঁহার হিন্দুত্বের প্রকৃত বাণী। তাঁহার ধর্মবিশ্বাস বা ঈশ্বরভক্তি সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার, সেসব তাঁহার ব্যক্তিগত সাধনা। উহারই পরিচয় এখন দিব।

পঞ্চম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্ম ও ঈশ্বরভক্তি

সাধারণ লোকে সহজ ভাষায় এই কথাগুলি ব্যবহারের সময়ে যা বোঝে বা প্রকাশ করিতে চায়, সেই অর্থ যদি ধরা যায়, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথ ধার্মিক ও ঈশ্বরভক্ত ছিলেন, ইহা বলিলে কোনো তর্কের সৃষ্টি হইবে না। কিন্তু এই কথাগুলির দার্শনিক, তাত্ত্বিক বা যুক্তিযুক্ত (rational) ব্যাখ্যা দিতে গেলে ঘোর অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হইতে হইবে।

তাঁহার নিজের বক্তব্য

মুশকিলের কথা এই যে, তিনি নিজেই ধর্ম, বা ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া যেসব শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, ও তাহার যে অর্থ দিয়াছেন, সে সব তাঁহার নিজের অনুভূতির মত অনুভূতি যাহাদের নাই তাহাদের বুঝিবার পথে প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করিযাছে। তিনি সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ হইতেও সুপরিচিত যে সব শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহার অর্থও প্রাচীন গৃহীত অর্থ নয়, তাঁহার নিজের সৃষ্ট অর্থ। এ বিষয়ে তাঁহাকে শঙ্করের মত বলা যাইতে পারে। বেদান্ত শ্রুতির উপরই প্রতিষ্ঠিত ইহা প্রমাণ করিবার জন্য শঙ্কর শ্রুতির ভাষাব ইচ্ছামত অর্থ দিতেন। তবে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি যদি মানিয়া লওয়া যায, তাহা হইলে তাঁহার এই সব অর্থ সম্বন্ধে আপত্তি করা যায় না। কিন্তু সেই অনুভূতি ছাড়িয়া দিয়া প্রচলিত ধারণাব বশে তাঁহার ধর্মসংক্রান্ত কথা শুনিলে অনেক সময়েই উহা হেঁয়ালির মত মনে হইবে। ইহার বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, মাত্র তিনটি দিতেছি।

১। তিনি ১৯১২ সনে লিখিলেন—

> 'ধর্ম শব্দের গোড়াকার অর্থ, যাহা ধরিয়া রাখে। Religion শব্দের ব্যুৎপত্তি আলোচনা করিলে বুঝা যায়, তাহারও মূল অর্থ যাহা বাঁধিয়া তোলে।'

শুধু এইটুকু ধরিলে তাঁহার উক্তিতে সংস্কৃত ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে কোনো ভুল নাই, কিন্তু ইংরেজি সম্বন্ধে একটু গোল আছে। 'ধর্ম' শব্দের সংস্কৃত ব্যুৎপত্তি সত্যই ধৃ-ধাতু হইতে—যাহা ধারণ করে উহাই ধর্ম। এই ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী সংস্কৃত 'ধর্ম' শব্দের অর্থ religion নয়, morality— কাবণ morality-ই সমাজকে ধরিয়া রাখে। ইংরেজী Religion শব্দ সম্বন্ধে গোল এই যে, এই শব্দটা ল্যাটিন religio হইতে আসিয়াছে, যাহার অর্থ মোটেই religion নয়। আবার রবীন্দ্রনাথও যে ব্যুৎপত্তি দিলেন তাহা প্রথম যুগে রোমান খ্রীস্টধর্ম প্রচারকদের দেওয়া, প্রাচীন রোমানদের নয়। টার্টুলিয়ান

religio-র ব্যুৎপত্তি করিয়াছিলেন, ল্যাটিন ধাতু ligare হইতে, যাহার অর্থ বাঁধা, পক্ষান্তরে সিসেরো করিয়াছিলেন legere ধাতু হইতে, যাহার অর্থ বিবেকের নিষেধ মানা। অর্থাৎ প্রাচীন রোমান অর্থে religio-র বিপরীত শব্দ ইংরেজিতে যাহাকে neglect ও সংস্কৃতে যাহাকে 'দোষ' বলে।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ধর্ম ও religion, দুইটি শব্দেরই নিজস্ব অর্থ দিলেন। তিনি বলিলেন—

'মানুষ ধর্মকে বন্ধন বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। ধর্মই মানুষের চেষ্টার ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করিয়া সংকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে।'

কিন্তু তিনি ইহাও বলিলেন, এই স্বাধীনতার সঙ্কোচ অন্যায় হওয়া দূরে থাকুক ভালই, এই যুক্তিতে—

'এই বন্ধনকে স্বীকার করা, এই সীমাকে লাভ করাই মানুষের চরম সাধনা। কেননা সীমাই সৃষ্টি।।

কিন্তু এখানে 'সীমা' ও 'অসীমতা' বলিতে তিনি যাহা বুঝিলেন, তাহা সাধারণ অর্থে 'সীমাবদ্ধ' এবং 'অসীম' নয়, বুঝিলেন পরস্পরযুক্ত তিনটি অর্থে finite এবং infinite, প্রমেয় এবং অপ্রমেয়, গুণবিশিষ্ট এবং গুণাতীত। সুতরাং তাঁহার মতে 'ধর্ম' মানুষকে অপ্রমেয়কে প্রমেয় করিয়া আয়ত্ত করিতে দেয়।

২। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ১৯১৭ সন হইতে। তিনি লিখিলেন,—

'সকল মানুষেরই "আমার ধর্ম" বলে একটা বিশেষ জিনিস আছে। কিন্তু সেইটিকেই সে স্পষ্ট করে জানে না। সে জানে আমি খৃষ্টান, আমি মুসলমান, আমি বৈষ্ণব, আমি শাক্ত ইত্যাদি। কিন্তু সে নিজেকে যে ধর্মাবলম্বী বলে জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিশ্চিন্ত আছে সে হয়তো সত্য তা নয়। নাম গ্রহণেই এমন একটা আড়াল তৈরি করে দেয় যাতে নিজের ভিতরকার ধর্মটা তার নিজের চোখেও ধরা পড়ে না। কোন্ ধর্মটি তার?'

কিন্তু কোনোদিন হিন্দু যে কি, আর মুসলমান যে কি সে সম্বন্ধে সাধারণ হিন্দু বা মুসলমানের মনে কোনো সন্দেহই ছিল না। তাহা দুইজনেই সুপরিচিত ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়া বুঝাইয়া দিত। ভারতচন্দ্রের বিবরণে জাহাঙ্গীর বলিলেন, 'ভগবান নিজের দাড়িগোঁফ মানুষকে দিলেন, হিন্দু এমন দাড়ি-গোঁফকে কেন মুড়ায়'; 'হিন্দু হালাল না করিয়া খায় সুতরাং হিন্দুর সব কাজই নাপাক—অর্থাৎ অপবিত্র; স্বামী মরিলে হিন্দুরা স্ত্রীলোককে রাঁড় করিয়া রাখে।'—ইত্যাদি। ভবানন্দ মজুমদার ইহার উত্তর দিলেন, 'দাড়ি যদি ঈশ্বরের দান হয়, তবে মাথার চুলের কি অপরাধ, সেই চুল মুড়াইয়া মাথা নেড়া করে কেন?' ইহার জন্য মুসলমানের প্রচলিত নাম হইয়াছিল 'নেড়ে।' হিন্দু কখনও অপবিত্র বাঁ হাতে খায় না, মুসলমান সেই হাতে তসবী পর্যন্ত জপে, তৃতীয়ত, মুসলমানের বিধবাবিবাহ এমন যে, 'একে ছেড়ে গাই যেন ধবে আর ষাঁড়'। হিন্দু মুসলমানের বিশিষ্টতা ও

বিরুদ্ধতার এইসব প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমার বাল্যকালেও প্রতিদিন শুনিয়াছি। রবীন্দ্রনাথই হিন্দু বা মুসলমানের মনে সংশয়ের সৃষ্টি করিলেন।

৩। তৃতীয় দৃষ্টান্তটি দিতেছি ১৯০৪ সনের একটি রচনা হইতে যাহাতে রবীন্দ্রনাথ একটি পুরানো চিঠি উদ্ধৃত করিয়া, 'ধর্ম' সম্বন্ধে তাঁহার নিজের কি ধারণা বুঝাইতে চাহিলেন, কথাগুলি এইরূপ—

'ঠিক যাকে সাধারণে ধর্ম বলে, সেটা যে আমি আমার নিজের মধ্যে সুস্পষ্ট দৃঢ়রূপে লাভ করতে পেরেছি, তা বলতে পারিনে। কিন্তু মনের ভিতরে ভিতরে ক্রমশ যে একটা সজীব পদার্থ সৃষ্ট হয়ে উঠছে, তা অনেক সময় অনুভব করতে পারি। বিশেষ কোনো একটা নির্দিষ্ট মত নয়—একটা নিগূঢ় চেতনা, একটা নূতন অন্তরিন্দ্রিয়।'

ইহা হইতেই রবীন্দ্রনাথের ধর্মানুভূতিকে যুক্তিগোচর করিবার পথে বাধা জন্মিয়াছে। তবে যদি ধর্ম সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়োত্তর অনুভূতির কথা ধরা যায়, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনা হইতে, তাহা গদ্য, পদ্য বা গান যাহাই হউক না কেন, তাঁহার ধর্ম কি তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই ধর্মের সম্পূর্ণ আলোচনা করা এই বই-এ সম্ভব নয়, কেবল উহার কয়েকটা মূলগত দিক বিবেচনা করিব।

রবীন্দ্রনাথ কি 'মিস্টিক'?

আমি ১৯৪১ সনের এপ্রিল মাসে 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট'-এ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তাহাতে এই প্রশ্নটা তুলিয়া বলিয়াছিলাম যে, সমস্ত ইউরোপীয় ভাষায় ধর্ম সম্বন্ধীয় আলোচনাতে 'মিস্টিক' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, রবীন্দ্রনাথ সেই অর্থে 'মিস্টিক' ন'ন। উহা পড়িয়া ইন্দিরা দেবী আপত্তি করিয়াছিলেন, তিনি সর্বাংশে লেখাটির প্রশংসা করিতে পারেন নাই, বলিয়াছিলেন, 'দুই পারেরই রসিক হওয়া সম্ভব।' এই উক্তির বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলিবার ছিল না—আমার বক্তব্য শুধু এই ছিল—যে-ব্যক্তি দুই পারেরই রসিক, অর্থাৎ ইহলোক ও পরলোক দুই-এরই সার্থকতা ও মূল্য আছে মনে করে, সে ধার্মিক ও ঈশ্বরপরায়ণ হইলেও কোনো গ্রাহ্য অর্থে 'মিস্টিক' হইতে পারে না।

এই সময়ে আমি ফরাসী ভাষায় লিখিত একটি বই পড়িয়াছিলাম যাহা ফ্রান্সের লেখকদের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। বইখানা ইউরোপীয় ধর্মজীবনের ঐতিহাসিক আবে ব্রেমঁ (Abbe Bremond) প্রণীত, এবং উহার নাম 'প্রার্থনা ও কাব্য' (Priere et Poesic). ব্রেমঁ বলিলেন, কবি প্রকৃতপ্রস্তাবে 'মিস্টিক' হইতে পারেন না। তিনি অবশ্য স্বীকার করিলেন যে, কাব্যও মিস্টিসিজমের মত লোকোত্তর হইতে পারে, কিন্তু কাব্যের লোকোত্তর হওয়া আর মিস্টিসিজমের লোকোত্তর হওয়া

মানবমনের বিভিন্ন অবস্থা। ইহার প্রথম কারণ 'মিস্টিসিজম' মানুষ ও ভগবানের সম্পর্ক সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদী, কাব্য দ্বৈতবাদী—মিস্টিসিজম মানুষের স্বতন্ত্র সত্তা অস্বীকার করিয়া মানুষকে ভগবানে লীন করে অর্থাৎ মানুষকে ভগবানের সহিত ঐক্যের দিকে লইয়া যায়। কাব্য মানুষ ও ভগবানকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখে, সুতরাং মানুষকে ভগবান হইতে দূরে লইয়া যায়। দ্বিতীয় কারণ, 'মিস্টিসিজম' পার্থিব অস্তিত্বকে মায়া বলিয়া মনে করে এবং ইহাও বলে, এই মায়া নানা প্রলোভনে পূর্ণ যাহার বশে মানুষ ভগবান হইতে বিমুখ হয়; পক্ষান্তরে, পার্থিব অস্তিত্বই কাব্যের অবলম্বন, যদিও বা উহার ভাব লোকোত্তর স্তরে উঠিতে পারে। তৃতীয় কারণ মিস্টিসিজম অন্তর্মুখীন, উহাতে যে মনোভাব সৃষ্ট হয় তাহা ভাষায় প্রকাশিত হয় না, হইতে পারেও না, আর ভাষায় আবদ্ধ হইলেও উহার প্রকাশ স্বগত উক্তির মত। পক্ষান্তরে, কবি সর্বদাই শ্রোতা বা পাঠকের অপেক্ষা রাখে। এইসব কারণে ব্রেমঁ বলিয়াছিলেন—কবি মিস্টিক হইলেও স্বধর্মত্যাগী মিস্টিক, বিপথগামী মিস্টিক এমন কি কোনো ক্ষেত্রে জাল মিস্টিক। সুতরাং কাব্য ও মিস্টিসিজমের মধ্যে মূলগত পার্থক্য, এমন কি বিরোধই আছে।

মনে রাখিতে হইবে, এই কথা ব্রেমঁই প্রথম বলিলেন না। যেদিন হইতে ইউরোপীয়দের মধ্যে 'মিস্টিসিজম' সৃষ্ট হইয়াছে তখন হইতেই 'মিস্টিকরা' কবি ও কাব্যের বিরোধী। প্লেটো 'মিস্টিক' ছিলেন, সেজন্য মানুষের অকল্যাণকারী বলিয়া কবিকে তিনি তাঁহার 'রিপাবলিকে' স্থান দেন নাই। এ বিষয়ে আর কিছু না বলিয়া ইহজগৎ ও ঐহিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে খাঁটি মিস্টিকের কি ধারণা তাহার কিছু পরিচয় দিব। আরম্ভ করিব বিখ্যাত খ্রীষ্টিয় সাধক সেন্ট অগাস্টিন (খ্রীঃ ৩৫৪-৪৩০ অব্দ) হইতে। তিনি তাঁহার সুবিখ্যাত 'কনফেসন্স'-এর দশম ভাগের ৩৪ তম অধ্যায়ে লিখিলেন—

> 'আমার চক্ষু সৌন্দর্যের বিচিত্র প্রকাশকে, উজ্জ্বল ও আনন্দদায়ক বর্ণকে ভালবাসে। এই সব আমার আত্মাকে যেন অধিকার না করিয়া বসে....অথচ আমি যতক্ষণ জাগ্রত থাকি ইহারা আমার উপর প্রভাব বিস্তার করে, আমাকে কোনো নিষ্কৃতি দেয় না।'

সেজন্য তিনি প্রার্থনা করিলেন, ভগবান যেন তাঁহাকে সেই আলোক দেখিতে দেন যাহা অন্ধ টোবায়াস, আইজাক তাঁহার লুপ্তপ্রায় দৃষ্টিতে, ও জেকব তাঁহার ক্ষীণ চক্ষুতে দেখিয়াছিলেন, উহাই সত্য আলোক। অগাস্টিন আরও লিখিলেন—

> 'আমি চক্ষুর এই সব প্রলোভনকে বাধা দেই, হে ভগবান! পাছে আমার যে পাগুলি দিয়া আমি তোমার পথে চলিতে চাই, সেগুলিই ইহাদের জালে না পড়িয়া যায়।'

আরও বলিলেন—

> 'loca offerunt quod amamus et
> relinquunt in animas phantasmatum'

'নানা স্থান তাঁহাকে মুগ্ধ করে, বিক্ষিপ্তচিত্ত করে ও তাঁহার চিত্তকে কুহকে আচ্ছন্ন করে।'

এইরূপ কথা রবীন্দ্রনাথ কখনই লেখেন নাই, লিখিতে পারিতেনও না। তিনি লিখিলেন—

'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে চির তরঙ্গিত...।'

ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, ১৮৮৬ সনে এই কবিতাটি লিখিয়া জীবনের প্রায় শেষে, ১৯৪০ সনের এপ্রিল মাসে, তাঁহার এই বাসনার সমর্থন পাইলেন ঋগ্‌বেদের একটি শ্লোক হইতে যাহাতে বলা হইয়াছে—

'প্রাণের নেতা আমাকে আবার চক্ষু দিয়ো, আবার দিয়ো প্রাণ, দিও ভোগ, উচ্চবন্ত সূর্যকে আমি সর্বদা দেখব, আমাকে স্বস্তি দিও।'

রবীন্দ্রনাথ ইহার উপর মন্তব্য করিলেন, 'এই তো বন্ধুর কথা, বন্ধুর প্রকাশ ভালো লেগেছে। এর চেয়ে স্তবগান অপর আর কিছু আছে? দেবস্য পশ্য কাব্যম্। মন বলছে কাব্যকে দেখো, এ দেখার অন্ত চিন্তা করা যায় না।'

রবীন্দ্রনাথ এই সব কথা লিখিবার সময়ে বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, ঋগ্‌বেদ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই ধর্মকে কাব্যময় করিয়াছিল। আমার এই মতের সমর্থনে, ঋগ্‌বেদ হইতে উষার স্তুতির কয়েকটি ছত্র আমার কৃত ইংরেজী অনুবাদে দিতেছি—

'Immortal maiden? You who love my chaunt!
Who is the mortal, tell me, in which haunt
Enjoys you the man : For whom you, too fare
Like a red-roan, strawberry, dappled mare.
A dancer are you, in your dazzling weave;
As cows their udder, so your breasts you give!'

ঋগ্বেদ: ১ম মণ্ডল; ৩০ সূক্ত, ৯২ সূক্ত

এই ধর্মকে অগ্রাহ্য করিয়াই উপনিষদ বলিয়াছিল—'সেখানে সূর্য আলো দেয় না, চন্দ্রতারকাও নয়, অগ্নির তো কথাই নাই; তিনি তাঁহার আলোক প্রকাশ করিলে অন্য সকলে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া আলোকিত হয়, তাঁহারই আলোকে ইহলোকের সবই বিভাসিত হয়।' ইহা ঋগ্‌বেদের আলোকের অপেক্ষা সেন্ট অগাস্টিনের আলোকের বেশি নিকটবর্তী—কারণ ঋগ্‌বেদের আলোক 'মিস্টিক' নয়, উপনিষদের আলোক 'মিস্টিক'।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মজীবন, নামে উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও মূলত নয়। তাঁহার ধর্মজীবনে পরলোকের যেমন স্থান ছিল, তেমনই ইহলোকেরও ছিল। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে, সারা জীবনেও

তাঁহার পরলোকে আস্থা বিচলিত হয় নাই বা ক্ষুণ্ণ হয় নাই; তিনি জীবনে বহু দুঃখ পাইয়াছিলেন, নৈরাশ্য অনুভব করিয়াছিলেন, অন্যের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন ইহজীবনের এই সব পীড়া ও অসম্পূর্ণতা পরলোকে থাকিবে না, ইহজীবনের সমস্ত সত্যকার ঐশ্বর্য ও গৌরব পরলোকে পূর্ণতা পাইবে। তবু এই অসম্পূর্ণ ইহলোককেই তিনি সমস্ত দেহমন দিয়া অবলম্বন না করিয়া পারেন নাই। ইহাকেই ইন্দিরা দেবী 'দুই পারের রসিক হওয়া' বলিয়াছিলেন। আসলে কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে কেবলমাত্র ইহলোকের 'রসিক' বলিলে ইহলোকের প্রতি তাঁহার মনোভাবের পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হইবে না। তিনি কখনই একথাও ভুলিতে পারেন নাই যে মানুষের যে অস্তিত্ব প্রত্যক্ষগোচর, যে অস্তিত্ব তাহার সকল কামনাকে টানে, তাহা ইহলোকে মানুষমাত্রেরই জন্ম ও মৃত্যুর মাঝেকার অস্তিত্ব। এই অস্তিত্বের যে কি মূল্য তাহা একটি পুরাতন বাংলা গানে ঘোষণা করা হইয়াছিল, উহা আমি আমার মাতাকে প্রায়ই গাহিতে শুনিতাম, গানটির প্রথম ছত্রটি এই—

এমন মানব জনম আর হবে না
ভাঙলে মাথা পাষাণে!'

রবীন্দ্রনাথও মনেপ্রাণে ইহাই জানিতেন, তাই পৃথিবীর প্রতি তাঁহার আসক্তি প্রথমে যে-রূপ ধরিয়া দেখা গেল, তাহা শিশুর মাতাকে আঁকড়াইয়া থাকিবার মত, এবং এই আসক্তির বশে তিনি মনে করিলেন, পৃথিবীও মায়ের মতই তাঁহাকে বুকে বাঁধিয়া রাখিবে। সুতরাং 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে' গানটিতে তিনি লিখিলেন—

'তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি—আহা,
নতুন নামে ডাকবে মোরে, বাঁধবে নতুন বাহুডোরে,
আসব যাব চিরদিনের সেই আমি।'

কিন্তু ইহার পরও কথা আছে। মাতৃক্রোড়ে শিশু যেমন, ধরার ক্রোড়ে তিনিও তেমন, এই কল্পনা করিয়াই রবীন্দ্রনাথের পৃথিবীর প্রতি আসক্তি তৃপ্ত হয় নাই, কারণ শিশু মাতৃক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইতে পারে। তিনি চাহিয়াছিলেন পৃথিবীর সহিত আরও অবিচ্ছিন্ন, আরও নিবিড় সম্পর্ক। তাই তিনি ১২৯৯ সনের ৫ই ভাদ্র (২০ আগস্ট, ১৮৯২) তারিখের একটি চিঠিতে লিখিলেন,—

'এক সময় যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলেম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূর বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধ উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূরদূরান্তর দেশাদেশান্তরের জলস্থল ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নিচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে থাকতেম, তখন শরৎ সূর্যালোকে

আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস, যে একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত, অর্ধচেতন এবং প্রকাণ্ড বৃহৎভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে।'

কিন্তু এই কথাগুলি লিখিবার পরই যেন রবীন্দ্রনাথের মনে হইল ইহাও ঠিক নয়, ইহাতে পৃথিবীর সঙ্গে তাঁহার অন্তরতম ভালবাসার প্রকাশ হইল না, কারণ এই চিঠিতে তিনি পৃথিবীর সহিত তাঁহার সম্পর্কের অদ্বৈত রূপ প্রকাশ করিলেন, সোহম্‌কে শুধু 'সা অহম্‌' করিলেন। কর্তা ও কর্মের মধ্যে দ্বিত্ব না থাকিলে একাত্মতা হইতে পারে কিন্তু ভালবাসা হয় না। এই জন্য এই চিঠিটি লিখিবার অল্পদিন পরেই আর একটি চিঠি তিনি লিখিলেন, যাহাতে তিনি পৃথিবীর সহিত তাঁহার সম্পর্কের অন্য রূপ দেখাইলেন। এই চিঠির তারিখ ৯ ডিসেম্বর, ১৮৯২ অর্থাৎ প্রথম চিঠিটির ১১০ দিন পরে লিখিত, ইহাতে তিনি বলিলেন—

'আমি বেশ মনে করতে পারি বহুযুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্র স্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম।.....তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, নব শিশুর মতো আমার একটা অন্ধজীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তনারস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্গত হত।'

কেহ যদি মনে করেন ইহা কবিকল্পনা মাত্র, আসলে গাছ মূক এবং স্থাবর, সেজন্য পৃথিবীর সহিত তাহার সম্পর্ককে নিবিড় হইতে নিবিড়তর করিতে চায় না, সে-প্রচেষ্টা 'মূঢ়' হইলেও, তাহা একটি প্রমাণ দিয়া তাঁহার ভুল দেখাইব। কিছুদিন আগে অক্সফোর্ডে আমার বাগানে একটি ফুলের লতা পুঁতিয়াছিলাম যাহা বিশ ফুট পর্যন্ত উঠে। ঠিক ভাবে যাহাতে উঠে সেজন্য তাহার পল্লবগুলিকে আমি এক একটি দড়ির সহিত জড়িত করিয়া দিয়াছিলাম। যেদিন প্রথম জড়িত করিয়া দিয়াছিলাম তাহার পরদিন সকালে গিয়া দেখিলাম পল্লবগুলি দড়ি হইতে নিজেদের জড়ানো খুলিয়া প্রায় আট ইঞ্চি দূরে একটি লম্বা বাঁশকে ধরিয়াছে, পৃথিবীর সহিত আরও দৃঢ়ভাবে যুক্ত হইবার জন্য! আমি আবার দড়িতে জড়াইয়া দিলাম, কিন্তু পরপর তিন দিন তাহারা দড়িকে ছাড়িয়া বাঁশকে ধরিল তখন আমি লতাটিকে 'মূঢ় আনন্দে' পৃথিবীর সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে দিলাম। ইহাই পৃথিবীর সহিত রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেরও প্রতীক। ইহার বশেই তিনি এক বৎসর পরে—১৩০০ সনের ২৬শে কার্তিক—'বসুন্ধরা' কবিতাটি লিখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি বলিলেন,—

'আমাকে ফিরায়ে লহো অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে বিপুল অঞ্চল তলে।'....

ইহা যে মিস্টিকের উক্তি হইতে পারে না, তাহা সেন্ট অগাস্টিনের যে-সব উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা হইতেই বোঝা যাইবে। তবু পরবর্তী যুগের আরও দুইজন ইউরোপীয় 'মিস্টিকে'র উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। বিখ্যাত স্পেনীয় 'মিস্টিক্' সেন্ট টেরেসা (আভিলা শহরের) পনর বৎসর ধরিয়া একদিকে ঈশ্বর ও অন্যদিকে সংসারের আহ্বানের মধ্যে দ্বিধায় ছিলেন, কিন্তু তাঁহার যখন চল্লিশ বৎসর বয়স (১৫৫৫ খ্রীঃ অব্দ) তখন একদিন কাঁটার-মুকুট-পরিহিত খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তির পদতলে বসিয়া প্রার্থনা করিতে করিতে তাঁহার ঈশ্বরের সহিত মিলন ঘটিল, ইহার পর তিনি লিখিলেন, 'আমি যে মরি না, তাহাতেই মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করিতেছি।'

দ্বিতীয় উক্তি ইহার একশত বৎসর পরের—একজন ইংরেজ চিকিৎসকের। স্যর টমাস ব্রাউন লিখিলেন—

'And if any have been so happy as truly to understand Christian annihilation, ecstasies, exolution, liquefaction, transformation, the kiss of the spouse, gustation of God, and ingression into the divine shadow, they have already had a handsome anticipation of heaven; the glory of the world is surely over, and earth is as ashes into them.'

রবীন্দ্রনাথের কাছে পৃথিবী কখনই চিতাভস্মে পরিণত হয় নাই, এমন কি দেহও লোপ পায় নাই, উহা ভস্মীভূত স্থূলদেহ হইতে আনন্দময় মৃত্যুঞ্জয়ী সূক্ষ্মদেহে পরিণত হইয়াছে। ইহা কোনো যুগে 'মিস্টিকের' ধর্ম ছিল না, এমন কি অখ্রীষ্টান গ্রীক মিস্টিকেরও নয়। বিখ্যাত 'মিস্টিক্' প্লটিনাস সম্বন্ধে তাঁহার জীবনীকার পর্‌ফিরি লিখিয়াছিলেন।

'আমাদের সমসাময়িক দার্শনিক প্লটিনাস যেন দেহী হইয়াছেন বলিয়া গ্লানি অনুভব করিতেন। তাঁহার এই অনুভূতি এমন গভীর ছিল যে, তিনি কিছুতেই তাঁহার বংশ, পিতামাতা অথবা জন্মস্থান সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহিতেন না।

'কোনো চিত্রকর বা ভাস্করের সম্মুখে বসিয়া নিজের চিত্র বা মূর্তি করানো সম্বন্ধেও তিনি দুর্জয় বিরাগ দেখাইতেন...তিনি বলিতেন, "প্রকৃতি আমাকে যে মূর্তিতে আবদ্ধ করিয়াছে তাহাকে বহন করিয়া জীবনযাপন করাই কি যথেষ্ট নয় যে, আমাকে এই মূর্তিরই একটি প্রতিমূর্তিকে পরবর্তীদের জন্য বাঞ্ছনীয় বস্তু বলিয়া রাখিয়া যাইতে সম্মত হইতে হইবে?'

পার্থিব অস্তিত্ব সম্বন্ধে মিস্টিকের মনোভাব কি তাহার আরও বহু দৃষ্টান্ত দিতে পারিতাম। কিন্তু যে-কয়েকটা দিলাম তাহা হইতেই সম্ভবত বোঝা যাইবে রবীন্দ্রনাথ গ্রাহ্য অর্থে 'মিস্টিক' ছিলেন না।

রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরভক্তি

তাহা হইলে কি বলা হইল, রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরভক্তি ছিল না? মোটেই নয়, 'মিস্টিক্' এক শ্রেণীর ঈশ্বরভক্ত. প্রকৃতপ্রস্তাবে ঈশ্বরভক্ত নানা শ্রেণীর

হইয়াছে। কবীর, তুলসীদাস, সুরদাস, তুকারাম প্রমুখের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমাদের রামপ্রসাদও ঈশ্বরভক্ত ছিলেন, ঈশ্বরকে মাতৃরূপে দেখিয়া। তাঁহার সম্পর্কে অল্পবয়সে আমার অঞ্চলের এক ব্রাহ্মণের মুখে তাঁহার নিজের রচিত একটা গান শুনিয়াছিলাম,—

'তার গানে মগ্ন হয়ে শুনেছি, মা তারা।
কন্যারূপে তার বেঁধেছিল বেড়া...'

আনাতোল ফ্রাঁসেরও একটি বিখ্যাত গল্প আছে—এক জাদুকর সন্ন্যাসী হইয়া মাতা মেরীকে উপাসনা করিত। কিন্তু সাধনার উপায় না জানাতে সে চ্যাপেলে লুকাইয়া গিয়া মাতা মেরীর প্রতিমূর্তির সম্মুখে ডিগ্‌বাজী খাইত ও নানাভাবে বল ছুঁড়িয়া ধরিত, অর্থাৎ জাদুকর হিসাবে তাহার যাহা কিছু দক্ষতা ছিল তাহা মাতা মেরীকে দেখানোকেই সে পূজা বলিয়া মনে করিত। তাহার অ্যাবট্ ইহা লুকাইয়া দেখিয়া ইহাতে মেরীর অপমান হইতেছে মনে করিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে যাইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, প্রতিমূর্তির মাতা মেরী জীবন্ত মেরী হইয়া সিংহাসন হইতে নামিলেন ও পরম স্নেহভরে জাদুকরের ক্লান্ত মুখ তাঁহার অঞ্চল দিয়া মুছাইয়া দিলেন। অ্যাবট্ প্রণত হইয়া নিজেকে অধম বলিয়া মানিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

আর কিছু না ধরিলেও শুধু এ-কথা বলা সঙ্গত হইবে যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ধর্মসঙ্গীতেই প্রমাণ করিয়াছেন যে তিনি পরমতম ঈশ্বরভক্ত। তাঁহার এই ঈশ্বরভক্তির প্রকৃত রূপ কি তাহার আলোচনা আবশ্যক।

কিন্তু উহার যুক্তিগোচর সংজ্ঞা দেওয়া একেবারেই সম্ভব নয়। ইহার কারণ রবীন্দ্রনাথ নিজেই দিয়াছেন। ১৯০৪ সনে তিনি লেখেন,—

'তত্ত্ববিদ্যায় আমার কোনো অধিকার নাই। দ্বৈতবাদ-অদ্বৈতবাদের কোনো তর্ক উঠিলে আমি নিরুত্তর হইয়া থাকিব। আমি কেবল অনুভবের দিক দিয়া বলিতেছি, আমার মধ্যে আমার অন্তর্দেবতার একটি প্রকাশের আনন্দ রহিয়াছে—সেই আনন্দ সেই প্রেম আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আমার বুদ্ধি মন, আমার নিকট প্রত্যক্ষ এই বিশ্বজগৎ, আমার অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ পরিপ্লুত করিয়া বসিয়া আছে। এ লীলা তো আমি কিছুই বুঝি না, কিন্তু আমার মধ্যেই নিয়ত এই এক প্রেমের লীলা।'

ইহা অনুভূতির কথা, ভক্তির কথা, তর্কের কথা তো নয়ই, এমন কি বুদ্ধি বা জ্ঞানেরও নয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান বা গদ্য রচনা হইতে ভক্তি সম্বন্ধে তাঁহার কোনো স্পষ্ট উক্তি পাওয়া যাইবে না। তবে যদি যুক্তি বা বুদ্ধির গোচর করিতে হয়, তাঁহার 'ঈশ্বরবাদ' পিতৃদত্ত বলা যাইতে পারে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একেশ্বরবাদ যে রবীন্দ্রনাথেরও একেশ্বরবাদ সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। এখন জিজ্ঞাস্য দেবেন্দ্রনাথের ধর্মবিশ্বাস কি ছিল? দেবেন্দ্রনাথ যতদূর হিন্দুর শাস্ত্রের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা

হইতে দেখা যায়, তিনি উপনিষদের উপরই নিজের ধর্মমতকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহা দেবেন্দ্রনাথের মধ্যম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ (যিনি আই-সি-এসের প্রথম ভারতীয় কর্মচারী হইয়াছিলেন) ১৮৬৫ সনের ১৩ই মে তারিখের একটি চিঠিতে ম্যাক্সমূলারকে জানান। তিনি লেখেন, —

'The present President and Acharya of the Brahmo Samaj (দেবেন্দ্রনাথ) had his mind first awakened, and his spiritual aspirations fed, by some of the sublime portions of those wild treatises.' (Wild treatises = উপনিষদ!)

ইহার পর দেবেন্দ্রনাথ যে উপনিষদের একটি পৃষ্ঠা কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন সেই কাহিনী দিয়া সত্যেন্দ্রনাথ লিখিলেন,

'Many of the Pantheistic doctrines contained in them were easily construed into Monotheism, and the result of the president's (দেবেন্দ্রনাথের) studies was a collection of passages from several of the Upanishads, breathing sublime and pure sentiments towards the Supreme Being. This collection is called the Brahma Dharma, and may be considered as the textbook for the Liturgy and forms of worship of the Brahmos.'

সত্যেন্দ্রনাথের বয়স তখন মাত্র তেইশ, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধির প্রখরতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না। এই পত্র পাইবার পর ম্যাক্সমূলার উহা সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালের 'ডীন' ও ঐতিহাসিক মিলম্যানকে পাঠাইয়া লেখেন, "I have not written to him for some time, simply because I feel I cannot grapple with him, and he is not a man to be satisfied with words." তবুও সত্যেন্দ্রনাথ পিতার উপদেশ ও রচনা হইতে চয়ন করিয়া ব্রাহ্মধর্মের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে বাংলাতে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মধর্মকে যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ ম্যাক্সমূলারকে এই পত্রেই এইভাবে দিলেন —

1. "In the beginning there was nothing but the one true God. He it was who created the Universe.
2. He is the true, the good, and the living God; present in all time, pervading all space, infinite, omnipotent, everlasting.
3. In His worship is our true happiness in this world, and only salvation in the next.
4. Our true worship consists in loving the Lord, and fulfilling the duties, He has enjoined."

রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরে বিশ্বাসকে যতদূর তত্ত্বে পরিণত করা যায়, ইহাই যে তাঁহারও বিশ্বাস ছিল তাহা বোঝা যায়। কিন্তু তাঁহার কাছে এই সব তত্ত্ব ছিল তাঁহার সম্পূর্ণ ধর্মের কঙ্কালমাত্র, তিনি নিজের প্রবৃত্তি ও কল্পনা দ্বারা উহাকে জীবন্ত করিয়াছিলেন। অল্পবয়সে তাঁহার ধর্মবিশ্বাস কিরূপ ছিল তাহার কথা তিনি 'জীবনস্মৃতি'তে বলিয়াছেন, —

'আমাদের পরিবারে যে-ধর্মসাধনা ছিল আমার সঙ্গে তাহার কোনো সংস্রব ছিল না — আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই। আমি আমার কেবল হৃদয়াবেগের চুলাতে হাপর করিয়া মস্ত একটা

আগুন জ্বালাইতেছিলাম। সে কেবলই অগ্নিপূজা; সে কেবলই আহুতি দিয়া শিখাকেই বাড়াইয়া তোলা; তাহার আর কোনো লক্ষ্য ছিল না।'

পরে অবশ্য তিনিও তাঁহার পিতার মত নিজের ধর্মকে উপনিষদের সহিত যুক্ত করিয়াছিলেন, তবে এই যোগও তাঁহার কবিহৃদয় হইতে আসিয়াছিল, যুক্তির অপেক্ষা রাখে নাই। অনেক সংস্কৃতজ্ঞ বাঙালী বলিতেন রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ-ব্যাখ্যা তাঁহার কল্পনাপ্রসূত, এমন কি উপনিষদের অপব্যবহার। সকল বিষয়ে তাহা বলা চলে না। উপনিষদ সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় ভুল এগুলিকে দার্শনিক গ্রন্থ মনে করা। অবশ্য উপনিষদ হইতে ইচ্ছামত উক্তি চয়ন করিয়া উহাকে ইউরোপীয় দর্শনেও পরিণত করা যায়। উহাই উপনিষদের প্রকৃত অপব্যবহার। প্রকৃতপ্রস্তাবে উপনিষদ ধর্মের লোকোত্তর অনুভূতির কাব্য। তবু উপনিষদের ঈশ্বর রবীন্দ্রনাথের প্রাণের ঈশ্বর নহেন — সে-ঈশ্বর ব্রহ্ম, অপ্রমেয়, অজ্ঞেয়, গুণাতীত, মানুষের ভক্তি বা প্রেম সম্বন্ধে নিরপেক্ষ। ব্রাহ্ম ধর্মের ঈশ্বর নামে ব্রহ্ম হইলেও, তিনি ধর্মে ও কর্মে অন্য ঈশ্বর, রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরও তাহাই। সত্যেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের তত্ত্বের যে বিবরণ দিলেন তাহার মধ্যে শুধু একটি লক্ষণ — 'pervading all space' উপনিষদের pantheism হইতে গৃহীত, আর কোনও লক্ষণ নয় — উপনিষদের ব্রহ্মকে কেউ ভক্তি করিতে পারে না — এমন কি তিনি জ্ঞানেরও আয়ত্ত নহেন, —

> 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
> ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন
> যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য —
> স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনু স্যাম॥

তাহা হইলে ব্রাহ্মদের ঈশ্বর কোথা হইতে আসিয়া উপনিষদের ব্রহ্মের ছদ্মবেশ ধরিল?

অংশত হিন্দুর অনুভূতি হইতে — তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কথাটাই কেহ বলে না। হিন্দু একেশ্বরবাদের আলোচনা করিতে গিয়া কেহই হিন্দুমাত্রেরই একটা গভীর বিশ্বাসের উল্লেখ করে না। সেটা এক ঈশ্বর বা ভগবানের ধারণা। আচারে ও অনুষ্ঠানে, ধর্মের লৌকিক চর্চায় হিন্দু শুধু 'ঠাকুরদেবতা' মানিলেও এবং প্রতিদিন এবং বৎসর ব্যাপিয়া 'ঠাকুরদেবতার'ই পূজা করিলেও, এই সব 'ঠাকুরদেবতা'র উপরে এক ঈশ্বর আছেন এই বিশ্বাস সকল হিন্দুরই ছিল এবং আছে। তাহারা মনে করিয়াছে যে, তিনি বিপদে ত্রাণকর্তা, দুঃখে সান্ত্বনাদাতা, অত্যাচারীর দণ্ডদাতা ও সকলের প্রতি সমদ্রষ্টা। কিন্তু এই ভগবানের উল্লেখ হিন্দুর কোনো শাস্ত্রে নাই, তাঁহার পূজাবিধি নাই, এমন কি তাঁহার উপাসনাও নাই। কেবলমাত্র

দুঃখের দিনেই হিন্দু ইঁহাকে স্মরণ করিয়াছে, সুখের দিনে কেবলমাত্র ঠাকুরদেবতাকে ভোগ দিয়াছে। ইঁহার শরণাপন্ন না হইয়া হিন্দু মানবজীবনের অনিবার্য দুঃখ সহিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথের যিনি ঈশ্বর, তিনি যে অংশত হিন্দুর এই শাস্ত্রোত্তর অপ্রকাশিত ও অন্তর্নিহিত ঈশ্বর ছিলেন তাহাতে সন্দেহ করা চলে না। হয়ত বা ইঁহার সম্বন্ধেই তিনি পঁচিশ বৎসর বয়সে লিখিয়াছিলেন —

'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে,
হৃদয়ে তোমারে পায় না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ গোপনে।
সবাই ছেড়েছে, নাই যার কেহ, তুমি আছ তার আছে তব স্নেহ —
নিরাশ্রয় জন, পথ যার গেহ, সেও আছে তব ভবনে।'

সকল হিন্দুর মনে এই গোপন অথচ চিরজাগ্রত অনুভূতি না থাকিলে রবীন্দ্রনাথ পঁচিশ বৎসর বয়সে এই গানটি লিখিতে পারিতেন না, তাঁহার জ্ঞানযোগী পিতাও এত অভিভূত হইয়া পড়িতেন না।

কিন্তু কেবলমাত্র এই বীজটি হইতেই রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ ঈশ্বর, যাঁহার সাধনা তিনি জীবন ব্যাপিয়া করিয়াছিলেন, তাহা মহীরুহ হইয়া গগনস্পর্শী হইতে পারিত না। রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ ঈশ্বর প্রথমে আসিয়াছিল বাহির হইতে, উহার সহিত সমধর্মিতার জন্য হিন্দুর অস্ফুট ঈশ্বর অলক্ষিতে বিদেশী ঈশ্বরের সহিত মিশিয়া গেল। সেই নূতন ঈশ্বর — যাহা ব্রাহ্মদের ও রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর হইল, তাহা মূলত খ্রীষ্টধর্মের ঈশ্বর। কিন্তু ব্রাহ্মরা যে-খ্রীষ্টিয় ঈশ্বরকে গ্রহণ করিল তিনি ঠিক সেই যুগের আনুষ্ঠানিক খ্রীষ্টধর্মের ঈশ্বর ছিলেন না। প্রকৃতপ্রস্তাবে ব্রাহ্মরা আনুষ্ঠানিক খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিতে একেবারেই অনিচ্ছুক ছিল। এই ব্যাপারটা ম্যাক্সমূলার ঠিক বুঝিয়াছিলেন, তিনি লিখিয়াছিলেন —

"What I feel very deeply when I have to argue with such men, is that the christianity which conquered the world was very different from our hardened and formularized christianity and that the old tree will never bear transplanting into a new soil, though the young seed would probably grow up on Indian soil into as wonderful tree as anything we have seen as yet in the history of Europe."

প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও ঠিক এই কথাই ম্যাক্সমূলারকে লিখিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, ব্রাহ্মরা যে-ভাবে খ্রীষ্টের বাণীকে গ্রহণ করিতেছিল, তাহার সম্বন্ধেই ভারতপ্রবাসী ইংরেজ খ্রীষ্টানদের প্রবল বিরাগ। প্রতাপচন্দ্র লিখিলেন, —

"When I express my ardent love for Christ and christianity, they are kindly in sympathy, but the moment I say that Christ and this religion will have to be interpreted in India through Indian antecedents and Indian medium of thought, I am suspected of trying to bend christianity down to heathenism."

প্রতাপচন্দ্র বলিলেন, ব্রাহ্মদের সম্মুখে খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে 'আপাতদৃষ্টিতে এই সমস্যা — হয় জাতীয় স্বভাব ত্যাগ কর, নতুবা খ্রীষ্টধর্ম ত্যাগ কর। তিনি বলিলেন, আমরা এই সমস্যাকে এড়াইয়া তৃতীয় এক পন্থা ধরিতে চাই — 'Re-embody our faith and aspirations under a new name, and form, and spirit'.

এই জন্যই ব্রাহ্মেরা খ্রীষ্টধর্মের যে-রূপে আনুষ্ঠানিক জড়তা এবং মতগত গোঁড়ামি ছিল না, তাহার দিকে বেশী আকৃষ্ট হইত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলন্ড ও আমেরিকায় খ্রীষ্টধর্মের এই ধরনের একটা রূপ দেখা দিয়াছিল, উহা 'ইউনিট্যারিয়ান' খ্রীষ্টধর্ম। ইহা প্রচলিত ও খ্রীষ্টিয় সমাজে সর্বত্র স্বীকৃত ভগবানের ত্রিমূর্তি বা Trinity-তে বিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিল — এই Trinity-মতে ঈশ্বর তিনটি স্বতন্ত্র অথচ অবিচ্ছেদ্য মূর্তিতে বিভক্ত। প্রথম God the Father; দ্বিতীয় God the Son; ও তৃতীয় God the Holy Spirit (পুরাতন ইংরেজীতে Holy Ghost)। হিন্দু একেশ্বরবাদীদের কাছে ভগবানের ত্রিমূর্তি অবোধ্য ও অগ্রাহ্য বলিয়া মনে হইত, সেজন্য রামমোহন ত্রিমূর্তির মূর্তিকে 'পবিত্র ভূত' বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন। সুতরাং এই ত্রিমূর্তিধারী খ্রীষ্টিয় ঈশ্বরকে এক অবিভক্ত ঈশ্বর করার জন্য ব্রাহ্ম প্রচারকরা 'ইউনিট্যারিয়ান'-দের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইলেন। ইহা ছাড়া ইউনিট্যারিয়ানরা খ্রীষ্টের জীবনের অলৌকিক ঘটনাকেও বর্জন করিয়াছিলেন। এই সব কারণেই ব্রাহ্মরা ইউনিট্যারিয়ানদের গ্রন্থকে নিজেদেব ধর্মগ্রন্থ বলিয়াই গণ্য করিত। ইহাদের মধ্যে থিওডোর পার্কার এবং এমার্সনই প্রধান ছিলেন। 'গোরা' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ পরেশবাবুর আলমারীতে থিওডোব পার্কারের ১৪ ভল্যুমের গ্রন্থাবলী সাজানো দেখাইয়াছিলেন।

ইহা ছাড়া প্রথম হইতেই ইউনিট্যারিয়ানদের সহিত ব্রাহ্ম নেতাদের ব্যক্তিগত পরিচয় ও বন্ধুত্ব ছিল। রামমোহন রায়ের ইংরেজ বন্ধু অ্যাডাম ও জীবনীলেখিকা মিস্ কলেট্ ইউনিট্যারিয়ান ছিলেন। ইউনিট্যারিয়ান মেরী কার্পেন্টার কলিকাতায় আসিয়া ব্রাহ্মদের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন।

আমাদের অল্পবয়সে বাঙালীদের মধ্যে স্টপফোর্ড ব্রুক ইউনিট্যারিয়ান বলিয়া এমনই শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন যে, তাঁহার রচিত মিল্টনের জীবনী আই-এ ক্লাসে আমার পাঠ্যপুস্তক তো হইয়াছিল, এমন কি তাঁহার নাম একটি বাংলা গল্পেও স্থান পাইয়াছিল। ইহার জন্যই ১৯১২ সনে ইংলন্ডে আসিয়া রবীন্দ্রনাথ স্টপফোর্ড ব্রুকের সহিত সাক্ষাৎ করেন ও তাঁহার কথা শ্রদ্ধাভরে 'জীবনস্মৃতি'তে লেখেন। স্টপফোর্ড ব্রুকের বয়স তখন সত্তরের উপর, আর্টারিয়োস্ক্লেরোসিসে পঙ্গু। অনেক সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরের তলায়

গিয়া স্টপফোর্ড ব্রুকের নবীনতা দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হইয়া লিখিলেন, —

'তাঁহার দেহের আয়তন বিপুল, তাঁহার মুখশ্রী সুন্দর, কেবল তাঁহার পীড়িত পায়ের দিকে তাকাইয়া মনে হইল, অর্জুন যখন দ্রোণাচার্যের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তখন প্রণাম নিবেদনের স্বরূপ প্রথম তীর তাঁহার পায়ের তলায় ফেলিয়াছিলেন, তেমনি বার্ধক্য তাহার যুদ্ধপ্রারম্ভের প্রথম তীরটা ইহার পায়ের কাছে নিক্ষেপ করিয়াছে।'

ইহা হইতেই বোঝা যাইবে একশ্রেণীর খ্রীষ্টসেবকের প্রতি ব্রাহ্ম একেশ্বরবাদীর শ্রদ্ধা কত সুন্দর হইত।

ভক্তি না প্রেম?

সকলের শেষে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরভক্তি সম্বন্ধে একটা প্রশ্নের বিচার করিতে হইবে — ইহা ভক্তি, না প্রেম? বঙ্কিমচন্দ্রের মত তিনিও ভক্তি ও প্রেম যে দুই প্রবৃত্তি, তাহা বুঝিয়াছিলেন। তবে দুই-এর মধ্যে যে-একটা যোগ আছে, তাহাও তিনি অনুভব করিতেন। সেই জন্যই তিনি আঠারো বৎসর বয়সেও বলিয়াছিলেন যে, নারীর পতিপ্রেমের চরম বিকাশ ভক্তিতে। এখন জিজ্ঞাস্য — মানবীয় প্রেম যদি ঐশ্বরিক ভক্তি হইতে পারে, তেমনই — তবে বিপরীতমুখীন হইয়া — ঐশ্বরিক ভক্তিও কি মানবীয় প্রেমের রূপ ধারণ করিতে পারে?

ঈশ্বরপ্রেমকে মানবীয় প্রেম হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তাহা খ্রীষ্টধর্মের প্রচারকেরা প্রথম হইতেই বলিয়াছেন। বাইবেলে সেন্টজনের প্রথম পত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে আছে, —

'Beloved, let us love one another, for love is of God, and he who loves is born of God and knows God. He who does not love does not know God; for God is love.'

অবশ্য ইহা সাধারণ মানবপ্রেম, নরনারীর প্রেম নহে, তবু নরনারীর প্রেমও ইহার অন্তর্ভুক্ত। খ্রীষ্টিয় ঈশ্বরপ্রেমের মধ্যেও যে নরনারীর প্রেমের আশ্লেষ আছে তাহার কথা সুয়েডিস্ পণ্ডিত নীগ্রেন তাঁহার একখানা বিখ্যাত বই 'Agape and Eros'-এ লিখিয়াছেন।

খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাসে দেখা যায় যে, যাঁহারা চিত্রকলা অথবা ভাস্কর্যের ভিতর দিয়া খ্রীষ্টিয় প্রেমকে মূর্ত করিয়াছেন তাঁহারা প্রেমের লৌকিক রূপকে বর্জন করেন নাই। অবশ্য উহা প্রধানত দেখা গিয়াছিল বাৎসল্যরসে, তবে নরনারীর প্রেমও বাদ যায় নাই। ইহার প্রকাশ বিশেষ করিয়া দেখা গিয়াছিল 'বারোক্' যুগে। বের্নিনি (১৫৯৮-১৬৮০ খ্রীঃ অব্দ) সেন্ট টেরেসার সমাধিপ্রাপ্তির (তাঁহার ecstasy-র) একটি বিখ্যাত মূর্তি

গড়িয়াছিলেন, উহাতে ভগবদ্ভক্তির আবেশে মূর্ছিতা টেরেসার মুখ নারীর ভাবাধিগমের মুখ বলিয়া মনে হইতে পারে, পাশে যে এঞ্জেলটি তীর হাতে লইয়া সহাস্যমুখে দাঁড়াইয়া, তাহাকেও কিউপিড বলিয়া ভুল করা সম্ভব। অথচ মূর্তিটি রোমের একটি গির্জাতেই আছে।

ইহার পর হিন্দুধর্মের কথা ধরা যাক্। হিন্দুদের মধ্যে ভক্তির প্রথম আবির্ভাব দেখা গেল 'গীতা'তে — বৈষ্ণবভক্তি-রূপে। উহা নির্ভাজ ভক্তিই বটে, উহাতে নর-নারীর প্রেমের স্পর্শও লাগে নাই। কৃষ্ণ বলিলেন, —

'সর্বধর্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।'

কি-ভাবে শরণ লইতে হইবে তাহাও বলিলেন,

'মন্মনা ভব, মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু'

তিনি কি চাহেন (অথবা চাহেন না) তাহাও বলিলেন, —

'পত্রং পুষ্পং ফলং তয়োং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি,
তদহং ভক্ত্যুপহৃতম্ অশ্নামি প্রযত্নাত্মনঃ।'

এই বৈষ্ণবভক্তি 'ভাগবতে', 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে', জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' কি হইয়া গেল তাহা বলিবার আবশ্যকতা নাই, সকলেরই জানা আছে। এই রূপান্তর না হইলে চৈতন্যদেব 'ইষঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরঃ' গাহিতে গাহিতে জগন্নাথদেবের রথের সম্মুখে দৌড়িতে পারিতেন না। যে নারী রেবানদীর তীরে বেতসী তরুতলের অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়া এই প্রেমের কবিতাটি লিখিয়াছিল সে নিশ্চয়ই তাহার প্রেম এইভাবে ভক্তিতে উন্নীত হইবে তাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই।

রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরভক্তিতে এইরূপ কোনো ভাবান্তর কি দেখা গিয়াছিল? মোটেই নয়, তবে তাঁহার ঈশ্বরপ্রেম নারীর ধারণাকে বর্জন করে নাই। প্রথমত মনে রাখিতে হইবে যে, রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরের দুইটি রূপ কল্পনা করিতেন —

'একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়।
হে সুন্দর, নীড়ে তব প্রেম সুনিবিড়
প্রতিক্ষণে নানা বর্ণে, নানা গন্ধে গীতে,
মুগ্ধ প্রাণ বেষ্টন করেছে চারিভিতে।'

কিন্তু অন্যরূপে —

'তুমি হেথা আমাদের আত্মার আকাশ
অপার সঞ্চারক্ষেত্র — যেথা শুভ্র ভাস —
দিন নাই, রাত্রি নাই, নাই জনপ্রাণী, —
বর্ণ নাই, গন্ধ নাই, নাই নাই বাণী।'

সুতরাং ঈশ্বরভক্ত হিসাবে তাঁহাকে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের স্কাই-লার্কের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, —

'Ethereal minstrel! pilgrim of the sky!
Dost thou despise the earth where cares abound?

— না, পৃথিবীকে অবজ্ঞা করা যায় না — কারণ স্কাই-লার্কের স্বরূপ এই, —

'Type of the wise, who soar, but never roam —
True to the kindred points of Heaven and Home!'

এই স্বর্গমর্ত্যমুখীন ঈশ্বরভক্তির বশে রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরভক্তির মধ্যে নর-নারীর প্রেমকেও স্থান দিয়াছিলেন, তাই এই অপূর্ব ভক্তির কবিতাটিও লিখিতে পারিয়াছিলেন, —

'ওগো মা, রাজার দুলাল গেল চলি মোর ঘরের সমুখপথে,
প্রভাতের আলো ঝলিল তাহার স্বর্ণশিখর রথে।
ঘোমটা খসায়ে বাতায়ন থেকে
নিমেষের লাগি নিয়েছি, মা, দেখে —
ছিঁড়ি মণিহার ফেলেছি তাহার পথের ধূলার 'পরে।
মাগো, কী হলো তোমার, অবাক নয়নে চাহিস কিসের তরে?
মোর হার-ছেঁড়া মণি নেয় নি কুড়ায়ে,
রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে —
চাকার চিহ্ন ঘরের সমুখে পড়ে আছে শুধু আঁকা।
আমি কী দিলেম কারে জানে না সে কেউ, ধূলায় রহিল ঢাকা।
তবু রাজার দুলাল গেল চলি মোর ঘরের সমুখপথে,
মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া রহিব বল কী মতে?'

এ-যেন মীরাবাই-এর গানের লোকোত্তর রূপ! আমার মাঝে মাঝে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর হিন্দুর পুরাতন অর্ধনারীশ্বর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিলাত-যাত্রা ঃ ১৯১২ সন

রবীন্দ্রনাথ ১৮৯০ সনের পর প্রায় বাইশ বৎসর আর বিদেশে যান নাই। কিন্তু ১৯১২ সনের ২৭ মে তারিখে আবার তিনি পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রতিমাকে সঙ্গে লইয়া বিলাতযাত্রা করিলেন। ১৮৭৮ সনে ও ১৮৯০ সনে তাঁহাকে বিলাত পাঠানো হইয়াছিল একরকম জোর করিয়া; ১৮৮১ সনে তিনি বিলাত যাইবার জন্য মাদ্রাজ পর্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিলেন, আর ১৮৯০ সনে তিন মাসেরও কম বিলাত-প্রবাস যে তাঁহার অসহ্য হইয়াছিল তাহার কথা বলিয়াছি। এবারে কিন্তু তিনি বিলাত চলিলেন সম্পূর্ণ অন্য মনোভাব লইয়া। লোহিত সমুদ্রে পৌঁছিয়া জাহাজ হইতে তিনি ১৩৩৯ সনের ২১ জ্যৈষ্ঠ তারিখে (ইংরেজি ১৯১২ সনের জুন মাসের প্রথম দিকে) লিখিলেন,—

'মনের আনন্দে চলিতেছি। ....কেবলমাত্র এই চলিবার আনন্দটুকুই পাইব বলিয়া আমি বাহির হইয়াছি। অনেক দিন হইতে এই চলিবার, এই বাহির হইয়া পড়িবার একটা বেগ আমাকে উতলা করিয়া তুলিতেছিল। অনেক দিন আমাদের আশ্রমের বাড়িতে দোতলার বারান্দায় একলা বসিয়া যখন আমাদের সামনের শাল গাছগুলার উপরের আকাশের দিকে তাকাইয়াছি, তখন সেই আকাশ দূরের দিকে তাহার তর্জনী বাড়াইয়া দিয়া আমাকে সংকেত করিয়াছে। যদিও সেই আকাশটি নীরব, তবু দেশদেশান্তরের যত অপরিচিত গিরি নদী অরণ্যের আহ্বান কত দিগদিগন্তর হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া এই আকাশের নীলিমাকে পরিপূর্ণ করিয়াছে। নিঃশব্দ আকাশ বহু দূরের সেই সমস্ত মর্মরধ্বনি, সেই সমস্ত কলগুঞ্জন, আমার কাছে বহন করিয়া আনিত। আমাকে কেবলই বলিত, "চলো, চলো, বাহির হইয়া এসো।"

বিলাতযাত্রার উদ্দেশ্য

ইহার পর লিখিলেন বাহির হইয়া কি পাইবার আশা করেন,—

'তাই আমি আজ চলিয়াছি; রূপকথার রাজপুত্র যেমন হঠাৎ একদিন অকারণে সাত সমুদ্র পার হইবার জন্য বাহির হইয়া পড়িত, তেমনি করিয়া আমি আজ বাহিরে চলিয়াছি। রাজকন্যা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সে ঘুম ভাঙে না, সোনার কাঠি চাই। একই জায়গায় একই প্রথার মধ্যে বসিয়া বসিয়া জীবনের মধ্যে জড়তা আসে; সে অচেতন হইয়া পড়ে, সে কেবল আপনার শয্যাটুকুকেই আঁকড়িয়া থাকে; এই বৃহৎ পৃথিবীকে বোধ করিতেই পারে না; তখন সোনার কাঠি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে; তখনই দূরে পাড়ি দেওয়া চাই; তখন এমন একটা চেতনার দরকার যাহা আমাদের চোখের কানের মনের রুদ্ধ দ্বারে কেবলই নূতন নূতন নূতনের চিরনূতনকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবে। কী বৃহৎ, কী সুন্দর, কী উন্মুক্ত এই জগৎ! কী প্রাণ, কী আলোক, কী আনন্দ।'

এই কথাগুলি পড়িয়া নিশ্চয়ই মনে হইবে ইহার সুর ১৮৮৬ সনে 'কড়ি ও কোমল'-এ যে সুর বাজিয়াছিল তাহারই অনুবর্তন। উহার আলোচনা

করিবার সময়ে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতির সহিত একজন ফরাসী কবির অনুভূতির সাদৃশ্যের কথা বলিয়াছিলাম। অথচ ইহা নিশ্চিত যে রবীন্দ্রনাথ সেই ফরাসী কবির রচনা পড়েন নাই, সাদৃশ্যটা আসিয়াছিল সেই কবির মনোভাব ইউরোপীয় বলিয়া—যে ইউরোপীয় মনোভাবের দ্বারা রবীন্দ্রনাথও প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। এই ধরনের মনোভাব সে যুগের ইংরেজ লেখকদের মধ্যেও দেখা যাইত, একজনের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি, উক্তিটি ১৮৬৮ সনে লিখিত, হয়ত বা রবীন্দ্রনাথ উহা পড়িয়াও থাকিতে পারেন, অন্ততপক্ষে এটা বলা যাইতে পারে যে, পড়িয়া থাকুন আর নাই থাকুন, এই ইংরেজ লেখকের অনুভূতির সহিত রবীন্দ্রনাথের অনুভূতির সাদৃশ্য আছে। ইহার পরিচয় দিতেছি। এই ইংরেজটি লিখিলেন—

'In a sense it might even be said that our failure is to form habits : for, after all, habit is relative to a stereotyped world, and in the meantime it is only the roughness of the eye that makes two persons, things, situations seem alike. While all melts under out feet, we may well grasp at any exquisite passion, or any contribution to knowledge that seems by a lifted horizon to set the spirit free for a moment, or any stirring of the senses, strange dyes, strange colours, and curious odours, or work of the artist's hands, or the face of one's friend. Not to discriminate every moment some passionate attitude in those about us, and in the very brilliancy of gifts some tragic dividing of forces on their ways, is, on this short day of frost and sun, to sleep before evening'.

হিন্দু সমাজ তো অভ্যাসের দাস, আর হিন্দু মাত্রই তো দিনেও তন্দ্রাগ্রস্ত হইয়া থাকে। তাই রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন,—

'ওই যে প্রবীণ, ওই যে পরম পাকা--
চক্ষুকর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা,
ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা
অন্ধকারে বন্ধ করা খাঁচায়।'

এই কথাগুলি রবীন্দ্রনাথ এইবারের যাত্রায় বিলাত হইতে ফিরিবার মাস ছয়েক পরে লিখিয়াছিলেন, এবং এই প্রবীণদের সঙ্গ এড়াইবার জন্যই বিলাত গিয়াছিলেন। লোহিত সমুদ্রে জাহাজে থাকিবার সময়েই, জুন মাসের শেষের দিকে শান্তিনিকেতনের ছাত্র ও শিক্ষকদের কাছে তিনি বিলাতযাত্রার একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন, তাহাতেও এই ধরনের কথাই বলিয়াছিলেন, যেমন, 'বাঁধা থাকিয়া আমাদের ডানা এমনই বদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে, উড়িবার আনন্দ যে একটা আনন্দ এ কথাটা আমাদের দেশে

বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া ভাবিতে পারে না' সেজন্য তিনি নিজেই প্রায় যাচিয়া

'আমাকে অনেকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তুমি য়ুরোপে ভ্রমণ করিতে যাইতেছ কেন? এ কথার কী জবাব দিব ভাবিয়া পাই না। ভ্রমণ করাই ভ্রমণ করিতে যাইবার উদ্দেশ্য, এমন একটা সরল উত্তর যদি দিই তবে প্রশ্নকর্তারা নিশ্চয় মনে করিবেন কথাটাকে নিতান্ত হাল্কা রকম করিয়া উড়াইয়া দিলাম। ফলাফল বিচার করিয়া লাভ-লোকসানের হিসাব না ধরিয়া দিতে পারিলে. মানুষকে ঠাণ্ডা করা যায় না।'

ইহার পর আগে বিলাত যাওয়া এবং এখন বিলাত যাওয়ার মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহার কথা বলিলেন,—

'অল্প বয়সে যখন বিদেশে গিয়াছিলাম তখন তাহার মধ্যে একটা আর্থিক উদ্দেশ্য ছিল, সিভিল সার্ভিসে প্রবেশের বা ব্যারিস্টার হওয়ার চেষ্টা একটা ভালো কৈফিয়ৎ—কিন্তু বাহান্ন বৎসর বয়সে সে কৈফিয়ৎ খাটে না, এখন কোনো পারমার্থিক উদ্দেশ্যের দোহাই দিতে হইবে।'

কিন্তু ইহাতেও আপত্তি উঠিতে পারে বুঝিয়া অথবা উঠিয়াছে দেখিয়া তিনি লিখিলেন,—

'আধ্যাত্মিক উন্নতিব জন্য ভ্রমণের প্রয়োজন আছে, এ কথাটা আমাদের দেশের লোকেরা মানিয়া থাকে। সেইজন্য কেহ কেহ কল্পনা করিতেছেন, এ বয়সে আমার যাত্রার উদ্দেশ্য তাহাই। এই জন্য তাঁহারা আশ্চর্য হইতেছেন, সে উদ্দেশ্য য়ুরোপে সাধিত হইবে কি করিয়া। এই ভাবতবর্ষেব তীর্থে ঘুরিয়া এখানকার সাধু-সাধকদের সঙ্গ লাভ করাই একমাত্র মুক্তির উপায়।'

ইহার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'কেবলমাত্র বাহির হইয়া পড়াই আমার উদ্দেশ্য।' তবে আর একটা ইঙ্গিতও করিলেন, বলিলেন—'তবু এ কথাও আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, লাভের প্রতিও আমার লোভ আছে; কেবল সুখ নহে, এই ভ্রমণের সঙ্কল্পের মধ্যে প্রয়োজন সাধনেরও একটা ইচ্ছা গভীরভাবে লুকানো রহিয়াছে।'

এই ধরনের ইঙ্গিত তিনি শান্তিনিকেতনের আশ্রমবাসীদের কাছেও করিলেন, লিখিলেন,—

'মানুষের জগতের সঙ্গে আমাদের এই মাঠের বিদ্যালয়ের সম্বন্ধটিকে অবারিত করিবার জন্য পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার প্রয়োজন অনুভব করি। আমরা সেই বড়ো পৃথিবীর নিমন্ত্রণের পত্র পাইয়াছি। কিন্তু সেই নিমন্ত্রণ তো বিদ্যালয়ের দুই শো ছাত্র মিলিয়া রক্ষা করিতে যাইতে পারিব না। তাই স্থির করিয়াছিলাম তোমাদের হইয়া আমি একলাই এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসিব। আমার একলার মধ্যেই তোমাদের সকলের ভ্রমণ সারিয়া লইব। যখন আবার তোমাদের আশ্রমে ফিরিয়া আসিব তখন বাহিরের পৃথিবীটাকে আমার জীবনের মধ্যে অনেকটা পরিমাণে ভরিয়া আনিতে পারিব।'

কি ভাবে? এই প্রশ্নের উত্তরও তিনি সেই দিনই দিলেন।

ইউরোপে যাওয়া তীর্থযাত্রা

রবীন্দ্রনাথ নিজের ইউরোপযাত্রার এই পরিচয় দিলেন যে, উহা তাঁহার কাছে তীর্থযাত্রা। তিনি বলিলেন,

'য়ুরোপে গিয়া সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে আমরা সত্যকে প্রত্যক্ষ করিব, এই শ্রদ্ধাটি লইয়া যদি আমরা সেখানে যাত্রা করি তবে ভারতবাসীর পক্ষে এমন তীর্থ পৃথিবীতে কোথায় মিলিবে?' সংস্কারমুক্ত হইবার পথে দেশে যে প্রবল বাধা আছে ইহা মানিয়া লইয়া তিনি লিখিলেন, 'যাহা অভ্যস্ত তাহাকেই বড় সত্য বলিয়া মানা ও যাহা অনভ্যস্ত তাহাকেই তুচ্ছ বা মিথ্যা বলিয়া বর্জন করা, ইহাই দীনাত্মার লক্ষণ।'

তিনি ইহাও বলিলেন যে, ইউরোপ হইতে যাঁহারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিতে আসেন তাঁহাদের এই সঙ্কীর্ণতা নাই। তিনি লিখিলেন,

'ভারতবর্ষে আমি শ্রদ্ধাপরায়ণ যে য়ুরোপীয় তীর্থযাত্রীদিগকে দেখিয়াছি আমাদের দুর্গতি যে তাঁহাদের চোখে পড়ে নাই তাহা নহে। কিন্তু সেই ধূলায় তাঁহাদিগকে অন্ধ করিতে পারে নাই, জীর্ণ আবরণের আড়ালেও ভারতবর্ষের অন্তরতম সত্যকে তাঁহারা দেখিয়াছেন।'

ইহার একটি দৃষ্টান্ত তিনি দিলেন, লিখিলেন,—

'য়ুরোপের যাঁহারা অসামান্য লোক তাঁহাদের কথা আমরা বইয়ে পড়িয়াছি, তাঁহাদিগকে কাছে দেখি নাই। কাছে যে দুই-একজনকে দেখিয়াছি য়ুরোপের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহারা স্থান পান নাই। অনেকদিন হইল একটি সুইডেনের মানুষকে দেখিয়াছিলাম, তাঁহার নাম হ্যামারগ্রেন। তিনি সেই দূরদেশে বসিয়া দৈবক্রমে রামমোহন রায়ের কি একটুকু পরিচয় কোনো একটা বইয়ে পাইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার মনে এমন একটি ভক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাঁহার দারিদ্র্য সত্ত্বেও দেশ ছাড়িয়া তিনি বহুকষ্টে সমুদ্র পার হইয়া এই বাংলাদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানকার ভাষা জানিতেন না, মানুষকে চিনিতেন না, তবু বাঙালীর বাড়িতেই আশ্রয় লইয়া এই রামমোহনের দেশকেই তিনি বরণ করিয়া লইলেন। যে অল্প কয়দিন বাঁচিয়াছিলেন, কী দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিয়া, কী নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে, অথচ কী সম্পূর্ণ নম্রতার মধ্যে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, তিনি এই দেশের হিতের জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা কখনোই ভুলিতে পারিবেন না। নিমতলার ঘাটে তাঁহার মৃতদেহ দাহ করা হইয়াছিল, তদুপলক্ষে. হিন্দুর শ্মশান কলুষিত করা হইল বলিয়া আমাদের কোনো সাপ্তাহিক পত্র ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিল।'

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ভগিনী নিবেদিতারও উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি ইহাও বলিলেন যে, এই দুইটি ভক্তের আত্মদানের পিছনে 'তাঁহাদের জীবনের কোনো পূর্বাভ্যস্ত সহজ পথ তাঁহাদের সম্মুখে ছিল না, যেখানে তাঁহাদের হৃদয়মনের আজন্ম কালের সংস্কার পদে পদে কঠোর বাধা পাইয়াছে, সেখানে কেবল যে তাঁহারা আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন তাহা নহে, পদে পদে আত্মোৎসর্গের পথ তাঁহাদের নিজেকে খনন করিয়া চলিতে হইয়াছে—কেননা, তাঁহাদের প্রবেশের পথ চারিদিকেই অবরুদ্ধ।'

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—আত্মোৎসর্গ করিবার এই শক্তি কি আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাই? অর্থাৎ দেখা যায় না।

অবশ্য ইউরোপকে সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে দেখিবার পথে কি বাধা আমাদের সম্মুখে ছিল তাহা রবীন্দ্রনাথ ভাল করিয়াই জানিতেন। প্রথম বাধা, আমাদের ইংরেজের অধীনতা। তিনি লিখিলেন,—

'আমি জানি, য়ুরোপের সঙ্গে এক জায়গায় আমাদের স্বার্থের সংঘাত ঘটিয়াছে এবং সেই সংঘাতে আমাদিগকে অন্তরে বাহিরে অনেক স্থলে গভীর বেদনা পাইতে হইতেছে। ....আমাদের পক্ষে এই বেদনার উপলক্ষ্য যাহারা তাহাদের ক্ষুদ্রতা ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় আমরা নানা আকারে পাইয়া থাকি। ....এই কারণেই আমাদের সেই ক্ষতবেদনা লইয়া য়ুরোপের সত্যকে দেখিতে ও তাহাকে গ্রহণ করিতে আমরা অন্তরের মধ্যে বাধা পাইয়া থাকি। তাহাদের ধর্মকেও আমরা অবিশ্বাস করি ও তাহাদের সভ্যতাকেও আমরা বস্তুজাল-জড়িত স্থূল পদার্থ বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকি।'

সহজ কথায়, নিজের দেশে ইংরেজ শাসকের নীচতা ও অহঙ্কার দেখিয়া আমরা ইউরোপীয় সভ্যতাকেই অস্বীকার করি। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, এই সব বাধা নিশ্চয়ই আছে, তবু 'বাধার দুঃখকে সহ্য করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে; আত্ম-অভিমানের ব্যর্থ বোঝাকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে হইবে, অথচ আত্মগৌরবের পাথেয়কে একান্ত যত্নে রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। বস্তুত, অত্যন্ত বিঘ্নের দ্বারাই আমরা এই তীর্থযাত্রার পূর্ণ ফললাভের আশা করিতে পারি।'

দ্বিতীয় বাধা কি, রবীন্দ্রনাথ এইভাবে পরিচয় দিলেন,

'য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তুগত, তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নাই, এই একটা বুলি চারিদিকে প্রচলিত হইয়াছে। যে-কারণেই হউক এইরূপ জনশ্রুতি যখন প্রচার লাভ করিতে আরম্ভ করে তখন তাহার আর সত্য হওয়ার প্রয়োজন থাকে না। পাঁচজনে যাহা বলে যষ্ঠ ব্যক্তির তাহা উচ্চারণ করিতে বাধে না এবং নানা কণ্ঠের আবৃত্তিই তখন যুক্তির স্থান অধিকার করে।'

ইহার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন,—

'মানব সমাজে যেখানেই আমরা যে কোনো মঙ্গল দেখি না কেন তাহার গোড়াতেই আধ্যাত্মিক শক্তি আছে। অর্থাৎ, মানুষ কখনোই সত্যকে কল দিয়া পাইতে পারে না, তাহাকে আত্মা দিয়াই লাভ করিতে হয়। য়ুরোপে যদি আমরা মানুষের কোনো উন্নতি দেখি তবে নিশ্চয়ই জানিতে হইবে, সে উন্নতির মূলে মানুষের আত্মা আছে—কখনোই তাহা জড়ের সৃষ্টি নহে। বাহিরের বিকাশে আত্মারই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।.......

'বাহিরকেই চরম করিয়া দেখিলে ভিতরকে দেখা হয় না এবং বাহিরকেও সত্যরূপে গ্রহণ করা অসম্ভব হয়। য়ুরোপেরও একটা ভিতর আছে, তাহারও একটা আত্মা আছে, এবং সে আত্মা দুর্বল নহে। য়ুরোপের সেই আধ্যাত্মিকতাকে যখন দেখিব তখনই তাহার সত্যকেও দেখিতে পাইব— তখনই এমন একটি পদার্থকে জানিতে পারিব যাহাকে আত্মার মধ্যে গ্রহণ করা যায়, যাহা কেবল বস্তু নহে, যাহা কেবল বিদ্যা নহে, যাহা আনন্দ।'

ইউরোপের জড়বাদ ও ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতা

ইউরোপীয়রা 'জড়বাদী' এবং আমরা হিন্দুরা 'আধ্যাত্মিক' এই কথা বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করা যে অযৌক্তিক তাহা বুঝাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয়দের ও আমাদের আচরণ হইতে যে দৃষ্টান্ত দিলেন তাহা একদিকে অপ্রত্যাশিত, কিন্তু অন্যদিকে মানবজীবন সম্বন্ধে তাঁহার গভীর অনুভূতির পরিচায়ক।

ইউরোপীয়দের আচরণের দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, ১৯১২ সনের প্রথম দিকে 'টাইটানিক' জাহাজ ডুবি হইতে। তিনি লিখিলেন,—

'সেই জাহাজ অর্ধরাত্রে চলমান হিমশৈলে ঠেকিয়া যখন ডুবিবার উপক্রম করিল, তখন অধিকাংশ য়ুরোপীয় ও আমেরিকান যাত্রী নিজের জীবনরক্ষার প্রতি ব্যাকুলতা প্রকাশ না করিয়া স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই প্রচণ্ড অপমৃত্যুর অভিঘাতে য়ুরোপের বাহিরের আবরণ সরিয়া যাওয়াতে আমরা এক মুহূর্তে তাহার অন্তরতম মানবাত্মার একটি সত্য মূর্তি দেখিতে পাইয়াছি।'

আরও স্পষ্ট করিবার জন্য তিনি লিখিলেন,—

'আত্মত্যাগের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কি কোনো যোগ নাই? এটা কি ধর্মবলেরই একটা লক্ষণ নহে? আধ্যাত্মিকতা কি কেবল জনসঙ্গ বর্জন করিয়া শুচি হইয়া থাকে এবং নাম জপ করে, আধ্যাত্মিক শক্তিই কি মানুষকে বীর্য দান করে না?'

'টাইটানিক'-ডুবির সময় মানবচরিত্রের যে একটা বিশিষ্টতা দেখা গেল তাহার কথা তিনি এইভাবে লিখিলেন—

'ইহাতে কোনো-একজন মানুষের অসামান্যতা প্রকাশ হইয়াছে এমন নহে। সকলের চেয়ে আশ্চর্য এই যে, যাহারা লক্ষ্মীর ক্রোড়ে লালিত ক্রোড়পতি, যাহারা টাকার জোরে চিরকাল নিজেকে অন্য সকলের চেয়ে বেশী বলিয়াই মনে করিয়া আসিয়াছে, ভোগে যাহারা বাধা পায় নাই এবং রোগে বিপদে যাহারা আপনাকে বাঁচাইবার সুযোগ অন্য সকলের চেয়ে সহজে লাভ করিয়া আসিয়াছে, তাহারা ইচ্ছা করিয়া দুর্বলকে, অক্ষমকে বাঁচিবার পথ ছাড়িয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে। এরূপ ক্রোড়পতি এ জাহাজে কেবল এক-আধজন মাত্র ছিল না।........এই বীরত্ব আকস্মিক নয়, ব্যক্তিগত নয়, সমস্ত জাতির বহুদিনের তপস্যার সহিত আধ্যাত্মিক শক্তি ভীষণ পরীক্ষায় মৃত্যুর উপরে জয়লাভ করিল।'

ইউরোপীয়দের এই আচরণের সহিত রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর আচরণের তুলনা করিলেন তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে চারটি দৃষ্টান্ত দিয়া। সেগুলি কি তাঁহার ভাষাতেই দিতেছি।

১। 'এই ঘটনার ['টাইটানিক'-ডুবির] অনতিকালের মধ্যে আমাদের কয়েকজন বন্ধু ঢাকা হইতে স্টীমারে করিয়া ফিরিতেছিলেন। স্টীমারের আঘাতে পদ্মার মাঝখানে একটা নৌকা ডুবিয়া গেল, তাহার তিনজন আরোহী জলের মধ্যে পড়িল। অনতিদূরে পাশ দিয়া আর-একখানা নৌকা চলিয়া যাইতেছিল—জাহাজের সকল লোক মিলিয়া চীৎকার করিয়া

উদ্ধারের জন্য তাহার মাঝিকে বিস্তর ডাকাডাকি করিল, সে কর্ণপাত মাত্র না করিয়া চলিয়া গেল, বিপদের কোনো আশঙ্কা ছিল না, নিকটেও সে ছিল, কাজটাকে কোনোমতেই দুঃসাধ্য বলা চলে না।'

২। 'আমার আর একদিনের কথা মনে পড়িল। রাত্রে প্রবল ঝড় হইয়া গিয়াছে। সকালবেলা বাতাসের বেগ কমিয়া গেছে, কিন্তু নদী চঞ্চল। গোরাই নদীর তীরে আমার বোট বাঁধা; হঠাৎ মনে হইল, নদীর মাঝখান দিয়া স্ত্রীলোকের দেহ ভাসিয়া চলিয়াছে, জলের উপরে চুল এলাইয়া পড়িয়াছে, আর কিছুই দেখা যায় না। ঘাটের কাছে যাহারা ছিল আমি সকলকে ডাকিয়া বলিলাম, "আমার ছোটো লাইফ-বোটটি বাহিয়া উহাকে উদ্ধার করিয়া আনো, কী জানি হয়ত বাঁচিয়া আছে।" কেহই অগ্রসর হইল না। আমি বলিলাম, "যে-কেহ যাইবে প্রত্যেককে আমি পাঁচ টাকা পুরস্কার দিব।" তখনই কয়েকজন লোক নৌকা ভাসাইয়া দিয়া তাহাকে তুলিয়া আনিল, এবং মূর্ছিত স্ত্রীলোকটি ক্রমশ চেতনা লাভ করিল। পুবস্কারেব আশা না থাকিলে কেহই যাইত না।'

৩। তৃতীয় দৃষ্টান্ত তাঁহার নিজের দুর্বিপাকের। তাঁহার বজরা একটা বিলের ভিতর দিয়া যাইবার সময়ে জেলেদের পোঁতা খোঁটায় আটকাইয়া গিয়া সঙ্কটে পড়িল। এখন তাঁহার কথাই উদ্ধৃত করি। 'আট-দশ হাত দূবেই জেলেবা মাছ ধরিতেছিল। আমাদের সাহায্য করিবার জন্য তাহাদিগকে ডাকাডাকি করা গেল, তাহারা তাকাইয়াও দেখিল না। বোটের মাঝি পুরস্কার কবুল করিল। তাহারা ডাক বাড়াই বাব প্রত্যাশায বধিরতার ভান করিল। ডাক বাড়িয়া যখন বেশ একটা মোটা অঙ্কে উঠিযাছে তখন জেলেদের শ্রবণশক্তির বাধা সম্পূর্ণ দূর হইয়া গেল। অথচ তাহাদেরই কৃতকর্মের ফল আমরা ভোগ করিতেছিলাম।'

৪। এই দৃষ্টান্তটিও তাঁহারই ভাষায় দিতেছি। 'বোলপুবেব বাজারে একটা দোকানে যখন আগুন লাগিয়াছিল এখন তোমাদেব মনে আছে, আগুন নিবাইবার কাজে চারজন বিদেশী কাবুলী তোমাদেব সাহায্য করিয়াছে, পাড়ার লোককে ডাকিয়া সাড়া পাও নাই। মনে আছে, যাহাদের নিকট কলসী চাহিতে গিয়াছিলে তাহারা, পাছে তাহাদের কলস অপবিত্র হইয়া নষ্ট হয়, এ জন্য দিতে চাহিল না।'

এই ঘটনাগুলির কথা বলিয়া রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করিলেন,—

'আমরা চারিদিকে এই আত্মত্যাগের কার্পণ্য দেখিতে পাই, দৃষ্টান্তবাহুল্যের দ্বারা তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে না। কেন না আমরা মুখে যে যাহাই বলি না কেন, অন্তত মনে মনে আমাদের চরিত্রের এই দৈন্য সকলেই স্বীকার করিয়া থাকি।'

নিশ্চয়ই উহা সর্বজনবিদিত ছিল। তাই বঙ্কিমচন্দ্র নবকুমারকে নদীতীরে পরিত্যাগের কাহিনী লিখিয়াছিলেন। অপরপক্ষে আত্মত্যাগের ধারা না-থাকিবার জন্যই ১৯০৭ বা ১৯০৮ সনে ভবানীপুর চক্রবেড়িয়া রোডের একটি 'ম্যান-হোলে' ধাঙ্গড়কে বাঁচাইবার জন্য যখন নফরচন্দ্র কুণ্ডু প্রাণ দিয়াছিলেন, তখন সারা বাংলা দেশে সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। আমরা তখন বালক, ১৯০৯ সনে শিয়ালদহ হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে কালীঘাট যাইতেছি। যাইতে যাইতে, যতদূর মনে হয় প্র্যাট মেমোরিয়াল স্কুলের কাছে, যখন নফর কুণ্ডের স্মৃতিস্তম্ভটি দেখিতে পাইলাম, তখন চীৎকার করিতে লাগিলাম। বাঙালীদের জাতিগত নির্মমতা আসিয়াছে তাহাদের চরিত্রের দুর্বলতা হইতে, তাহাদের মানসিক দুর্বলতা শারীরিক দুর্বলতার তুলনায় অনেক বেশী। একটা সংস্কৃত প্রবাদ আছে, 'ক্ষীণা জনা নিষ্করুণা ভবন্তি।'

রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর আত্মত্যাগে বিমুখতার এই সকল দৃষ্টান্ত দিয়া ইউরোপীয়দের মধ্যে আত্মত্যাগের প্রবৃত্তি কোথা হইতে আসিল তাহার কারণ দিলেন, বলিলেন —

> 'খ্রিষ্টের জীবনবৃক্ষ হইতে যে ধর্মবীজ য়ুরোপের চিত্তক্ষেত্রে পড়িয়াছে তাহাই সেখানে এমন করিয়া ফলবান হইয়া উঠিয়াছে। সেই বীজের মধ্যে যে জীবনীশক্তি আছে সেটি কি? সেটি দুঃখকে পরম ধন বলিয়া গ্রহণ করা।'

ইউরোপীয়রা বিংশশতাব্দীতে, নিজেদের অবিশ্বাস সত্ত্বেও, কি করিয়া খ্রিষ্টের বাণী পালন করিতেছে, তাহার কথা রবীন্দ্রনাথ এইভাবে বলিলেন,

> 'স্বর্গের দয়া যে মানুষের প্রেমে মানুষের সমস্ত দুঃখকে আপনার করিয়া লয়, এই কথাটি আজ বহুশত বৎসর ধরিয়া নানা মন্ত্রে অনুষ্ঠানে সঙ্গীতে য়ুরোপ শুনিয়া আসিতেছে। শুনিতে শুনিতে এই আইডিয়াটি তাহার এমন একটি গভীর মর্মস্থানকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে যাহা চেতনারও অন্তরালবর্তী অতিচেতনার দেশ—সেইখানকার গোপন নিস্তব্ধতার মধ্য হইতে মানুষের সমস্ত বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে — সেই অগোচর গভীরতার মধ্যেই মানুষের সমস্ত ঐশ্বর্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়।'

ইহার পরও কথা আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন,—

> 'সেইজন্য আজ য়ুরোপে সর্বদা এই একটা আশ্চর্য ঘটনা দেখিতে পাই, যাহারা মুখে খ্রিষ্টধর্মকে অমান্য করে এবং জড়বাদের জয় ঘোষণা করিয়া বেড়ায় তাহারাও সময় উপস্থিত হইলে ধনে প্রাণে আপনাকে এমন করিয়া ত্যাগ করে, নিন্দাকে দুঃখকে এমন বীরের মত বহন করে যে, তখনি বুঝা যায় তাহারা নিজের অজ্ঞাতসারেও মৃত্যুর উপরে অমৃতকে স্বীকার করে এবং সুখের উপরে মঙ্গলকেই সত্য বলিয়া মানে।'

এই প্রসঙ্গে আমারও একটা কৈফিয়ৎ দিবার আছে—আমি রবীন্দ্রনাথের এই সব মতামত এত সবিস্তারে উদ্ধৃত করিতেছি কেন। প্রথম কারণ ইহার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের অন্তরতম বাণী আছে, এই বাণী স্মরণ করিলে বাঙালী

তাহার বর্তমান অপরিসীম হেয়তা হইতে উদ্ধার পাইবার নির্দেশ পাইবে। দ্বিতীয় কারণ এই—আজ আমাদের জাতীয়তাবোধ যে-রূপ ধারণ করিয়াছে তাহা জাতীয়তার রূপান্তর—ঘৃণ্যতম এবং ঘোরতর তামসিক মূর্তিতে—এবং রবীন্দ্রনাথকে এই জাতীয়তার প্রচারক না হইলেও সমর্থক বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা চলিতেছে। আমি দেখাইতে চাহিতেছি, রবীন্দ্রনাথ এই অপদেবতার পূজা করেন নাই, স্বার্থের জন্য উহার পূজারী ব্রাহ্মণও হন নাই।

বিলাতে কি পাইলেন

রবীন্দ্রনাথ যখন ইউরোপ সম্বন্ধে এই সব মত প্রকাশ করিলেন (১৩১৯ সালের আষাঢ় মাস, ১৯১২ সালের জুন মাস) তখন তিনি বহুকাল ইউরোপে যান নাই, ইউরোপ সম্বন্ধে পড়িয়াই তাঁহার এইসব ধারণা জন্মিয়াছিল। ইহার জন্য প্রথমত একটা বিপদের সম্ভাবনা ছিল যে, বিলাতে পৌঁছিবার পর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে তাঁহাকে নিরাশ হইয়া মত পরিবর্তন না করিতে হয়। দ্বিতীয় একটা বিপদ হওয়া প্রায় অবশ্যম্ভাবী ছিল—দেশের লোক তাঁহাকে দেশদ্রোহী বলিয়া মনে করিবে। আমি আগেই বলিয়াছি যে, হিন্দু কোনো হিন্দুর মুখে হিন্দুর দোষ ধরা শুনিতে চায় না; এর চেয়েও অকাট্য সত্য এইটা যে, হিন্দুর মুখে অহিন্দুর, বিশেষ করিয়া ইংরেজের প্রশংসা কখনই ক্ষমা করে না।

দ্বিতীয় বিপদ এড়াইবার কোনো উপায় রবীন্দ্রনাথের ছিল না, কিন্তু প্রথম বিপদটা এইবার বিলাত দেখার ফলে তাঁহার সম্মুখে দেখা দিল না। তিনি এবারের বিলাতপ্রবাস হইতে অবিমিশ্র সুখই পাইলেন। এই সুখের অনুভূতি হইতেই ১৯১৩ সালের মে-মাসে দেশে ফিরিবার প্রাক্কালে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাকে লিখিলেন,—

> 'যখন ভেবে দেখি দেশে ফিরে গিয়ে চারিদিক থেকে কত ছোট কথাই শুনতে হবে, কত বিরোধ-বিদ্বেষ, কত নিন্দাগ্লানি—তখন মনে মনে ভাবি আরও কিছুদিন যাক্, যতদিন পারি এই সমস্ত কাকলি থেকে দূরে সরে থাকি।'

দেশে তাঁহাকে কি দেখিতে ও শুনিতে হইয়াছিল তাহার কথা সবিস্তারে পরে বলিব। এখন দেখাইব এইবারের বিলাতপ্রবাসে তাঁহার সুখের কারণ কি হইল।

সপ্তম অধ্যায়

বিলাতে আনন্দ

রবীন্দ্রনাথ লোহিতসমুদ্র হইতেই যখন বিলাতযাত্রা সম্বন্ধে উৎসাহ প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন পর্যন্ত তাঁহার মনে এই ধারণাটা জাগেও নাই যে, এইবারের বিলাতপ্রবাসে আনন্দ পাইবার একটি উপকরণ তাঁহার মালপত্রের মধ্যেই রহিয়াছে। সে সময়ে শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের তিনি যে লিখিয়াছিলেন, 'যখন ফিরিয়া আসিব তখন বাহিরের পৃথিবীটাকে আমার জীবনের মধ্যে অনেকটা পরিমাণে ভরিয়া আনিতে পারিব', উহা আমি উদ্ধৃত করিয়াছি। সেটা তিনি পারিলেন বটে, কিন্তু উহার অতিরিক্ত বাহিরের পৃথিবীকে কিছু দিয়াও আসিলেন — একটি গানে তিনি যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন যেন উহাকেই সার্থক করিলেন, —

> 'হৃদয় আমার চায় যে দিতে, কেবল নিতে নয়,
> বয়ে বয়ে বেড়ায় সে তার যা কিছু সঞ্চয়।'

সেই সঞ্চয়টি তাঁহার সঙ্গেই ছিল। উহা ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি'-র পাণ্ডুলিপি।

একটা খেয়ালের বশে লিখিত এই পাণ্ডুলিপিটি তাঁহার জীবনের পরবর্তী ধারাকে যে অকল্পনীয় নূতন খাতে বহমান করিবে, তাহা রবীন্দ্রনাথ বুঝেন নাই। তিনি যাইতেছিলেন শুধু ইউরোপ হইতে তাঁহার পরিচিত জীবনযাত্রার পাথেয় সংগ্রহ করিবার জন্য। কিন্তু ফল ঘটিল অন্য রকমের।

বিলাতে পদার্পণ

উহার কথা বলিবার আগে প্রথম হইতেই ইউরোপ দেখিয়া যে-আনন্দ পাইলেন তাহার পরিচয় দিব। মার্সেলসে জাহাজ হইতে নামিয়া প্যারিসে গেলেন, সেখানে একদিনমাত্র থাকিয়া কি অনুভূতি হইল উহার কথা এইভাবে লিখিলেন, —

> 'বাহির হইতে দেখিলে মনে হয়, প্যারিস সমস্ত য়ুরোপের খেলাঘর। এখানে রঙ্গশালার প্রদীপ আর নেবে না। চারিদিকে আমোদআহ্লাদের বিরাট আয়োজন। ...
>
> 'এই মানুষরাজার আমোদ এমন প্রকাণ্ড, এমন বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহাকে অলস বিলাসীর প্রমোদের সঙ্গে তুলনা করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ইহা প্রবল চিত্তের প্রবল আমোদ ... ইহার ভিতর হইতে মানুষের যে-একটা বিজয়ী শক্তির মূর্তি দেখা যাইতেছে, তাহাকে অবজ্ঞা করিতে পারি না।'

আমি শুধু যোগ করিব — ইহা অন্য সব ছাড়া শুধু তুলুজ-লোত্রেকের প্যারিস হইলেও অবজ্ঞার লক্ষ্য হইতে পারে না। তাহার পর ইংলিশ

চ্যানেলে পাড়ি দিয়া ডোভারে যখন পৌঁছিলেন তখন মনেব ভাব কি হইল তাহার কথা লিখিলেন, —

'সেখানে ইংরেজযাত্রীর সঙ্গে যখন রেলগাড়ীতে চড়িয়া বসিলাম তখন মনের মধ্যে ভারী একটি আরাম বোধ হইল। মনে হইল আত্মীয়দের মধ্যে আসিয়াছি।'

কেন? উত্তর, —

'ইংবেজেব যে ভাষা জানি। মানুষেব ভাষা যে আলোর মতো। এই ভাষা যত দূর ছড়ায় তত দূর মানুষের হৃদয় আপনি আপনাকে প্রকাশ করিয়া চলে। ইংবেজেব ভাষা যখনই পাইয়াছি তখনই ইংরেজের মন পাইয়াছি। যাহা জানা যায় তাহাতেই আনন্দ। ফ্রান্সে আমার পক্ষে কেবল চোখের জানা ছিল, কিন্তু হৃদয়ের জানা হইতে বঞ্চিত ছিলাম — সেইজন্যেই আনন্দের ব্যাঘাত হইতেছিল। ডোভারে পা দিতেই আমার মনে হইল সে ব্যাঘাত আমার কাটিয়া গেল যেখানে দাঁড়াইলাম সেখানে কেবল মাটির উপর দাঁড়াইলাম তাহা নহে, মানুষের হৃদযেব মধ্যে প্রবেশ করিলাম।'

লন্ডনে পৌঁছিয়া প্রথমে একটি হোটেলে উঠিলেন, মোটেই ভাল লাগিল না। তিনি বলিলেন, 'যাহাদের বাসস্থান নাই, কেবল কর্মস্থানই আছে, তাহাদেরই পক্ষে হোটেল মানায়। যাহারা আমাব মতো নিতান্ত অনাবশ্যক লোক তাহাদের পক্ষে বাসের আয়োজনটা এমনতরো পাইকারী রকমের হইলে পোষায় না।' বাহিরের দৃশ্য দেখিয়াও আশ্বস্ত হইলেন না —

'জানালা খুলিয়া দেখি, জনস্রোত নানাদিকে ছুটিয়াছে। মনে মনে ভাবি, ইহাবা যেন কোন এক অদৃশ্য কারিগরের হাতুড়ি। যে-জিনিসটা গড়িয়া উঠিতেছে সেটাও মোটের উপর অদৃশ্য, মস্ত একটা ইতিহাসের কারখানা, লক্ষ লক্ষ হাতুড়ি দ্রুত প্রবল বেগে লক্ষ লক্ষ জায়গায় আসিয়া পড়িতেছে। আমি সেই এঞ্জিনেব বাহিরে দাঁড়াইয়া চাহিয়া থাকি — ক্ষুধাব স্টীমে চালিত সজীব হাতুড়িগুলা দুর্নিবার বেগে ছুটিতেছে, ইহাই দেখিতে পাই।'

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিনি একজন বন্ধুর দেখা পাইলেন। ইনি কিছুদিন আগে কলিকাতায় গিয়াছিলেন, তখন সামান্য আলাপ হইয়াছিল। তবে ইহার ফলেই তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথেব হইয়াছিল। ইউরাপ আসিবার সময়ে এই আশা তাঁহাকে টানিয়াছিল। ইঁহাকে না পাইলে রবীন্দ্রনাথ কি করিতেন তাহাও লিখিয়াছিলেন, —

'কিছুকাল এখানকার মোটর-গাড়ির দানবরথের চাকা বাঁচাইবাব চেষ্টায় শ্রান্ত হইয়া অবশেষে এখানকার পথ হইতেই ফিরিতাম আমার সেই নদীবাহুপাশে-ঘেরা বাংলাদেশের শরৎ-রৌদ্রালোকিত আমনধানের ক্ষেতের ধারে।'

কিন্তু ফিরিয়া যাইতে হইল না, রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন,

'এমন সময় প্রবেশ করিলেন বন্ধু, পর্দা তুলিয়া দিলেন — দেখিলাম আসন পাতা, দেখিলাম আলো জ্বলিতেছে। বিদেশীর অপরিচয়ের মস্ত বোঝাটা বাহিরে রাখিয়া পথিকের ধূলিলিপ্ত বেশ ছাড়িয়া ফেলিয়া, এক মুহূর্তেই ভিড়ের মধ্য হইতে নিভৃতে আসিয়া প্রবেশ করিলাম।'

উইলিয়াম রোটেনস্টাইন

এই বন্ধু তখনকার দিনের বিখ্যাত চিত্রকর উইলিয়ম রোটেনস্টাইন। ইনি যে কেবল চিত্রকর ছিলেন তাহাই নয়, আর্টিস্ট ও সাহিত্যিক সমাজের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল — যেমন, ফ্রান্সে দোগাজ, পিসারো, তুলুজ-লোত্রেক; ব্রিটেনে অস্কার ওয়াইল্ড, অব্রে বিয়ার্ডস্‌লী, ম্যাক্স বীরবম, হুইসলার, সার্জেন্ট, ইয়েটস্ প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথ ইঁহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া লিখিলেন,

'বাগানের মধ্যে গোলাপ যেমন একটি বিশেষ জাতের ফুল, বন্ধু তেমনি একটি বিশেষ জাতের মানুষ। এক-একটি লোক আছেন পৃথিবীতে তাঁহারা বন্ধু হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন। মানুষকে সঙ্গদান করিবার শক্তি তাঁহাদের অসামান্য এবং স্বাভাবিক। ...

রত্ন হইতে জ্যোতি যেমন সহজেই ঠিকরাইয়া পড়ে তেমনি বিশেষ ক্ষমতাশালী মানুষের জীবন হইতে সঙ্গ আপনি বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। ... কবি যেমন আপনার আনন্দকে ভাষায় প্রকাশ করেন তেমনি যাঁহারা স্বভাববন্ধু, তাঁহারা মানুষের মধ্যে আপন আনন্দকে প্রতিদিনের জীবনে প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমি এখানে যে বন্ধুটিকে পাইলাম তাঁহার মধ্যে এই আনন্দ পাওয়া এবং আনন্দ দেওয়ার অবারিত দ্বার আছে। এইরূপ বন্ধুত্বধনে ধনী লোককে লাভ করার সুবিধা এই যে, একজনকে পাইলেই অনেককে পাওয়া যায়। কেন-না, ইঁহাদের জীবনের সকলের চেয়ে প্রধান সঞ্চয় মনের মতো মানুষ-সঞ্চয়।'

ইঁহার পত্নী সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন, —

'আমাদের বন্ধুর গৃহিণীও বন্ধুবৎসল। তাঁহার স্বামীর বিস্তৃত বন্ধুমণ্ডলী সম্বন্ধে তাঁহাকে স্ত্রীর কর্তব্য পালন করিতে হয়। তাহাদের সেবাযত্ন করা, তাহাদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্বন্ধকে সর্বাংশে সুন্দররূপে হৃদ্য করিয়া তোলা, রোগে শোকে তাহাদের সংবাদ লওয়া ও সান্ত্বনা দান, ইহা তাঁহার সাংসারিক কর্তব্যের একটা প্রধান অঙ্গ। ইহা তো কেবল স্বজনসমাজের আত্মীয়তা নহে ইহা বন্ধুসমাজের আত্মীয়তা — এই বৃহৎ আত্মীয়তার মর্মস্থলে সাধ্বী স্ত্রীর যে আসন তাহা এদেশে শূন্য নাই।'

নিজের দেশে 'বন্ধুসমাজের আত্মীয়তা'র অভাব আছে এবং উঁহার মর্মস্থলে সাধ্বী পত্নীর আসন শূন্য, এই ইঙ্গিত যে রবীন্দ্রনাথ করিলেন তাহা বোধ করি বলিয়া দিতে হইবে না।

রোটেনস্টাইনের দুইটি পুত্র ও একটি কন্যাকে দেখিয়াও রবীন্দ্রনাথ এইরূপ লিখিলেন, —

'ইঁহার দুটি ছোটো ছেলে ও ছোটো মেয়ের মধ্যে বাল্যবয়সের চিরানন্দময় নবীনতার উচ্ছ্বাস দেখিতে আমার ভারী ভালো লাগে। আমাদের দেশের ছেলেদের সঙ্গে ইহাদের আমি একটা গভীর প্রভেদ দেখিতে পাই। আমার মনে হয়, যেন আমরা অত্যন্ত পুরাতন যুগের মানুষ; আমাদের শিশুরাও যেন কোথা হইতে সেই পুরাতনত্বের বোঝা পিঠে করিয়া এই পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা ভালোমানুষ, তাহাদের গতিবিধি সংযত, তাহাদের বড় বড় কালো চোখ দুটি করুণ — তাহারা বেশি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না। আপন মনেই যেন তাহার মীমাংসা করিতে থাকে। আর এই সব ছেলেরা পৃথিবীর নবীনযুগের মহলে জন্মিয়াছে, তাহারা জীবনের নবীনতার আস্বাদে মাতিয়া উঠিয়াছে।'

রোটেনস্টাইনের বাড়ীটিও রবীন্দ্রনাথের খুবই ভাল লাগিল। উহা হ্যাম্পস্টেডে। বলিয়া দিতে হইবে না যে, এই পল্লীটা একটা নীচু পাহাড়ের উপর, সেখান হইতে লন্ডন শহরকে সম্মুখে বিস্তৃত দেখা যায়। এই বাড়ীটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন, —

'আমার বন্ধুর বাড়িটির পিছন দিকে ঢালু পাহাড়ের গায়ে ছোটো একটুকরা বাগান আছে। ঐটুকু বাগান আনন্দিত ছোটো ছেলের আঁচলটির মতো ফুলের সৌন্দর্যে ভরিয়া উঠিয়াছে। সেই বাগানের দিকে মুখ করিয়া তাঁহাদের বৈঠকখানা-ঘরের সংলগ্ন একটি লম্বা বারান্দা অপর্যাপ্ত ফুলের স্তবকে আমোদিত গোলাপের লতায় অর্ধপ্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। এই বারান্দায় আমি যখন খুশি একখানা বই হাতে করিয়া বসি, তাহার পরে আর বই পড়িবার কোনো প্রয়োজন বোধ করি না।'

এই বাড়ীটি আমি দেখিয়াছি। আমার হ্যাম্পস্টেডবাসী এক বন্ধু — তিনি ইংরেজী সাহিত্যের ঐতিহাসিক অলিভার এল্টনের পুত্র — আমাকে লইয়া গিয়াছিলেন। দেখিলাম বাড়ীর সম্মুখের দিকে একটা ফলকে লেখা আছে যে, রবীন্দ্রনাথ এই বাড়ীতে কিছুদিন ছিলেন।

'গীতাঞ্জলি'র উদ্যোগপর্ব

ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি'র কথাই বলিতেছি। সমস্ত ব্যাপারটা যে-ভাবে ঘটিল তাহা পূর্বে অননুমেয় অদৃষ্টলিপির উদ্‌ঘাটনের মতো। ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি' আরম্ভ হইল অবসরেব খেয়ালে শিলাইদহতে, কিন্তু লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিল যেন বিধিলিপির অখণ্ডনীয় আত্মপ্রকাশে। উহার ফলে রবীন্দ্রনাথের জীবন-গঙ্গা দুইপ্রবাহে সমুদ্রের দিকে ছুটিল — ভগীরথের শঙ্খধ্বনির পর শঙ্খধ্বনি না মানিয়া একটি প্রবাহ পদ্মারূপে বিপথে চলিল, এমন-কি কীর্তিনাশা নামও ধরিল, অপরটি ভাগীরথী হইয়া ঈপ্সিত খাতে সাগরে গিয়া মিলিল। কিন্তু আপাতত তাহা বোঝা গেল না। প্রথমে ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশের ফলে রবীন্দ্রনাথের কবিবৃত্তিতে পূর্ণতা এবং আনন্দই আসিল। এখন ইহার কাহিনীই দিব।

রবীন্দ্রনাথ যে নিজের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ নিজেই করিলেন, ইহা সাহিত্যের ইতিহাসে অনুবাদ সম্পর্কে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। আমি যতদূর জানি, কোনও খ্যাতনামা কবি, যে-কোনও দেশের বা জাতিরই হোন না কেন, নিজের কাব্যের অনুবাদ বিদেশী ভাষায় করেন নাই। রবীন্দ্রনাথও যে ইচ্ছা করিয়াই বা কোনও উদ্দেশ্য লইয়াই করিয়াছিলেন তাহা নয়। ১৯১২ সনে তাঁহার বিলাত যাওয়ার তারিখ স্থির হইয়াছিল ১৯শে মার্চ। কিন্তু যাত্রার প্রাক্কালেই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। ডাক্তারেরা তাঁহাকে যাত্রা স্থগিত রাখিয়া কিছুদিন কলিকাতার বাহিরে বিশ্রাম

করিতে বলিলেন, তিনি শিলাইদহ চলিয়া গেলেন। এখানে থাকিবার সময়ে হাতে অন্য কাজ না থাকায় অনুবাদ করিবার ইচ্ছা তাঁহার জাগিল। ইহার কথা তিনি এইভাবে বলিয়াছেন,—

'আমি কোনো একটা অবকাশের কালে নিজের কতকগুলি কবিতা ও গান ইংরেজী গদ্যে তর্জমা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। ইংরেজী লিখিতে পারি এ-অভিমান আমার কোনও কালেই নাই; অতএব ইংরেজী রচনায় বাহবা লইবার প্রতি আমার লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু নিজের আবেগকে বিদেশী ভাষার মুখ হইতে আবার একটুখানি নূতন করিয়া গ্রহণ করিবার যে সুখ তাহা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। আমি আর এক বেশ পরাইয়া নিজের হৃদয়ের পরিচয় লইতেছিলাম।'

এই ব্যাপারটা আমার কাছে যুক্তিগোচর নয়। আমি নিজে ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষাতেই লিখিয়া থাকি — নিজের মুখ্য বক্তব্য এইভাবে মাতৃভাষায় ও ইংরেজি ভাষায় অন্য কোনও ভারতীয় লেখক প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া আমি শুনি নাই। কিন্তু আমি দেখিয়াছি, আমার ইংরেজি লেখার উপযুক্ত বাংলা অনুবাদ আমি নিজেও করিতে পারি না, আবার বাংলা লেখারও ইংরেজি অনুবাদ করিতে পারি না। এক ভাষায় লিখিবার সময়ে আমাকে অন্য ভাষা যে জানি তাহা ভুলিয়া যাইতে হয় — নহিলে আমার দুই ভাষার কোনটাতেই লেখা স্বাভাবিক হয় না। তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথ কি তাঁহার বাংলাকেই ইংরেজি করিতে পারিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা পরে করিব, এই প্রসঙ্গে শুধু তাঁহার ইংরেজি অনুবাদের কি গতি কার্যত হইল তাহার কথা বলি।

জাহাজে থাকিবার সময়ে রবীন্দ্রনাথ আরও কবিতা অনুবাদ করিয়া পাণ্ডুলিপিটিকে আরও বাড়াইয়াছিলেন। কিন্তু লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ডে যাইবার সময়ে উহা হারাইয়া গেল। তবু বিধিলিপি যে উহাকে চালাইতেছে তাহার পরিচয় পাওয়া গেল — 'লস্ট প্রপার্টি' আপিসে উহা ফিরিয়া পাওয়াতে। তার পর উহা রোটেনস্টাইনের হাতে পৌঁছিল। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন,—

'আমি বিলাতে আসার পর এই তর্জমাগুলি যখন আমার বন্ধুর হাতে পড়িল, তিনি বিশেষ সমাদর করিয়া সেগুলি গ্রহণ করিলেন। এবং তাহার কয়েক খণ্ড কপি করাইয়া এখানকার কয়েকজন সাহিত্যিককে পড়িতে দিলেন। আমার এই বিদেশী হাতের ইংরেজীতে আমার এই লেখাগুলি তাঁহাদের ভালো লাগিয়াছে। বোধ হয় তাহার একটা কারণ এই যে, ইংরেজী রচনার শক্তি আমার এতটা প্রবল নহে যাহাতে আমার তর্জমা হইতে বিদেশী রসটুকুকে আমি একেবারে নিঃশেষে নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারি।'

যাঁহার মতের জন্য ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' অবশেষে প্রকাশিত হইতে চলিল তিনি ডব্লিউ বি ইয়েট্‌স্। তিনি এ বিষয়ে লিখিলেন,—

'I have carried the manuscript of these translations about me for days, reading it in railway trains, or on the top of omnibuses and in restaurants

and I have often had to close it lest some stranger would see how much it moved me.

তিনি কি দেখিয়া এরূপ অভিভূত হইলেন? তাঁহার ভাষাতেই এই প্রশ্নের উত্তর দিব। তিনি লিখিলেন,—

'These verses will not lie in little well-printed books upon ladies' tables, who turn the pages with indolent hands that they may sigh over a life without meaning, which is yet all they can know of life, or be carried about by students at the university to be laid aside when the work of life begins, but as the generations pass, travellers will hum them on the highway and men rowing upon rivers.'

ব্রিটেনের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত কবিই যদি ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' সম্বন্ধে এই ধারণা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অনুমান করা যাইতে পারে যে, উহা ইংরেজি কাব্য বলিয়া স্বীকৃত হইবে। তবু অন্যের মতামত কি হয় তাহা দেখিবার জন্য ইয়েট্স্ ও রোটেনস্টাইন কবিতাগুলি তখনকার লব্ধপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের শুনাইবার জন্য রোটেনস্টাইনের বাড়িতে একটি সভার ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে আসিলেন এজরা পাউন্ড, আর্নেস্ট রিজ্, অ্যালিস মেনেল্, মে কিন্‌ক্লেয়ার, এইচ ডব্লিউ নেভিলসন্, চার্লস্ ট্রেভেলিয়াল, ফকস্ স্ট্র্যাঙ্গওয়েজ, টি স্টার্জমুয়র ও অন্যেরা। ইয়েটস্ স্বয়ং অনুবাদগুলি পড়িয়া শুনাইলেন. এ-বিষয়ে স্টার্জমুয়র তাঁহার এক বন্ধুর কাছে লিখিলেন,—

'Yeats and Rothenstein had a Bengali poet on view the last day. I was in London. I was privileged to meet him in Yeats's rooms and then to hear the translations of his poems made by himself and read by Yeats in Rothenstein's drawing-room. It's unique subject is "The love of God."

রবীন্দ্রনাথের সশরীরে উপস্থিতিও সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। স্টার্জমুয়র তাঁহাকে প্রথমবার দেখিবার পরই লিখিলেন, —

'The poet himself is a sweet creature, beautiful to the eye in a silk turban.'

মিসেস কর্নফোর্ড (ডারউইনের পৌত্রী, গ্রীক দর্শনের অধ্যাপক এফ. কর্নফোর্ডের পত্নী, নিজে কবি) লিখিলেন,—

'I must write and tell you both what a wonderful thing it has been to see Tagore. I understand all you say. He is like a saint, and the beauty and dignity of his whole being is

wonderful to remember. I can now imagine a powerful and gentle Christ.'

ইহার পর কবিতাগুলি প্রকাশ করিবার উপায় স্থির করা হইল। তখন মনে হইল না যে, কোনও ব্যবসায়ী প্রকাশক বইটি গ্রহণ করিবে। তাই লন্ডনের ইণ্ডিয়া সোসাইটি নিজেদের ব্যয়ে ৭৫০ কপি ছাপিতে স্বীকৃত হইলেন। ইয়েট্স্ ও স্টার্জমুয়র খুব যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া রবীন্দ্রনাথের অনুবাদগুলি ছাপাইবার জন্য প্রস্তুত করিলেন। ১৯১২ সনের অক্টোবর মাসে এই সংস্করণটি প্রকাশিত হইল। তখনই একটা সাড়া পড়িয়া গেল। আমি তখন স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে (আধুনিক ক্লাস টেনে) পড়ি, শীঘ্রই আমার এক সাহিত্যরসিক মামা আমাকে বইটি দেখাইলেন। পরে আমরাও কিনিয়াছিলাম। এইরূপ সাড়ার ফলে ম্যাকমিলান 'গীতাঞ্জলি'র সাধারণ সংস্করণ প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইল ও সংস্করণটির ছাপা ও বাঁধাই খুবই সুন্দর হইল। এই প্রথম সাধারণ সংস্করণের 'গীতাঞ্জলি' ১৯১৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়। ইহাও আমার আছে। এই কপিটির একটা ইতিহাসও আছে। আমি এটি অক্সফোর্ডের এক পুরানো বই-এর দোকান হইতে কিনি। খুলিয়াই প্রথম ক্রেতার নাম পড়িলাম — এইচ আর জেমস্ ও কিনিবার তারিখ দেখিলাম ২১ এপ্রিল, ১৯১৩। সুতরাং বইটা খুবই শীঘ্রই কলিকাতায়ও পৌঁছিয়াছিল। এই জেম্স্ সাহেব তখন কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। সুভাষচন্দ্র বসুর হাঙ্গামার পর তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

ইহার পর ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'-তে রবীন্দ্রনাথের কোন্ কোন্ কবিতার অনুবাদ আছে বলা প্রয়োজন। ইহার নাম 'গীতাঞ্জলি' হইলেও বইটিতে বাংলা 'গীতাঞ্জলি'র সব গান (বা কবিতা) অনূদিত হয় নাই— বাংলাতে ১৫৭টি গান ছিল, উহার মধ্যে ৫৩টি মাত্র ইংরেজি করা হইয়াছিল; ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'-তে সবসুদ্ধ ১০৩টি কবিতা ছিল (বইটি বড় টাইপে মাত্র ১০১ পৃষ্ঠার হইয়াছিল, দাম হইয়াছিল মাত্র চার শিলিং ছয় পেন্স — আমাদের টাকায়, তিন টাকা ছয় আনা)। বাকি ইংরেজিতে অনূদিত কবিতা আসিয়াছিল প্রধানত 'নৈবেদ্য' ও 'খেয়া' হইতে, অল্প কয়েকটি সাময়িকপত্রে প্রকাশিত কবিতা হইতে।

ইংল্যান্ডে সমাদর ও সমাদরের কারণ

ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' এইরূপ সমাদর যে পাইল তাহার পরিচয় দিতে হইবে এবং উহার কারণও অনুসন্ধান করিতে হইবে। প্রথমে সমাদর কিরূপ হইয়াছিল তাহার দৃষ্টান্ত দিব। একজন সমালোচক লিখিলেন—

'To begin chanting these lyrics aloud is to pass majestically into a realm of spiritual ecstasy, where the vision that comes to us so momentarily and fleetingly seems constant and habitual outlook of the soul.'

আর একজন লিখিলেন—

'Mr. Tagore's translations are of trance-like beauty....The expanding sentiment of some of the poems wins, even through the alien medium of our English prose, a rhythm which in its strength and melody might recall familiar passages in the Psalms or Soloman's Song.

তৃতীয় আর একজন লিখিলেন—

'Only the classics of mystical literature provide a standard by which this handful of "Song Offerings" can be appraised or understood . They are **offerings,** from finite to infinite-oblations as their creator holds that all art should be, laid upon the altar of the world.'

আর একটি মাত্র উদ্ধৃত করিব—

'One of the most significant books that have appeared in our time....They reveal a poet of undeniable authority and a spiritual influence singularly in touch with modern thought and modern needs.'

এই সবগুলি অভিমত ইংল্যান্ডের উচ্চস্তরের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন দেখাইতে চেষ্টা করিব 'গীতাঞ্জলি' ব্রিটেনে এই মানসিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল কেন?

ব্যাপারটা বুঝিতে হইলে ১৯১২ সনে ইংল্যান্ডের উচ্চস্তরের জীবন কি রকম ছিল তাহার পরিচয় লইতে হইবে। এই যুগটা সমৃদ্ধ ইংরেজ সমাজের অপরিমিত ঐশ্বর্য, ভোগ ও বিলাসিতার যুগ ছিল, ইহাদের অবকাশও ছিল সুপ্রচুর, সুতরাং মানুষের মনে শূন্যতার অনুভূতিও পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল, কারণ উপভোগ উপভোগের দ্বারা শান্ত হয় না, ঘৃতের দ্বারা অগ্নির মতো ক্রমাগত বাড়িয়াই চলে।

এই জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যাইবে মার্গো অ্যাস্‌কুইথ, অসবার্ট সিটওযেল, ভায়োলেট বনাম কার্টার ও হ্যারল্ড ম্যাকমিলানের স্মৃতিকথা হইতে; জন গলস্‌ওয়ার্দি, আর্নল্ড বেনেট ও 'সাকি'-র গল্প ও উপন্যাস হইতে; রেমন্ড অ্যাস্‌কুইথ-এর পত্রাবলী হইতে। এই সমাজে যুবক-যুবতীদের সারাদিন গল্প-গুজব, রাজসিক ভোজন ও সারারাত্রি নৃত্য ভিন্ন আর কোনও কাজ ছিল না বলা চলে।এমন কি, সেনাবাহিনীর যুবক সেনানীরাও এইভাবেই দিন কাটাইত। গার্ডস-রেজিমেন্টের সেনানীদের জীবনের বর্ণনা অসবার্ট সিটওয়েল এইভাবে দিয়াছেন —

'Enjoyment was the aim of life, and gaiety and high spirits the links that bound us, I remember many long walks back to Wellington Barracks late at night from some dance or supper-party across the Iron Bridge that spans St James's Lake.... in evening clothes, wearing broad braided black

trousers, white waist-coats, starched shirts and white ties, white kid gloves, with a white carnation or gardenia in the buttonhole of our coats and we carried gold-or-tortoise-shell-topped Malacca canes. Such was the convention....

১৯১০ হইতে ১৯১৩ পর্যন্ত যুদ্ধের সম্ভাবনা কাহারও মনে উদয় হয় না। অথচ এই গার্ডস্-অফিসারদের অধিকাংশই প্রথম মহাযুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসে নাই। তাহারা যে সামাজিক শ্রেণী হইতে আসিত সেই শ্রেণীর সকলেই মনে করিত, যে-অর্থের উপর তাহাদের জীবন-যাত্রা প্রতিষ্ঠিত সেই অর্থকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার ইচ্ছাই যুদ্ধ হইতে দিবে না — অর্থাৎ যখন অর্থ ভোগের জন্য প্রয়োজন, তখন কে যুদ্ধ করিবার জন্য উহার অপব্যয় করিবে?

অবশ্য এই ভোগাসক্তির জীবনের গতানুগতিকতা অনেককে পীড়া দিত। 'সাকি'র 'Mappined Life' বলিয়া একটি গল্প আছে, তাহাতে এই অধৈর্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। লন্ডন জু-র নূতন Mappin Terrace-এর প্রশংসা করিয়া এক ধনী বৃদ্ধা তাঁহা ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বলিলেন, These Mappin Terraces at the Zoological Gardens are a great improvement on the old-style of wild-beast cages'. কারণ তাহারা ইহাতে নিজেদের প্রাকৃতিক অবস্থান পাইবে। প্রগল্‌ভা ভ্রাতুষ্পুত্রী উত্তর করিল, 'সেটা নির্ভর করবে কোন্ জন্তু থাকবে, তার ওপর। বন-মোরগ যদি সেখানে যথেষ্ট দানা পায় আর যতগুলো মুরগী সে সামলাতে পারে ততগুলো পত্নী হিসাবে পায়; তা হলে হয়ত সে মনে করবে আমি জঙ্গলেই আছি। কিন্তু বাঘ তা মনে করবে না, সে রাত্তিরে দশ-বিশ মাইল ঘোরে, সে ম্যাপিন টেরাস-কে তার স্বাভাবিক বাসস্থান মনে করবে না।' পিসি প্রত্যুত্তর করিলেন —

'It's rather depressing to think that, they look so spacious and natural, but I suppose a good deal of what seems natural to us would be meaningless to a wild animal.'

ভ্রাতুষ্পুত্রী ছাড়িবার পাত্রী নয়, সে ইহার পর বলিল —

'That is where our superior powers of self-deception come in, we are able to live our unreal, stupid little lives on our particular Mappin Terrace and persuade ourselves that we really are untrammelled men and women leading a reasonable existence in a reasonable sphere.'

তখন ইংল্যান্ডে অনেককেই দেখা গিয়াছিল যাহারা এই বিদ্রোহী তরুণীটির মতো মনে করিতেছিল যে, তাহাদের ঐশ্বর্যের জগৎ Mappin Terrace-এর মতোই বৈচিত্র্যহীন ও সীমাবদ্ধ। ইহাদের কাছেই 'গীতাঞ্জলি' ভক্তি ও ত্যাগের নূতন বাণী লইয়া উপস্থিত হইল, যে-ভক্তি অপরিমিত আনন্দময়, যে-ত্যাগ দুঃখবর্জিত, যাহার অবলম্বন ঈশ্বরপ্রেম।

ইয়েট্‌স্‌ প্রথম হইতেই ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই, যখন প্রথম দিন 'গীতাঞ্জলি' পড়া হইবার পর স্টার্জমুয়র বলিলেন যে কবিতাগুলি "preposterously optimistic", তখন ইয়েট্‌স্‌ উত্তর দিলেন, 'Ah, you see, he is absorbed in God.'

কিন্তু বাঙালি জীবন সম্বন্ধে নিজে কিছু না জানাতে ইয়েট্‌স্‌ পরিচিত বাঙালির শরণাপন্ন হইলেন। ইহারা তাঁহাকে ভুল বুঝাইলেন এবং সেটা এমনই ভুল বোঝানো যে উহাকে দমবাজী বলা চলে। তাঁহাদের কথা বিশ্বাস করিয়া ইয়েট্‌স্‌ বাঙালি সভ্যতার এক প্রশস্তি লিখিলেন, তিনি বলিলেন বাঙালিরা —

'display in their thought a world I have dreamed of all my life long. The work of a supreme culture, they yet appear as much the growth of the common soil as the grass and the rushes.... If the civilization of Bengal remains unbroken, if that common mind which — as one divines — runs through all, is not, as with us, broken into a dozen minds that know nothing of each other, something even of what is most subtle in these verses will have come in a few generations to the beggar on the roads.'

ইয়েট্‌স্‌ ইহাও বলিলেন যে, এই common mind ইংল্যান্ডে চসারের পর আর দেখা যায় নাই। আমি মনে করি না যে, ইয়েট্‌সের বাঙালি উপদেষ্টারা এই তত্ত্ব তাঁহার কাছে এমন সুন্দর ইংরেজিতে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। নিশ্চয়ই ইয়েট্‌সের কবি-মন তাঁহাদের কোনও আবোল-তাবোলকে এইভাবে সাহিত্যরূপ দিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরপ্রেম যে আসলে খ্রীষ্টধর্ম-সম্ভূত ও পাশ্চাত্ত্য তাহা আমি দেখাইয়াছি। সুতরাং এ বিষয়ে আর কিছু বলিব না। তবে ইয়েটস-ও 'গীতাঞ্জলি' সম্বন্ধে বলিলেন, 'Yet we are not moved because of its strangeness, but because we have met our own image.' এই প্রসঙ্গে তিনি খ্রীষ্টীয় সাধক সেন্ট বার্নার্ড, টমাস-এ-কেম্পিস্‌ ও সেন্ট জন অফ্‌ দি ক্রসেরও উল্লেখ করিলেন। ইহাই সত্য-অনুভূতি। অন্য সমালোচকেরাও যে Song of Solomon ও সেন্ট ফ্রান্সিসের সহিত রবীন্দ্রনাথের সমধর্মিতা অনুভব করিয়াছিলেন তাহাও তাঁহার ঈশ্বরপ্রেম খ্রীষ্টীয় বলিয়াই। আমি এই দুই সাদৃশ্যেরই দৃষ্টান্ত দিব। বাংলা 'গীতাঞ্জলি'র ৬১নং গান 'সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগিনি' — ইহার ইংরেজি অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'-র ২৬ নং কবিতাতে এইভাবে দিলেন,

'He came and sat by my side but I woke not.
What a cursed sleep it was, O miserable me!'

'He came when the night was still, he had his harp in his hands, and my dreams became resonant with its melodies.
'Alas, why are my nights all thus lost? Ah,
Why do I ever miss his sight whose breath touches my sleep?'

এখন Song of Solomon শুনুন —

'I sleep, but my heart waketh, it is the voice of my beloved that knocketh, saying, open to me, my sister, my love, my dove, my undefiled...

'I have put off my coat, how shall I put it on? I have washed my feet; how shall I defile them?
'My beloved put in his hand by the hole of the door. I rose up to open to my beloved.. I opened to my beloved; but my beloved had withdrawn himself and was gone; my soul failed when he spoke, I sought him, but I could not find him; I called him, but he gave me no answer.'

(The song of Solomon, 5: 2-6)

ইহার পর রবীন্দ্রনাথের আর একটি কবিতা উদ্ধৃত করিব —

'Death, thy servant, is at my door. He has crossed the unknown sea and brought thy call to my home. I will worship him with folded hands, and with tears. I will worship him placing at his feet the treasures of my heart.'

(ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি', ৮৬ নং)

সেন্ট ফ্রান্সিসও তাঁহার Canticle-এ গাহিয়াছিলেন —

'Praised be my Lord for our sister, the death of the body, from whom no man escapeth. Blessed are they who are found walking by Thy most holy will, for death shall have no power to do them harm.'

এই সাদৃশ্য অনুকরণ নয়, অনুবাদ তো নয়ই, এগুলি সমধর্মিতা হইতে দেখা দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি গীতাঞ্জলির ভিতর দিয়া পুরাতন ইউরোপীয় ঈশ্বরপ্রেমকেই নূতন রূপ দিয়া প্রচার করিলেন। যে-যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া রূপার্ট ব্রুক ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে যোগ দিয়া উদ্ধার পাইবার পথ দেখিলেন এই কথা বলিয়া —

'Now, God be thanked who has matched us with His hour,
And caught our youth, and wakened us from sleeping.
Leave the sick heart that honour could not move,
And half-men, and their dirty songs and dreary,
And all the little emptinesses of love.'

— সেই যুগেরই অন্যেরা এই কারণেই মহাযুদ্ধ আসিবার দুই বৎসর পূর্বে 'গীতাঞ্জলি'-কে গ্রহণ করিল। ইহাই রবীন্দ্র-সমাদরের প্রকৃত অর্থ।

'ইংল্যাণ্ডের ভাবুক সমাজ'

কথাগুলি রবীন্দ্রনাথের নিজের, তাঁহার এইবারের বিলাত প্রবাসের বিবরণ হইতে লইলাম। ১৯১২ সনে বিলাতে আসিয়া, যাহা দেশে পান নাই, তিনি তাহা পাইলেন — সমানধর্মীর সহিত পরিচয়। এ-বিষয়ে তিনি লিখিলেন, —

'ইঁহাদের সঙ্গে আমার পরিচয় খুব বেশি দিনের নয়, খুব অন্তরঙ্গও নয়, ক্ষণকালের দেখাসাক্ষাৎ মাত্র। কিন্তু সেই সময়টুকুর মধ্যে একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়া আমি বারম্বার বিস্মিত হইয়াছি, সেটা ইঁহাদের মনের ক্ষিপ্রহস্ততা। মন ইলেকট্রিক আলোর তারের মত সর্ব্বদা যেন প্রস্তুত হইয়াই আছে, বোতামটি টিপিবা-মাত্র তখনই জ্বলিয়া উঠে। আমাদের প্রদীপের আলোর ব্যবহার; সলিতা পাকাইয়া তেল ঢালিয়া চকমকি ঠুকিয়া কাজ চালাইয়া থাকি; বিশেষ কোনো তাগিদ নাই, সুতরাং দেরী হইলে কিছুই আসে যায় না। অতএব আমাদের যেরূপ অভ্যাস তাহাতে আমার পক্ষে এই ইলেকট্রিক আলোর ক্ষিপ্রতা সম্পূর্ণ নূতন।'

ইহার পরিচয় তিনি লন্ডনে পৌঁছিবামাত্র পাইয়াছিলেন। তখন তিনি 'নেশন' পত্রিকার (সাপ্তাহিক) মধ্যাহ্নভোজনে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। উহার সম্পাদক ছিলেন, এইচ ডব্লিউ ম্যাসিংহ্যাম। রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, ...

"নেশন" পত্রের সম্পাদক ও লেখকেরা সপ্তাহে একদিন মধ্যাহ্নভোজে একত্র হন। এখানে আহার করিতে করিতে আলাপ করেন ও আহারান্তে আগামী সপ্তাহের প্রবন্ধের বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, এরূপ প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রের লেখকেরা সকলেই পাণ্ডিত্যে ও দক্ষতায় অসামান্য ব্যক্তি। সেদিন ইঁহাদের আলোচনা-ভোজে স্থান পাইয়া আমি বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছি।'

নেশন পত্রিকা সম্বন্ধে লিখিলেন,

'নেশন এখানকার উদারপন্থীদের প্রধান সাপ্তাহিক পত্র। ইংলন্ডে যে সকল মহাত্মা স্বদেশ ও বিদেশ, স্বজাতি ও পরজাতিকে স্বার্থপরতার ঝুঁটা বাটখারায় মাপিয়া বিচার করেন না, অন্যায়কে কোনো ছুতায় কোথাও আশ্রয় দিতে চান না, যাঁহারা সমস্ত মানবের অকৃত্রিম বন্ধু, নেশন তাঁহাদেরই বাণী বহন করিবার জন্য নিযুক্ত।'

ইঁহাদের সহিত আমাদের দেশের সংবাদপত্রের লেখকদের যে একটা গুরুতর পার্থক্য আছে তাহার কথাও রবীন্দ্রনাথ বলিলেন এইভাবে —

'ইঁহাদের মধ্যে বসিয়া আমার বারম্বার কেবল এই কথাই মনে হইতে লাগিল যে, ইঁহারা সকলেই জানেন ইঁহাদের প্রত্যেকেরই একটি সত্যকার দায়িত্ব আছে। ইঁহারা কেবল বাক্য রচনা করিতেছেন না, ইঁহাদের প্রত্যেক প্রবন্ধ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতরীর হালটাকে ডাইনে বা বাঁয়ে কিছু-না-কিছু টান দিতেছেই। এমন অবস্থায় লেখক লেখার মধ্যে আপনার সমস্ত চিত্তকে প্রয়োগ না করিয়া থাকিতে পারেন না।'

তাঁহার পর উহার বিপরীত কি তাহারও কথা বলিলেন —

'আমাদের দেশে খবরের কাগজে তাহার কোনও প্রয়োজন নাই; আমরা লেখকের কাছে কোনও দায়িত্ব দাবি করি না, এই কারণে লেখকের শক্তি সম্পূর্ণ আলস্য ত্যাগ করে না ও ফাঁকি দিয়া কাজ সারিয়া দেয়: এর জন্যই আমাদের সম্পাদকেরা লেখকদের শিক্ষা ও সতর্কতার কোনো প্রয়োজন দেখেন না, যে-সে লোক যাহা-তাহা লেখেন এবং পাঠকেরা তাহা নির্বিচারে

পড়িয়া যান। আমরা সত্যক্ষেত্রে চাষ করিতেছি না বলিয়াই আমাদের মঞ্জরীতে শস্য-অংশ অতি সামান্য দেখা যায় — মনের খাদ্য পুরাপুরি জন্মিতেছে না।'

রবীন্দ্রনাথ আমাদের আলোচনা ও বিচার সম্বন্ধে যাহা লিখিলেন তাহা যেমন প্রণিধানের যোগ্য, তেমনই সত্য। তিনি বলিলেন, 'আমাদের দেশে রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা-সভা আমি দেখিয়াছি; উহাতে কথার চেয়ে কণ্ঠের জোর কত বেশী!' কিন্তু ইংলন্ডে যাহা দেখিলেন তাহার সম্বন্ধে বলিলেন, 'এখানে কিরূপ প্রশান্তভাবে এবং কিরূপ প্রণিধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক চলিতে লাগিল। মতের অনৈক্যের দ্বারা বিষয়কে বাধা না দিয়া তাহাকে অগ্রসরই করিয়া দিল। অনেকে মিলিয়া কাজ করিবার অভ্যাস ইঁহাদের মধ্যে কত সহজ হইয়াছে, তাহা এই ক্ষণকালের মধ্যে বুঝিতে পারিলাম।'

তাহার পর বিলাতেব সমগ্র চিন্তাশীল সমাজ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যাহা ১৯১২ সনে বলিলেন তাহার আরও কিছু উদ্ধৃত করিব. দুই কারণে — প্রথমত তাঁহার কথা আজও সত্য; দ্বিতীয়ত, আজও বিলাতপ্রবাসী বাঙালীর মধ্যে ইংরেজজীবন সম্বন্ধে তাঁহার অনুভূতি ও উপলব্ধি দেখিতে পাই না; এখানে শিক্ষিত বাঙালির সহিতই আমার দেখা হইয়া থাকে, তাঁহাদের একমাত্র ভাবনা দেখি, কি করিয়া আরও অর্থ উপার্জন করা যায়, কিংবা ছাত্র হইলে কি করিয়া একটা ফাঁকির ডিগ্রি লইয়া দেশে বেশি মাহিনার চাকুরি পাওয়া যায়; ইংলন্ডে যে কিছু জানিবার বা শিখিবার আছে, তাহা ইঁহারা স্বীকার করেন না।

এখন রবীন্দ্রনাথের কথাই বলি। তিনি তিনটা জিনিস দেখিলেন — ১। চিন্তার সহিত কর্মের যোগ; ২। ন্যায়-অন্যায়বোধ জাগ্রত রাখা যে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের একটা দায় তাহার উপলব্ধি; ৩। চিন্তার আনন্দ বিলাতের শিক্ষিত সমাজের সামাজিকতার একটি প্রধান অঙ্গ। এই তিনটি বিষয়েই রবীন্দ্রনাথ কি লিখিয়াছিলেন তাহার আভাস দিতেছি।

১। প্রথম বিষয়টা সম্বন্ধে তিনি লিখিলেন, 'এখানে ভাবের ক্ষেত্র এবং কাজের কারখানা পাশাপাশি আছে। এখানে রাষ্ট্রনীতির সিংহাসন ও ধর্মনীতির বেদী পরস্পর নিকটবর্তী।'

২। চিন্তাতে ন্যায়-অন্যায় বোধের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে লিখিলেন. 'এখানকার যে সকল চিন্তাশীল ও ভাবুক লোকদের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে সকলেরই মধ্যে একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করিয়াছি, তাঁহারা অন্যায় ও অবিচারকে সত্যই ঠেলিয়া ফেলিতে চান।' তিনি বলিলেন, 'এই প্রবৃত্তিটা ইংরেজের মধ্যে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার কারণ এই যে, সারা পৃথিবী জুড়িয়া অন্য জাতি ইংরেজের অধীন। সুতরাং জাতীয় স্বার্থের জন্য অধীন

জাতির প্রতি অবিচার হওয়া ও সেই অবিচার চাপা দেওয়া ইংরেজের পক্ষে স্বাভাবিক আচরণ হইতে পারে, তবুও ইংরেজ কাহারও প্রতি অন্যায় হইলে তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি করে।

৩। তৃতীয় ব্যাপারটা অবশ্য যাহাদের মানসিক জীবনের অস্তিত্ব আছে তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত সুখের বিষয়। ইহার অভাব তাঁহার মত নিজেও আমি দেশে অনুভব করিয়াছি। সে জিনিসটা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন,

'যেখানে চিন্তার এমন একটা বেগ আছে সেখানে চিন্তার আনন্দ যে কতখানি তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। সেই আনন্দ এখানকার শিক্ষিত সমাজের সামাজিকতার একটি প্রধান অঙ্গ। এখানকার সামাজিক মেলামেশার মধ্যে চিত্তের লীলা আপনার বিহারক্ষেত্র রচনা করিতেছে। চিন্তার সঞ্চার কেবল বক্তৃতায় এবং বই লেখায় নহে, তাহা মানুষের সঙ্গে মানুষের দেখা-সাক্ষাতে। অনেক সময় ইহাদের আলাপ শুনিতে শুনিতে আমার মনে হইয়াছে, এ সব কথা লিখিয়া রাখিবার জিনিস, ছড়াইয়া ফেলিবার নহে।' কিন্তু না ছড়াইতে পারিলে মানসিক কার্পণ্য দেখানো হয় — এই কথা বলিয়া রবীন্দ্রনাথ আরও বলিলেন, 'এই জন্য চিন্তার চর্চায় সেই আনন্দ থাকা চাই যাহাতে সে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি হইয়া জন্মিতে পারে।'

ইহার পর রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন, 'আমাদের দেশে চিত্তের সেই আনন্দ-লীলার অভাবটাই সকল দৈন্যের চেয়ে বেশি বলিয়া ঠেকে।' এই কথাটা যে কত সত্য তাহা আমি একুশ বৎসর অক্সফোর্ডে বাস করিয়াও দেখিতেছি। আমি যতটুকু পারি আমার সামাজিক জীবনের মধ্যে মানসিক জীবনকেও আনিতে চেষ্টা করি। কিন্তু ইহার ফল এই হইয়াছে যে, এই দীর্ঘকাল অক্সফোর্ড-বাসের পরও মাত্র দুইটি বাঙালী পরিবারের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে, তাহাও ঘনঘন নয়। অন্য কেহ যদি কৌতূহলবশত আসেন, তিনি আর দ্বিতীয়বার আসেন না। একজন বাঙালি বলিয়াছেন, 'উনি বড় বেশি কথা বলেন।' তবে এই কারণেই 'দেশ'-এর জন্য এত দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতে পারিতেছি। আমার দেশবাসীরা যদি এখানে আমার কথা শুনিতেন, তাহা হইলে আমার বক্তব্য কেবল মুখের কথার মধ্যেই উড়ো খই-এর মত ছড়াইয়া যাইত, লিপিবদ্ধ হইয়া ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হইত না, কারণ আমি স্বভাবত অলস, তদুপরি দেহে দুর্বল।

এইচ জি ওয়েলস্ ও রবীন্দ্রনাথ

এইবার বিলাতপ্রবাসের সময়ে বহু বিখ্যাত মনীষীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, যেমন — যাঁহাদের নাম করিয়াছি, তাঁহাদের ছাড়াও বার্নার্ড শ', জন মেজফিল্ড, রবার্ট ব্রিজেস্ ও এইচ জি ওয়েলস্। ইহাদের মধ্যে তিনি এইচ জি ওয়েলস্ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ সাহিত্যিক বৃত্তিতেই হউক, চরিত্র ও আচরণেই হউক,

কিংবা মনোভাবেই হউক রবীন্দ্রনাথ ও ওয়েলস্‌-এর মধ্যে সাদৃশ্য ছিল না, অথচ রবীন্দ্রনাথ ওয়েলস্‌-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া খুবই আনন্দ পাইয়াছিলেন এবং ওয়েলস্‌ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব।

রোটেনস্টাইন ডিনারে নিমন্ত্রণ করিয়া দুইজনের মধ্যে পরিচয় করাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ওয়েলস্‌-এর যে-কয়েকখানা বই পড়িয়াছিলেন তাহাতে বুঝিয়াছিলেন 'ইহার চিন্তাশক্তি ইস্পাতের তরবারির মতো, যেমন ঝকমক করে তেমনি খরধার।' সুতরাং লিখিলেন, — 'সেদিন আমার মনের মধ্যে কেমন একটু ভয় ছিল। আমার মনে ছিল, সংসারে খরতর বুদ্ধি জিনিসটাতে নিশ্চয় অনেক কাজ হয়, কিন্তু তাহার সংস্রব হয়তো আরামের নহে।' কিন্তু দেখিলেন তাহার বিপরীত, লিখিলেন,

'সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ইঁহার সঙ্গে অনেকক্ষণের জন্য আলাপ পরিচয় হইল। প্রথমেই আশ্বস্ত হইলাম যখন দেখা গেল মানুষটি সজারু জাতীয় নহে। সম্পূর্ণ মোলায়েম। দেখিতে পাইলাম ইহার প্রখরতা চিন্তায়, কিন্তু প্রকৃতিতে নয়। আসল কথা; মানুষের প্রতি ইঁহার আন্তরিক দরদ আছে, অন্যায়ের প্রতি বিদ্বেষ এবং মানুষের সর্বজনীন উন্নতির প্রতি অনুরাগ আছে। সেইটি থাকিলেই মানুষের মন কেবলমাত্র চিন্তার তুবড়িবাজি করিয়া সুখ পায় না। এই দেশে সেইটে একটা মস্ত জিনিস মানুষ এখানে সর্বদা প্রত্যক্ষগোচর হইয়া আছে; মানুষের সম্বন্ধে এখানে ঔৎসুক্যের অন্ত নাই।'

ইহার পরই রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশ সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহা আপাতদৃষ্টিতে আশ্চর্যকর, কিন্তু মূলত মিথ্যা নয়। তিনি লিখিলেন, —

'আমাদের দেশে আমি অনেক শক্তিশালী লোক দেখিয়াছি, মানুষের সঙ্গে তাঁহাদের হৃদয়ের সংস্রব সুগভীর ও সর্বদা বিদ্যমান নহে বলিয়াই তাঁহারা আপন সাধ্যকে পূর্ণভাবে সাধিত করিয়া তুলিতে পারেন না।'

তিনি বলিলেন যে 'মানুষ আঁকিয়া বাঁকিয়া আমাদের হৃদয় মনকে আকর্ষণ করিতেছে না। সেই জন্য আমরা অনেকে চিন্তা করিতে পারি, কিন্তু সে চিন্তা আলস্য ঘুচাইয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে না; অনেকের হৃদয় আছে, কিন্তু সে হৃদয় ছেলেপুলে ভাইপো-ভাগ্‌নের বাইরে খাটিবার ক্ষেত্র পায় না।' পক্ষান্তরে তিনি ওয়েলসের মধ্যে দেখিলেন যে, তাঁহার মত লোকদের চিন্তা 'কেবলমাত্র শক্তির খেলা নহে তাহার সঙ্গে হৃদয় আছে, জীবন আছে।'

কিন্তু চিন্তার খেলা হিসাবে দেখিলেও উহার ক্ষিপ্রতা দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত হইলেন, লিখিলেন, —

'আমার বন্ধুর সঙ্গে ওয়েলসের যতক্ষণ কথা চলিল ততক্ষণ পদে পদে কথাবার্তার প্রবাহ, উজ্জ্বল চিন্তার কণায় ঝলমল করিতে লাগিল। কথার সঙ্গে কথার স্পর্শে আপনি স্ফুলিঙ্গ বাহিত হইতে থাকে, মুহূর্তকাল বিলম্ব হয় না। ... ইহাদের ব্যক্তিগত মনের পশ্চাতে সমস্ত দেশের মন

জাগিয়া আছে; চিন্তার ঢেউ কথার কল্লোল কেবলই নানা দিক হইতে নানা আকারে পরস্পরের চিত্তকে আঘাত করিতেছে। ইহাতে মনকে জাগ্রত ও মুখরিত না করিয়া থাকিতে পারে না।'

এই তো গেল ওয়েলস্ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কথা। অপরপক্ষে ওয়েলস্‌ও তাঁহার সহিত সাক্ষাতে এমনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহার কথা পরে লিখিয়াছিলেন। আরও আশ্চর্যের কথা রবীন্দ্রনাথকে প্রথমে তাঁহার একটি উপন্যাসে টানিয়া আনিয়াছিলেন। আমি উপন্যাসটি ১৯১৯ সনে পড়ি, তখন ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। উপন্যাসটির নাম 'Mr Britling Sees it Through', উহার বিষয় কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ; উহা প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সনে। মিঃ ব্রিটলিং সম্পন্ন অবস্থার ইংরেজ এবং লেখক; যুদ্ধের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে তাঁহার মনে কি ভাব ও চিন্তা জাগিতেছিল, কি প্রশ্ন উঠিতেছিল তাহাই উপন্যাসটির বিষয়বস্তু। তখন যুদ্ধ বাধিবে বাধিবে। মিঃ ব্রিটলিং-এর এক সাহিত্যিক বন্ধু Lawrence Carmine (ইনি অবশ্য Lawrence Binyon) তাঁহার পরিচিত এক বাঙালী দম্পতিকে লইয়া মিঃ ব্রিটলিং-এর বাড়ীতে আসিতেন। সেদিন একাই আসিয়াছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে ওয়েলস্ লিখিলেন, —

'When Mr. Britling went to bed that night after a long gossip with Carmine about the Brahma Samaj and modern developments in Indian thought generally, the squirrel was still undiscovered.'

একটি পোষা কাঠবেরালী হারাইয়া গিয়াছিল, তাহারই কথা হইতেছে। ওয়েলস্ লিখিলেন, —

'The worthy modern thinker undressed slowly, blow out his candle and got into bed. Still meditating deeply upon the God of the Tagores he thrust his hand under his pillow.'

— কাঠবেরালীকে পাইলেন।

জার্মানরা বেলজিয়াম অধিকার করিবার পর মিঃ ব্রিটলিং এক পলায়িত পরিবারকে তাঁহার বাড়ীতে আশ্রয় দিলেন। বেলজিয়ান ভদ্রলোকটি ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। মিঃ ব্রিটলিং-এর বাড়ীতে হকি-খেলার বন্দোবস্ত ছিল, বাড়ীর স্ত্রী-পুরুষ এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে অতিথি, সকলকেই তাহাতে যোগ দিতে হইত। বেলজিয়ানের পত্নীটিকেও খেলিতে হইত, কিন্তু মিঃ ব্রিটলিং দেখিলেন এই রোমান ক্যাথলিক মহিলা ঠিক বাঙালী মহিলাটিরই মত হকি খেলেন। ওয়েলস্ এই মহিলাটির সম্বন্ধে লিখিলেন, —

'She is a specialized woman, specializing in womanhood. Catholicism invented the invisible purdah. She is far more akin to the sweet little Indian lady with wonderful robes whom Carmine brought over with her tall husband ... She, too, played hockey very much as madame Van der Dant played it.'

আমি ১৯১৯ সনেই অনুমান করিতে পারিয়াছিলাম এই বাঙালী দম্পতি কারা — স্বামী মিঃ নির্মলচন্দ্র সেন (কেশবচন্দ্র সেনের পুত্র) — তিনি তখন ইন্ডিয়া-অফিসে ভারতীয় ছাত্রদের শিক্ষাসংক্রান্ত উপদেষ্টা ছিলেন — পত্নী মৃণালিনী (পাইকপাড়ার রাজবাড়ীর পূর্বতন বিধবা রানী মৃণালিনী, যিনি পলাইয়া গিয়া নির্মলচন্দ্রকে বিবাহ করেন)। ওয়েলস্ নিশ্চয়ই তাঁহাদের দেখিয়াছিলেন, মুগ্ধও নিশ্চয়ই হইয়াছিলেন।

ইহার পর ওয়েলস্ ১৯১৭ সনে 'God The Invisible King' এই নাম দিয়া একটি ধর্মসংক্রান্ত বই প্রকাশিত করেন, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলেন যে তিনি 'representative of the best in modern Indian theology.'

ইংল্যান্ডের পল্লীগ্রাম ও পল্লীজীবন

উনিশশো বারো-তেরো সনের বিলাত প্রবাসে শেষ আনন্দ রবীন্দ্রনাথ পাইয়াছিলেন ইংলন্ডের একটি গ্রাম ও একটি পাদ্রীর গৃহস্থালী দেখিয়া। ইতিমধ্যে তাঁহার সি এফ অ্যান্ড্রুজ-এর সহিত আলাপ হইয়াছিল। তিনিই রবীন্দ্রনাথকে সেই গ্রামে লইয়া যান। গ্রামটি স্ট্যাফোর্ডশায়ারে।

যখন তিনি ট্রেনে গম্য স্থানের স্টেশনে পৌঁছিলেন, তখন পাদ্রী-সাহেবটি ('ভিকার' অথবা 'রেক্টর') গাড়ী লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন, —

> 'বাড়িতে গিয়া যখন পৌঁছিলাম গৃহস্বামিনী তাঁহার আগুন-জ্বালা বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন। বাড়িটির ঘরগুলি পরিপাটি পরিচ্ছন্ন; লাইব্রেরী সুপাঠ্য গ্রন্থে পরিপূর্ণ; ভিতরে বাহিরে কোথাও লেশমাত্র অযত্নের চিহ্ন নাই। এখানকার ভদ্রগৃহস্থ-ঘরে এই জিনিসটাই বিশেষ করিয়া আমার মনে লাগিয়াছে। ইহাদের ব্যবহারের, আরামের ও গৃহসজ্জার উপকরণ আমাদের চেয়ে অনেক বেশি, অথচ ঘরের প্রত্যেক সামান্য জিনিসটির প্রতি গৃহস্থের চিত্ত সতর্কভাবে জাগ্রত আছে। নিজের চারিদিকের প্রতি শৈথিল্য যে নিজেরই অবমাননা তাহা ইহারা খুব বুঝে। এই জাগ্রত আত্মাদরের ভাবটি ছোটো বড়ো সকল বিষয়েই কাজ করিতেছে। ইহারা নিজের মনুষ্যগৌরবকে খাটো করিয়া দেখে না বলিয়াই নিজের ঘর-বাড়িকে যেমন সর্বপ্রযত্নে তাহার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে, তেমনি নিজের প্রতিবেশকে সমাজকে দেশকে সকল বিষয়ে সকল দিক হইতে সম্মার্জন করিয়া তুলিবার জন্য ইহাদের প্রয়াস অহরহ উদ্যত হইয়া রহিয়াছে। ত্রুটি জিনিসটাকে ইহারা কোনো কারণেই কোনো জায়গাতেই মাপ করিতে চায় না।'

বিকালের দিকে গৃহস্বামী মিঃ উট্রাম রবীন্দ্রনাথকে গ্রামে বেড়াইবার জন্য লইয়া গেলেন। তিনি দেখিলেন, 'গুল্মশ্রেণীর বেড়ার দ্বারা বিভক্ত ঢেউ-খেলানো প্রান্তরের প্রগাঢ় শ্যামলিমা দুই চক্ষুকে স্নিগ্ধতায় অভিষিক্ত করিয়া দিল। জায়গাটা পাহাড়ে বটে, কিন্তু পাহাড়ের উগ্র বন্ধুরতা কোথাও

নাই — আমাদের দেশের রাগিণীতে যেমন সুরের গায়ে সুর মিড়ের টানে ঢলিয়া পড়ে, এখানকার মাটির উচ্ছ্বাসগুলি তেমনি ঢালু হইয়া পরস্পরের গায়ে গায়ে মিলিয়া রহিয়াছে; ধরিত্রীর সুরবাহারে যেন কোন্ দেবতা নিঃশব্দ রাগিণীতে মেঘমল্লারের গৎ বাজাইতেছেন।'

কিন্তু মনুষ্য জীবনের যে-দিক রবীন্দ্রনাথ এই গ্রামে দেখিলেন তাহা প্রাকৃতিক দৃশ্যের চেয়েও তাঁহাকে মুগ্ধ করিল, তিনি লিখিলেন, —

'এখানকার পল্লীবাসীর সঙ্গে উট্রাম সাহেবের হিতানুষ্ঠানের সম্বন্ধ নানা দিক হইতে দেখিয়াছি। এই প্রকার মঙ্গলব্রতে-নিয়ত উৎসর্গ-করা জীবন যে কী সুন্দর তাহা ইহাকে দেখিয়া অনুভব করিয়াছি। ভগবানের সেবার অমৃতরসে ইহার জীবন পরিপক্ক মধুর ফলের মতো নম্র হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ঘরের মধ্যে ইনি একটি পুণ্যের প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিয়াছেন, অধ্যয়ন ও উপাসনার দ্বারা ইহার গার্হস্থ্য প্রতিদিন ধৌত হইতেছে, ইহার আতিথ্য যে কিরূপ সহজ ও সুন্দর তাহা আমি ভুলিতে পারিব না।'

রবীন্দ্রনাথ ১৯১২-১৩ সনে ইংলন্ডে থাকিয়া যে আনন্দ পাইযাছিলেন তাহার বিবরণ শেষ করিলাম। বিবরণটিকে দীর্ঘ করিয়াছি ইচ্ছা করিয়াই, তিনটি কারণে —

১। এই দেড় বৎসর মত কালই তাঁহার জীবনে শেষ সুখের কাল। ১৯১৩ সনে দেশে ফিরিবার পর হইতে ১৯৪১ সনে মৃত্যু পর্যন্ত আর তিনি মানসিক সুখ পান নাই — একদিকে মানুষ রবীন্দ্রনাথ, 'বিশ্বমানব' ও 'গুরুদেব' রবীন্দ্রনাথের আড়ালে পড়িয়া গেলেন, অন্য দিকে বিদ্বেষপ্রসূত আক্রমণের লক্ষ্য হইলেন। আহত ব্যাঘ্র যেমন কোনো মতে গুহায় লুকাইয়া শান্তি পায়, জীবনে শান্তি পাইতেও তাঁহাকে তেমনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গোপন গুহায় গিয়া আশ্রয় লইতে হইয়াছিল।

২। আমি দেখাইতে চাহিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম জাতীয় আত্মম্ভরিতা নয়, তাঁহার দেশপ্রেম ও বিদেশপ্রেম, যেখানেই মানুষ প্রেমের যোগ্য সেখানেই সমানভাবে দেখা দিয়াছে।

৩। তৃতীয়ত, ইঙ্গিত করিতেছি যে, ইংলন্ডে এইভাবে আনন্দ পাইবার প্রবৃত্তি থাকার জন্যই তিনি দেশবাসীর বিরাগভাজন হইলেন। আমাদের দেশের লোক যে বাড়ী-ঘর একটু গুছাইয়া রাখিলেও, যে গুছাইয়া রাখে তাহাকে ইংরেজের চাটুকার এমন কি দাস বলিয়া মনে করে তাহার প্রমাণ বিদেশে থাকিয়া আমি যথেষ্ট পাইতেছি।

তৃতীয়বারের এই বিলাতপ্রবাসে রবীন্দ্রনাথ যে আনন্দ পাইয়াছিলেন, তাহার একটি অপ্রত্যাশিত ও আশ্চর্যকর পরিশিষ্ট ঘটিয়াছিল — কারণ এই আনন্দ তিনি পাইয়াছিলেন আমেরিকায়, যে-দেশের লোককে হিন্দুমাত্রেই ঘোর জড়বাদী ও অর্থোপাসক বলিয়া মনে করে। ১৯১২ সালের শেষের

দিকে তিনি বক্তৃতা করিবার জন্য হারভার্ডে নিমন্ত্রিত হন। সেখানকার বক্তৃতাগুলিই পরে 'সাধনা' এই নামে ইংরেজীতেই প্রকাশিত হয়।

বক্তৃতা করিবার সময়ে তিনি বোস্টনের কাছে একটি গ্রামে ছিলেন। সেখান হইতে তিনি ১৩১৯ সনের ৯ অগ্রহায়ণ (১৯১২ সাল, নভেম্বরের শেষ) একটি পত্র লেখেন। উহার কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করিব, রবীন্দ্রনাথের আমেরিকাপ্রবাসের পরিচয় হিসাবে। (এই প্রসঙ্গে এই কথাটা বলা প্রয়োজন মনে করি যে, ম্যাসাচুসেটস্ অঞ্চলের অথবা নিউ ইংল্যান্ডের প্রাকৃতিক অবস্থা ও দৃশ্য ইংলন্ডের মত। বোস্টন হইতে বিশ মাইল মত দূরে একটি গ্রামে রাত্রিবাস করিয়া আমিও এইরূপ দৃশ্য দেখিয়াছিলাম। এপ্রিল মাসেও ববফ ছিল। হয়ত বা রবীন্দ্রনাথ এই গ্রামেই ছিলেন)। এখন যাহা উদ্ধৃত করিবার করি, —

'আজ রবিবার। গির্জার ঘন্টা বাজিতেছে। সকালে চোখ মেলিয়াই দেখিলাম বরফে সমস্ত সাদা হইয়া গিয়াছে। বাড়িগুলির কালো রং-এর (অর্থাৎ স্লেটের) ঢালু ছাদ এই বিশ্বব্যাপী সাদার আবির্ভাবকে বুক পাতিয়া দিয়া বলিতেছে, আধ আঁচরে বোসো। মানুষের চলাচলের রাস্তায় ধূলাকাদার রাজত্ব একেবারে ঘুচাইয়া দিয়া শুভ্রতার নিশ্চল ধারা যেন শতধা হইয়া বহিয়া চলিয়াছে। ...

'স্তব্ধ শীতের প্রভাতে এই অপরূপ শুভ্রতার নির্মল আবির্ভাবকে আমি নত হইয়া নমস্কার করি — ইহাকে আমার অন্তরের মধ্যে বরণ করিয়া লই। বলি, "তুমি এমন ধীরে ধীরে ছাইয়া ফেলো; আমার সমস্ত চিন্তা, সমস্ত কল্পনা, সমস্ত কর্ম আবৃত করিয়া দাও। গভীর রাত্রির অসীম অন্ধকার পার হইয়া তোমার নির্মলতা আমার জীবনে নিঃশব্দে অবতীর্ণ হউক, আমার নবপ্রভাতকে অকলঙ্ক শুভ্রতার মধ্যে উদ্বোধিত করিয়া তুলুক। ..."

'সমস্ত দেহমনকে শুভ্রতার মধ্যে নিঃশেষে নিবিষ্ট করিয়া দিয়া নমস্কার — নমঃ শিবায় চ, শিবতরায় চ।'

** ** **

রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা পৌছিলেন ১৯১৩ সনের ২৯শে সেপ্টেম্বর। সকাল আটটায় বোম্বে মেল হাওড়া পৌছিল। তখন হইতেই রবীন্দ্রনাথের আত্মঘাতী রূপ দেখা দিল ও উহার সহিত তাঁহার আত্মসমাহিত রূপের বিরোধ চলিল।

॥ **দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত** ॥